পদসঞ্চার

অর্ধেন্দু মুখোপাধ্যায়

রত্নাবলী
৫৯এ বেচু চ্যাটার্জি স্ট্রীট • কলকাতা ৭০০ ০০৯

প্রথম প্রকাশ
আগস্ট ১৯৫৯

প্রকাশক
এস. চট্টোপাধ্যায়
৫৯/এ, বেচু চ্যাটার্জি স্ট্রীট
কলকাতা ৭০০ ০০৯

প্রচ্ছদ
সিদ্ধার্থ হোম

কলেজ স্ট্রীটে প্রাপ্তিস্থান
পুস্তক বিপণি
২৭, বেনিয়াটোলা লেন
কলকাতা ৭০০ ০০৯

মুদ্রক
স্টার এন্টারপ্রাইজ
১৭/৩, ঝামাপুকুর লেন
কলকাতা ৭০০ ০০৯

উৎসর্গ

স্বর্গগত

পিতা ও মাতার চরণ স্মরণে—

নিবেদন

কবি-শিল্পী-সাহিত্যিক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ছিলেন বরেণ্য শিক্ষক। নানা ভাবে, নানা দিক থেকে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে এবং খুব কাছে থেকে তাঁকে দীর্ঘদিন যাবৎ দেখার ও জানার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। তাঁর কাছে যা পেয়েছি সে ঋণ অপরিশোধ্য। মনের গভীরে যে কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধাবোধ এতকাল সঞ্চিত ছিল, 'পদসঞ্চার'-এর আলোচনা করতে বসে আজ তার অঙ্কুরোদ্গম হ'ল।

'পদসঞ্চার'-এর আলোচনা যদি কোন পাঠক, গবেষক, বা শিক্ষার্থীকে নারায়ণবাবুর সাহিত্য সম্পর্কে কৌতূহলী করে, তাঁর বিপুল সাহিত্যালোচনায় প্রাণিত করে তবেই বুঝব আমার এ গুরু-প্রণাম সার্থক হ'ল।

অনেকদিন ধরেই এ-কাজের ইচ্ছা মনের মধ্যে ঘোরাফেরা করলেও, বন্ধুবর অধ্যাপক আদিনাথ মুখোপাধ্যায় ও অধ্যাপক সুনীল মিশ্রের চেষ্টায় তা বাস্তবে রূপদান সম্ভব হ'ল। তাঁদের এ বন্ধুপ্রীতি আমার অন্তরে অপরিম্লান থাকুক।

এই কাজে কয়েকটি দুষ্প্রাপ্য বই হাতে তুলে দিয়ে জাতীয় গ্রন্থাগারের শ্রী পাঁচু গোপাল মৈত্র (সহ-গ্রন্থাগারিক, পাঠকক্ষ, জাতীয় গ্রন্থাগার) মহোদয় এবং শ্রীরঞ্জিত সরকার (সহ-প্রয়োগবিদ্যাবিৎ, জাতীয় গ্রন্থাগার) আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে বেঁধে রেখেছেন।

সবশেষে, আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই সুনীল ভট্টাচার্য মহাশয়কে। তাঁর আগ্রহে এবং উদ্যোগেই গ্রন্থখানি আলোর মুখ দেখল।

কলকাতা-৩০

—অর্ধেন্দু মুখোপাধ্যায়

সূচীপত্র

	বিষয়	পৃষ্ঠা
এক	লেখক পরিচিতি	১—২৭
দুই	কথাবস্তু	২৮—৫৩
তিন	ঐতিহাসিক তথ্য ও উপাদান	৫৪—৬৫
চার	ঐতিহাসিক উপন্যাস	৬৬—৮৪
	ঐতিহাসিক উপন্যাসের লক্ষণ ও বৈশিষ্ট্য ৬৭-৬৯ 'পদসঞ্চার'-এর ঐতিহাসিক উপাদান-বিশ্লেষণ : ক. ঐতিহাসিক কাহিনী ৬৯—৭৩ ; খ. চরিত্র ৭৩ ; গ. ভৌগোলিক নাম ও কাল ৭৪ ; ঘ. রাজনৈতিক অবস্থা ৭৪—৭৬ ; ঙ. অর্থনৈতিক চিত্র ৭৬—৭৮ ; চ. সমাজ, ধর্ম ও সংস্কৃতি ৭৮—৮৩ ; উপন্যাসের কাল্পনিক কাহিনী ৮৩—৮৪ ।	
পাঁচ	পরিচ্ছেদ শিরোনাম প্রসঙ্গ	৮৫—৯৫
ছয়	নামকরণ প্রসঙ্গ	৯৬—১০৪
	১. কাহিনীগত দিক/ক. ঐতিহাসিক কাহিনী খ. কাল্পনিক কাহিনী ৯৯—১০০ ; ২. রাজনৈতিক দিক ১০০—১০২ ; ৩. অর্থনৈতিক দিক ১০২—১০৩ ; ৪. ধর্মীয় দিক ১০৩-১০৪ ।	
সাত	চরিত্র চিত্রণ	১০৫—১৫০
	ভাস্কো-ডা-গামা ১০৭—১০৯ ; মার্টিম অ্যাফন্সো ডি মেলো ১০৯—১১৬ ; মামুদ শা ও খোদাবক্স খাঁ (তুলনামূলক আলোচনা) ১১৬—১১৭ ; খোদাবক্স খাঁ ১১৭—১১৯ ; মামুদ শা ১১৯—১২৫ ; সোমদেব ১২৫—১৩০ ; শম্পা ১৩০—১৩৪ ; সুপর্ণা ১৩৪—১৩৭ ; শম্পা ও সুপর্ণা (তুলনামূলক আলোচনা) ১৩৭—১৪০ ; শঙ্খ দত্ত ও রাজশেখর ১৪০—১৪২ ; শঙ্খ দত্ত ১৪২—১৪৭ ; নায়ক বিচার ১৪৮—১৫০ ।	

আট **শিল্পকাহিনীর গঠন কৌশল** ১৫১—১৮৫

মূল ভাববস্তু ১৫১—১৫২ ; প্লাট বা শিল্প-কাহিনীর লক্ষণ ও বৈশিষ্ট্য ১৫২—১৫৪ ; শিল্প নির্মাণ কৌশল ১৫৪—১৫৫ ; কথামুখ ১৫৫—১৫৬ ; শিল্প কৌশলের চিত্ররূপ ১৫৬—১৫৯ ; কাল্পনিক কাহিনীর চরিত্রগুলির অবস্থা-চিত্র ১৫৯ ; কার্য-কারণ সূত্রে কাহিনী গ্রন্থন ১৬০—১৬৫ ; শাখা-কাহিনী : খোদাবক্স খাঁ ও ডি মেলো ১৬৫—১৬৬ ; কাল্পনিক কাহিনী ১৬৬—১৭৩ ; শাখা-কাহিনী : গঞ্জালো-সুপর্ণা ১৭৩—১৭৬ ; মূল ইতিহাস-কাহিনীর দ্বিতীয় অধ্যায় ১৭৬—১৮৪ ।

নয় **ভাষাবিচার** ১৮৫—১৯৫

উপসংহার

এক

লেখক পরিচিতি

ঔপন্যাসিক ও ছোটগল্পকার নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় বাঙলা সাহিত্যে আবির্ভূত হয়েছেন 'কল্লোল' যুগের শেষ লগ্নে। তাঁকে 'কল্লোল-'উত্তর যুগের সাহিত্যিক বলাই সমীচীন। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত জানিয়েছেন: "মাঝে মাঝে ও [নারায়ণ গঙ্গোঃ] বলত, 'আরো যদি কটা বছর আগে এসে জন্মাতুম তা হলে আপনার 'কল্লোল যুগে' হয়তো একটু স্থান পেতুম,

"আমি বলতাম, 'কল্লোলোত্তর যুগের সাহিত্যিকদের নিয়ে যে বইটা লিখছি তাতে মাণিক আর সঞ্জয়ের সঙ্গে তুমি অনেকখানি জায়গা জুড়ে রয়েছ।' "

শিল্পী নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের কথা পরে হবে। তার আগে তাঁর শিল্পী হয়ে ওঠার পেছনের জগৎটার কিছু কিছু খবর সাজিয়ে নেওয়া যেতে পারে। স্কুল-কলেজ-ইউনিভার্সিটির কাগজে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যয়ের নাম ছিল তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। নারায়ণ নামটি তাঁর দিদিমার দেওয়া। শৈশব জীবনে তাঁর কামনা ছিল আদর্শ শিক্ষক হওয়ার।

প্রসঙ্গতঃ একটি কৌতুককর শৈশব-ঘটনার উল্লেখ করতে পারি। শেখর গঙ্গোপাধ্যায় (মেজদা) এবং লেখকের সম্ভবতঃ একই সঙ্গে হাতে খড়ি হয়েছিল। হাতে খড়ি অনুষ্ঠানের পর ঘরের বিগ্রহ কালী প্রতিমাকে প্রণাম করে উঠলে শিশু নারায়ণকে কৌতুক করে জনৈকা আত্মীয়া জিগ্যেস করেন: 'কি রে, ঠাকুরের কাছে কী প্রার্থনা করলি?' —'বল্লুম, আমি যেন বড় হয়ে একজন ভাল মাস্টার হই, আমার যেন খুব নাম হয়।' —'দূর! এই চাইলি! মাস্টার হলে কি খুব নাম হয়?' —'ক্যানো হবে না। আমি খুব বড় মাস্টার হব। আমার অনেক ছাত্র-ছাত্রী হবে। তাদের মুখে মুখে আমার নাম ছড়িয়ে পড়বে।' শিশুর সেই প্রার্থনা আরাধ্যা দেবী পূরণ করেছিলেন। আমৃত্যু জ্ঞান-তপস্বীর মত যেমন বিদ্যাভ্যাস, জ্ঞানচর্চা করেছেন, অগাধ পাণ্ডিত্য অর্জন করেছেন, তেমনি অসংখ্য ছাত্র-ছাত্রীর আদর্শ শিক্ষক রূপে তিনি শ্রদ্ধাঞ্জলি পেয়েছেন।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের পিতৃ-পিতামহের বাসভূমি ছিল বরিশাল। তাঁর পিতার কর্ম-জীবন শুরু হয়েছিল উত্তরবঙ্গে। সেই সূত্রে জলপাইগুড়ি, কোচবিহার প্রভৃতি অঞ্চলের

অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হয়েছিল তাঁর বাল্যজীবনে। পরবর্তীকালে তিনি কলেজ-জীবনে এসেছিলেন ফরিদপুরে। শ্রীযুক্ত অচ্যুত গোস্বামী "কিশোর তারকনাথের স্মৃতি" প্রবন্ধে বলেছেন : "১৯৩৩ সাল। ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করে ইণ্টারমিডিয়েট পড়তে গিয়েছিলাম ফরিদপুর রাজেন্দ্র কলেজে। ভর্তি হতে গিয়ে দেখি কাউণ্টারে বেশ ভীড়।····· রোল আটচল্লিশের পরে যে ছেলেটি কাউণ্টারের মুখোমুখি দাঁড়াল তাকে কেশিয়ার জিজ্ঞেস করলেন,·····শুনতে পেলাম কেশিয়ারের প্রশ্নের জবাবে ছেলেটি নিজের নাম বলল, তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়।"

শ্রীঅচ্যুত গোস্বামী তাঁর এই স্মৃতিচারণায় বলেছেন : "তারকনাথকে দূর থেকে দেখে লাজুক এবং স্বল্পভাষী বলে মনে করেছিলাম। যখন তাকে ঘনিষ্ঠভাবে জানলাম তখন দেখলাম একবার মুখ খুললে সে অনর্গল কথা বলে যেতে পারে। কারণ ঐ বয়সেই তার মনে বলার অনেক কথা জমেছে। তার আর একটি আশ্চর্য ক্ষমতা লক্ষ্য করেছিলাম। রবীন্দ্রনাথের দীর্ঘ দীর্ঘ কবিতাগুলো একের পর এক অনর্গল মুখস্থ বলে যেতে পারে।" নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের এই স্মৃতিশক্তির কথা আমরাও কলেজে পড়তে এসে শুনেছিলাম। শুনেছিলাম, গোটা 'সঞ্চয়িতা'খানি তিনি একবারে মুখস্থ বলেছিলেন, বন্ধুদের চ্যালেঞ্জের জবাবে। সেই প্রথম কলেজীয় তরুণ তারকনাথ সম্পর্কে সহপাঠী অচ্যুত গোস্বামীর ধারণাটি এরূপ : "আলাপ করে বুঝলাম তারকনাথ যা বিশ্বাস করে দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে বিশ্বাস করে। সেই সময়ে সে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের পরম অনুরাগী, গান্ধীজীর নীতিতে বিশ্বাসী। যুবক সমাজের উন্নতির জন্য ঋজু-কঠিন ব্রহ্মচর্যের আদর্শ দরকার বলে সে বিশ্বাস করে। এবং যা সে বিশ্বাস করে তা সে অকুণ্ঠিত চিত্তে ঘোষণা করতে ইতস্তত করে না।·····তারকনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলেই তর্ক জমে উঠত। সে বলত ভারতীয় আদর্শকে গ্রহণ করেই ভারতকে জাগতে হবে। আমি বলতাম ভারতীয় ভাবধারা যুক্তি ও বিজ্ঞানের কষ্টিপাথরে টেঁকে না। সুতরাং তা পরিত্যাজ্য। এ যুগ সরল বিশ্বাসের যুগ নয়, প্রশ্নের যুগ।·····কিন্তু তারকনাথের সঙ্গে তর্কে জয়লাভ করা প্রায় অসম্ভব ছিল। তার কারণ তার প্রত্যয় যেমন গভীর ছিল, তার কথায়ও ছিল তেমনি ধার।·····কিশোর তারকনাথের কথা ছিল ক্ষুরধার, এবং মনটি ছিল তার্কিকের। মনে আছে, আমাদের একজন অত্যন্ত পড়ুয়া বন্ধু রণেন মজুমদার একবার একটি প্রবন্ধ লিখেছিল।·····প্রবন্ধটি আমাদের এতখানি আকৃষ্ট করেছিল যে, আমরা কেউ কেউ বিষয়টির উপর ভিন্ন ভিন্ন মত জ্ঞাপন করে প্রবন্ধ লিখেছিলাম। সেই 'আমরা' দলের মধ্যে আমিও একজন ছিলাম। তখন আমাদের লেখার একমাত্র সার্থকতা ছিল বন্ধু বান্ধবদের শোনানো বা পড়ানো। তারকনাথও প্রবন্ধটি পড়েছিল এবং ভাষার অনেক খুঁৎ আবিষ্কার করেছিল। যে-সব খুঁৎ আবিষ্কার করেছিল তার আর এখন মনে নেই, তবে একটা খুঁতের প্রসংগ এখনো মনে আছে। এক জায়গায় আমি 'বিজাতীয়' এই বিশেষণটি প্রয়োগ করেছিলাম। কথাটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ টেনে বের করে তার প্রয়োগ যে অযথাযথ এবং অসার্থক হয়েছে তা সে প্রতিপন্ন করল। সেদিন বুঝতে পেরেছিলাম ভাষাকে নিখুঁৎ

করার জন্য ভাষায় ব্যবহৃত প্রতিটি শব্দকে যথাযথ অর্থবাহক করার জন্য সেই বয়সেই সে কতখানি চিন্তা করত। ······তারকনাথের চিন্তা-ভাবনা ও জীবনচর্যায় আশ্রমিক প্রভাব যথেষ্ট ছিল বলে আমার মনে কেমন একটা ধারণা ছিল। সেই সময়কার অতি আধুনিক বলে কথিত লেখক গোষ্ঠী, অর্থাৎ, কল্লোল-কালীন লেখক গোষ্ঠীর প্রতি তার তেমন আগ্রহ নেই।······সেদিন আলোচনা করে বুঝেছিলাম তারকনাথ কল্লোল-যুগের কোন লেখককে অসাধারণ যুগান্তকারী লেখক বলে গণ্য করে নি। তবে তাদের লেখার মধ্যে যে শক্তির পরিচয় আছে, তা সে অকপটে স্বীকার করেছিল। বাংলা ভাষার উপর তাঁদের যে অসাধারণ দখল আছে, এই ভাষার সুপ্ত সম্ভাবনাকে যে তাঁরা অনেক সময় ব্যক্ত করতে পেরেছেন, তারকনাথ তা স্বীকার করল।"

আই. এ. পরীক্ষার দু'বছর ফরিদপুরে থেকে, বি. এ. পড়তে তিনি বরিশাল বি. এম. কলেজে আসেন। এইখানেই সম্ভবত কবি জীবনানন্দ দাশকে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ও অধ্যাপক রূপে পেয়েছিলেন। বি. এম. কলেজ থেকে এম. এ. পড়তে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় কলকাতায় আসেন। এখানে কবি হরপ্রসাদ মিত্র ছিলেন তাঁর সহপাঠী। "প্রিয় বন্ধু নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়" স্মৃতিরচনায় হরপ্রসাদ মিত্র লিখেছেন: "নারায়ণ আমার সহপাঠী ছিল। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে এম. এ. ক্লাসে আমরা একসঙ্গে ভর্তি হয়েছিলুম ১৯৩৮-৩৯ সালে। ১৯৪০ সালে আমি পরীক্ষা দিলুম; নারায়ণ দিল না। সে ১৯৪১ সালের নতুন সিলেবাসে পরীক্ষা দিয়ে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়······।" তথাকথিতভাবে* এইখানেই নারায়ণবাবুর ছাত্রজীবন সমাপ্ত হয়। যিনি তাঁর হাতেখড়ির দিন গৃহদেবী কালীর সামনে যশস্বী, আদর্শ শিক্ষক হওয়ার প্রার্থনা জানিয়েছিলেন, শিক্ষা সমাপনান্তে তিনি তাঁর সেই অন্তরের প্রার্থনাকে সত্যে রূপান্তরিত করলেন। প্রথমে উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়ি কলেজে, পরে কলকাতার সিটি কলেজে এবং অবশেষে সেখান থেকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বঙ্গভাষা বিভাগে অধ্যাপনার কাজে যোগদান করেন। শিক্ষক হিসাবে তাঁর বিপুল ও সর্বাত্মক খ্যাতি সম্পর্কে তাঁর অসংখ্য ছাত্র-ছাত্রী ও সহকর্মী বন্ধুগণ সকলেই উচ্ছ্বাস; প্রশংসার পাত্র কানায়-কানায় পূর্ণ। শিক্ষক হিসেবে তাঁর দুই রূপ: (১) প্রগাঢ় পণ্ডিত, এবং সে পাণ্ডিত্য এমন এক ভাষার জাদুশক্তিতে বিকশিত, উদ্ভাসিত হয়ে উঠত, যা শুনলে মনে হোত, বাগ্‌দেবী তাঁর জিহ্বায় আশ্রয় নিয়েছেন; (২) ছাত্র-দরদী বন্ধু। তাঁর গুণমুগ্ধ ছাত্র-ছাত্রীদের স্মৃতিচারণা থেকে দু'একটি মন্তব্য উদ্ধৃত করলেই যথেষ্ট হবে:

১। "যখন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ি তখন আমাদের বিভাগে অধ্যাপক-অনটন চলছিল। অনেকেই অবসর নিয়েছেন। নতুন অধ্যাপক না আসায় সিলেবাসের অনেক বই পড়ানো হচ্ছে না। শশীবাবু তখন পালি প্রাকৃত বাদে সাতটা পেপারই পড়াচ্ছেন,

---

*'তথাকথিত ভাবে'—এইজন্যই লেখা হয়েছে যে, বর্তমান গ্রন্থের লেখক তাঁকে আমৃত্যু নানা জাতীয় গ্রন্থের একনিষ্ঠ পাঠক হিসাবে দেখেছে। অবশ্য তাঁর অধ্যাপনা বৃত্তিও এজন্য সহায়ক হয়েছে।

স্ পেপারের কিছু কিছু বই নিয়ে। শশীবাবুই একদিন ক্লাসে বললেন নারায়ণবাবু আর অসিতবাবু যোগ দিচ্ছেন। তারপর এই দুই কৃতী অধ্যাপক-কে পেয়ে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়া যে সার্থক হয়েছে এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। আমার মধ্যে সাহিত্য-বোধ সঞ্চার করতে তিনি পেরেছিলেন, সে বোধ আমার যতো সামান্যই হোক। নিজের মতামতকে তিনি অত্যন্ত স্পষ্ট ভাবেই প্রকাশ করতেন যদিও জড়তা বলে কোনে বস্তু তাঁর চলনে-বলনে ছিল না। এবং এই প্রথম (হয়তো অন্যান্য ছাত্রদের তুলনায় একটু দেরীতেই) নিজের মতকে যুক্তির সঙ্গে অগ্রাধিকার দিতে শিখেছিলাম। অধ্যাপকদের নিজস্ব মতামতকে পরীক্ষা মূল্য দিতেই হবে এমন অন্যায় অসাহিত্যিক মনোভাব বর্জন করতে তিনিই প্রথম শিখিয়েছিলেন।......স্কুল জীবনের সেই স্বপ্নের মানুষটি পরে আমার অধ্যাপক হয়েছেন একথা গর্বের সঙ্গে কত লোককে যে বলে বেড়িয়ে তৃপ্তি পেয়েছি তার ইয়ত্তা নেই। শান্তিনিকেতন ছেড়ে কলকতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দিতে এসে সবচেয়ে আনন্দ হয়েছিল এই ভেবে যে, আমি নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের সহকর্মী। সহকর্মীরূপে তাঁর সঙ্গে পাশাপাশি বসেছি, গল্পে মেতেছি, রসিকতায় যোগ দিয়েছি, কিন্তু ছাত্র-শিক্ষকের ব্যবধান রাখেন নি। দেখেছি তাঁর অসাধারণ স্মৃতিশক্তি, সংস্কারমুক্ত মন এবং দুর্লভ সাহিত্যিক অন্তর্দৃষ্টি। স্মৃতিশক্তির পরিচয় ছাত্রাবস্থায় পেয়েছি। কিন্তু সহকর্মীরূপে দেখলুম যে প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক বাঙলা সাহিত্যের সর্ব যুগের সাহিত্য সম্পর্কে তাঁর সমান মনোযোগ এবং চর্যাগীতি, গোপীচন্দ্রের গান, মঙ্গলকাব্য, বৈষ্ণব সাহিত্য, কবিগান, মুসলমানী সাহিত্য সবকিছু থেকেই তিনি প্রয়োজন মতো উদ্ধৃতি দিয়ে স্তব্ধ করতে পারতেন তার্কিককে। অথচ তাঁর প্রধান মনোযোগ ছিল এ যুগের সাহিত্য সম্পর্কেই। এই প্রসঙ্গে একটা ঘটনা মনে পড়লো। আমাদের যখন নিয়মিত ক্লাশ শেষ হয়ে আসছে সেই সময় একদিন টিউটোরিয়াল ক্লাশে হঠাৎ তাঁকে বলেছিলাম যে "বনবাণী" বইটি তো পড়ানো হয় নি, যদি একটু আলোচনা করে দেন তো উপকার হয়। নির্বিকারভাবে তিনি বনবাণীর প্রত্যেকটি কবিতা ও গান ঠিক বইতে যেমন সাজানো আছে তেমনি পরের পর মুখস্থ বলে রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতিসৃষ্টি ও ঋতুবৈচিত্র্যের সূক্ষ্ম পরিবর্তনগুলিকে আশ্চর্যভাবে বলে গেলেন অথচ হাতের কাছে বইটি ছিল না। বাড়ি ফিরে 'বনবাণী' খুলে পড়তে পড়তে তাঁর দুর্লভ স্মৃতিশক্তির কথা ভেবে অবাক হয়ে গেলুম।......রবীন্দ্রনাথ-জীবনানন্দের কবিতা এবং পরবর্তীকালের অনেক কবির কবিতা, এমন কি আমাদের সমসাময়িক বন্ধুবান্ধবের কবিতাও তিনি অক্লেশে মুখস্থ বলতেন।......অনেক দ্বিতীয় শ্রেণীর কবির তৃতীয় শ্রেণীর কবিতাও তাঁর মুখস্থ ছিল। এবং সবচেয়ে অদ্ভুত লেগেছিল যেদিন কোনো একজন কবি-অধ্যাপক তাঁর নিজের লেখা ত্রিশ বছর আগেকার ভুলে যাওয়া কবিতা মুগ্ধ হয়ে শুনেছেন নারায়ণবাবুর কণ্ঠে।

"স্মৃতিশক্তির মতোই প্রখর ছিল তাঁর বিচারশক্তি। বছর চারেক আগে আমার একটি প্রকাশিত প্রবন্ধ তাঁকে দেবো বলে তাঁর বাড়িতে গিয়েছিলাম। প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের ওপর বিদেশী প্রভাবের সূত্রান্বেষণের চেষ্টা ছিল। উল্টে-পাল্টে দেখে

তিনি বললেন 'আচ্ছা দেখো তো খুঁজে, আমার কেমন যেন মনে হয় রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্পে ফরাসী ছোট গল্পের ধাঁচ চোখে পড়ে। অন্ততঃ বলবার বা সাজাবার ভঙ্গী এবং সঙ্গে সঙ্গে লিরিক্যালিটিকে কাজে লাগাবার চেষ্টা মনে হয় আলফাঁস দোদের লেখাতে দেখেছি। দোদের এক একটি গল্পের ছায়াও রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি গল্পে পেয়েছি। ......একদিন খেয়াল হওয়ায় বিশ্বভারতীর কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে তিন চারটি দোদের গল্পের বই-এর সন্ধান পেয়ে গেলাম এবং খুলে দেখলুম তার অন্তত তিনটিতে রবীন্দ্রনাথের সই করা বই রয়েছে। বইগুলি উনিশ শতকের আশির দশকেই বেরিয়েছে এবং তার দু-চার বছর বাদে আশির দশকের শেষের দিকেই বইগুলি কেনা।..." (নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় : একটি বিচিত্র ব্যক্তিত্ব—উজ্জ্বলকুমার মজুমদার।)

২। "......অথচ একমাত্র নারায়ণবাবুর ক্লাসে আমরা কখনো কথা বলি নি। গোলমাল করা তো দূরের কথা, তখন আমরা সব অতি শান্তশিষ্ট সুবোধ সহবত বিশিষ্ট বিনীত ছাত্রের দল, তখন সত্যেন দত্তের কীট্সের অনুবাদ ছাড়া আমরা আর কিছু জানি না, অথচ অন্য সময় বিশেষ কারো ক্লাসে আমরা নানা আলোচনায় ব্যস্ত থেকেছি, কেউ বা ঘুমিয়েছি।......আমার অধিকাংশ বন্ধুর স্পেশাল পেপার ছিলো নাটক, তারা আমার ছোট গল্পের ক্লাস করতে আসতো, কারণ নারায়ণ বাবু ছোট গল্প পড়াতেন, আমি নাটক স্পেশাল পেপারের ক্লাস করতে যেতাম, কারণ নারায়ণ বাবু রবীন্দ্রনাথের নাটক পড়াতেন। ......ছাত্র-ছাত্রীদের সম্পর্কে ওঁর ধারণা নিশ্চয়ই অন্য আর পাঁচজন জ্ঞানী ব্যক্তির মতো ছিলো না, কারণ উনি মনে করতেন আমরা ছাত্র-ছাত্রীরা একেবারে নিরেট নির্বোধ নই, ছাত্রদের প্রতি ওঁর অগাধ বিশ্বাস থেকেই হয়তো উনি বলতেন 'তোমরা তো সবই জানো'। আর এই 'সবই জানো'র মধ্যে Altona থেকে Absurd Drama, রীড, স্পেন্ডার, রব গ্রিয়ে, এগজুপেরী, নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত কামুর মন্তব্য Had I been a Judge, I would have voted for Andre Malraux এই সমস্তই ছিলো। আমরা খুব অবাক হতাম। কারণ চিরকাল আমরা তো সব ডাউন রাইট্ ফুল, বুদ্ধিং ইডিয়ট, এই আকছার শুনেছি। এই প্রথমই আমরা মাস্টারমশাইয়ের মুখে শুনলাম, 'তোমরা তো সবই জানো'। আমরা জানতাম কথাটা সত্যি নয়, তবু ঐ অসত্য কথাটা শুনতে আমাদের খুব ভালো লাগতো।......

'শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বক্তৃতামালা'য় ছোট গল্পের সীমারেখা সম্পর্কে স্যার তিন দিন বক্তৃতা দিলেন। দ্বারভাঙা হলে উঁচু টেবিলটার সামনে দাঁড়িয়ে স্যার বক্তৃতা দিচ্ছেন, সামনে জ্বলছে টেবিল ল্যাম্পটা, টেবিলের ওপর কাঁচের গ্লাসে ঢাকা দেওয়া জল, আর সামনে দাঁড়িয়ে স্যার বক্তৃতা দিচ্ছেন, ল্যাম্পের আলোয় স্যারের মুখটা ঝলমল করছে, এমন সুন্দর ওঁকে আর কখনো দেখি নি, এই বুঝি পুরুষের সৌন্দর্য, এমনি বুঝি জ্বলে ওঠে তার ব্যক্তিত্ব। হল ভর্তি হয়ে গেছে, আমরা বসে আছি শোণ পাংশুর দল। দরজার গোড়ায় অনেকে দাঁড়িয়ে আছেন, আর তখন ভেঙে যাচ্ছে আমাদের সমস্ত 'তটতট তোতয় তোতয়' মন্ত্র, চাটুজ্জেদের রোয়াকে টেনিদা প্যালারামের আড্ডা থেকে যাঁকে আমরা

চিনি সেই আমাদের বালক বয়স থেকে, আজ তাঁকে অনেক বেশি করে চিনলাম। আমরা বুঝেছি আমাদের স্যার এলে অচলায়তনের পাথরগুলো পর্যন্ত নাচতে আরম্ভ করবে, পুঁথিগুলোর মধ্যে বাঁশি বাজবে।" ("আমাদের স্যার, আমাদের মাষ্টারমশাই"—প্রলয় শূর)।

৩। 'বাংলা দেশকে এত ভালবাসি। যেখানে যাই বাংলা দেশকে ভুলতে পারি না। আর ছাত্র-ছাত্রীরা। এরা আমার সত্তার সঙ্গে মিশে আছে। এরা আমার কাছে অনেক কিছু।……আমি আমার বুড়ো বয়সে পেনসন, কিছু বই, একটা খোলা বারান্দা আর একটা ইজি চেয়ার ও সামান্য খাদ্য এবং সিগারেট দু'একটা পেলেই খুশি; সেটা আমাকে মানুষই এনে দেবে জানি। জীবনের নগ্নতা, বীভৎসতা, কুশ্রীতা এক কথায় যা সত্য, সব সাহিত্য বিষয় হতে বাধ্য। সেখানে দুটো দিক—প্রথমটা হল জীবনকে কেবল কুৎসিৎ দেখানোর প্রবণতা। এখানে আমার প্রবল আপত্তি আছে। চাঁদ ও নর্দমা দুটোই তো জীবন। আমি নিজে মনে করি, নর্দমার অস্তিত্ব সম্পর্কে সচেতন থেকে ফুলের বাগানের দিকে চোখ রাখা ভালো বলে আমি বিশ্বাস করি।' —এক সাক্ষাৎকারে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় কথাগুলো বলেছিলেন। (দ্বিতীয় বিধাতা: ধ্বনি পত্রিকা)

৪। "নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় চলে গেলেন। বলা উচিত, আমি মাষ্টারমশাইকে হারিয়েছি। ধীর, স্থির, শান্ত, সদাহাস্যময়, সুগৌর, উজ্জ্বল চেহারার মানুষটিকে আর কেউ দেখতে পাবে না।" ("ছাত্রবন্ধু নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়"—অরুণ কুমার সেনগুপ্ত)।

নারায়ণ বাবুর সহকর্মী, অগ্রজ, সমবয়স্ক ও অনুজ বন্ধু-বান্ধবগণও তাঁর সহৃদয়, মধুর ব্যবহার, সদা হাস্যময় অমায়িক প্রকৃতি, তাঁর মনের স্নিগ্ধ প্রসন্নতার সঙ্গে চিত্তের ঔদার্য, অপার সহানুভূতি, কর্তব্যপরায়ণতা প্রভৃতি সম্বন্ধে নানা-প্রসঙ্গে, নানা আলোচনায় ও রচনায় বারবার উল্লেখ করেছেন। আমরা তারই প্রয়োজনীয় অংশ-বিশেষের কয়েকটি মাত্র এখানে উদ্ধৃত করতে চাই:

১। "বাংলা সরস্বতীর সভায় আজ বহু কৃতীরত্নের সমাবেশ এবং তাদের অনেকেই অল্পবিস্তর আমার স্নেহভাজন। সাহিত্যের বিচারে কেউ নারাণের চেয়ে বড়, কেউবা ছোট। কিন্তু এমন বুদ্ধিদীপ্ত ও হাস্যোজ্জ্বল প্রখর ব্যক্তিত্ব ও তার সঙ্গে মাধুর্য-মণ্ডিত ভদ্র ব্যবহার—এমনটি আর কারো মধ্যেই চোখে পড়ে না। এবং ভদ্রতা শুধুমাত্র ব্যবহারিক প্রকাশ নয়, চরিত্রের অবিচ্ছেদ্য অংশ, সহজ ও স্বপ্রকাশ।

বহুজনের সমাবেশে, যেখানে হয়তো নারাণ বৈষয়িক আলোচনায় অথবা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ব্যস্ত, সেখানেও কোন অজ্ঞাতপরিচয় আগন্তুক এসে প্রবেশ করে কখনো উদাসীন ব্যবহার পায় নি। তাড়াতাড়ি সময় করে নিয়ে এমনভাবে তার সঙ্গে আলাপ করেছে যেন ওইদিন ওই সময়ে আলাপনের জন্যই সে অপেক্ষা করে বসেছিল।" [পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়।]

২। …সাহিত্যকে পেছনে সরিয়ে রেখে মানুষটিকে সামনে এগিয়ে দেওয়ার একটা নিজস্ব ক্ষমতা ছিল নারায়ণের; মধুর, স্বচ্ছ, নিরভিমান, শান্ত; অতীব সতেজ।

এখানে এসে যতটা কানে যাচ্ছে, তাতে মনে হচ্ছে সবাই যেন সাহিত্যিকের চেয়ে এই নারায়ণকেই বেশি করে হারিয়েছেন। এও এক নূতন অভিজ্ঞতা; যারা তাঁর সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্কে এসেছিলেন তাঁদের কথাই বলছি। তাঁর অগণিত পাঠক-পাঠিকা—অপরিচিত…তাঁদের কাছে যে এ চরিত্রের সুর যে কম বেশি ক'রে না পৌঁছেছে এমন বলি না, তবে সে তো নেপথ্যে।" [শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়।]

৩। "…তেসরা নভেম্বর নান্দীকারের নিমন্ত্রণে মুক্ত অঙ্গনে তিনটি একাঙ্ক নাটিকার অভিনয় দেখতে গিয়েছি। গিয়ে দেখি নারায়ণ বসে আছে। কী আনন্দ—নারায়ণ! দেখতে আনন্দ, বলতে আনন্দ। সন্নিহিত হতে আরো আনন্দ।

বসে আছে দ্বিতীয় পঙক্তিতে।

প্রথম পংক্তির অনেক সিট খালি, তবু নারায়ণ ইচ্ছে করেই বসেছে পিছনে। এইটিই তার চরিত্রের পরম মধুর বৈশিষ্ট্য। সে কখনো নিজেকে অগ্রগণ্য বলে জাহির করতে চায় নি।" [অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত।]

৪। "নারায়ণবাবুর ক্লাস বারটায়। বারটা বাজতে তখনো কয়েক মিনিট বাকী। ……তাঁর কথাবার্তা স্বাভাবিক, কিন্তু চোখে মুখে ক্লান্তির আভাস। জিজ্ঞাসা করে জানলাম সকাল আটটায় বেরিয়েছিলেন বাড়ি থেকে কিছু খেয়ে, দুটি স্বরচিত কবিতা গ্রামোফোনে রেকর্ড করাতে। বারটায় ক্লাস, আর বাড়ি ফেরা হয়নি। দুটি ক্লাস করে বাড়ি ফিরবেন। স্নানাহার যদি হয় তো হবে অপরাহ্নে।

সে ক্লাস তাঁর রুটিনের নয়, স্পেশ্যাল ক্লাস। ছাত্র-ছাত্রীরা অতিরিক্ত ক্লাস চেয়েছে এবং তিনি নিতে সম্মত হয়েছেন। সাধারণ মানুষ অসুস্থ হলে ছুটি নেয়, না হলেও কেউ কেউ নিয়ে থাকে। নারায়ণবাবুর চরিত্র বিপরীত; তিনি নিজের কাজ নিজেই বাড়িয়ে তোলেন। রুটিনের আইনের চেয়ে অন্তরের আইন তাঁর কাছে বেশী বলবান। তাই ছাত্ররা চিরদিন তাঁকে ঘিরে ভিড় করেছে আর তিনিও তাদের কাছে অকৃপণভাবে নিজেকে দান করেছেন।" [শ্রীবিজনবিহারী ভট্টাচার্য।]

৫। "বাঙলা দেশের মনের অনেকটা স্থান নারায়ণ জুড়ে ছিলেন। সেটি আধিপত্যের রাজাসন নয়,—প্রীতির, সরলতার এবং কল্যাণবুদ্ধির। এখানে নারারণ একদিনেই পৌঁছে গিয়েছিল প্রথম যৌবনেই—তাঁর সৃষ্টির আবেদন নিয়ে। প্রায় তখনি দেখি তাঁর সাগ্রহ সাহিত্য-জিজ্ঞাসা-বুদ্ধির স্নিগ্ধ জ্যোতিঃ। সাহিত্য অধ্যাপনায় তখনি সে ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে উৎসাহের উৎস। নতুন নতুন মনে ধরিয়ে দিয়েছে সাহিত্য প্রীতির প্রদীপ। তবু সেখানে সে গুরু গাম্ভীর্য সুদূর নয়। নাম করে সে প্রত্যেককে চেনে, প্রত্যেকের আত্মীয়, আপনার জন। ভাল অধ্যাপনার থেকেও অনেক বড়ো কথা—এই আপন হওয়া। অধ্যাপনার চরম সাফল্য সেখানে; এও এক পরম তীর্থ।……

আমরাও নারায়ণকে তাই বলে কম পাই নি—সে শুধু আমাদের সাহিত্যিক বন্ধু নয়, সাহিত্য সমাজে আমাদের প্রত্যেকেরই আপন। অনেকে আমরা সপরিবারেও তাঁর আত্মীয় হয়ে গিয়েছি। সভায় সমিতিতে অনেকেই ছিলাম সহযাত্রী। গল্পে-আড্ডায় তাঁর

সুহৃদ, প্রীতি-সরস সতীর্থ। ওসব ক্ষেত্রে নারায়ণকে না পেলে শুধু তাঁর লেখা বই থেকে নারায়ণকে পেলেও মনে করতে হ'ত পাওয়ার আরও বাকী রইল। বই-এর নারায়ণ দীপ্তিমান স্রষ্টা ও দ্রষ্টা। সাহিত্য ও সংস্কৃতির নানা সভায় সুবক্তা নারায়ণ বুদ্ধিশুভ্র যুক্তি ও বাক্যের স্নিগ্ধ ঔজ্জ্বল্যে সুদীপ্ত সুন্দর। বাণী যেন তাঁর কণ্ঠাশ্রিতা, স্বতঃ উৎসারিত প্রবাহ। চমৎকার, অথচ চমক লাগাবার বিন্দুমাত্র প্রয়াস নেই কোথাও। তাঁর খড়্গোন্নত নাসা, উজ্জ্বল চক্ষুও যেন বুদ্ধিমার্জিত মনের ও সুন্দর হৃদয়েরই সাক্ষী। আড্ডার আসরে নারায়ণ সরস, সকৌতুক, অকৃত্রিম অন্তরঙ্গতায় রসজ্ঞ ও মর্মজ্ঞ। কৌতুক বাক্যে তাঁর মন উন্মুক্ত, মুখের স্মিত হাসিতে অন্তরের কৌতুক বোধেরই পরিচয়।……"

"……কাউকে সে 'না' বলতে জানত না, 'না' করতেও পারত না। সম্পাদক বা প্রকাশক, কাউকে না। অন্য উদ্যোক্তাদেরও না। 'লিটল ম্যাগাজিন'-এর সম্পাদকরা দক্ষিণা দেবে না, এতো জানা কথা। নারায়ণ অবশ্য তা প্রত্যাশাও করতেন না। তাঁদের ওই উৎসাহ কি সাহিত্যের কম সম্পদ? মতলববাজ ব্যবসায়ীদেরই বা বাধা কোথায় নারায়ণ গাঙ্গুলীর কাছে? নিশ্চয় তারা দক্ষিণায় বিমুখ প্রতিশ্রুতিতে নন্। প্রতিশ্রুতিও দেন, কিন্তু প্রতিশ্রুতি রক্ষা না করলেও যিনি তা মনেও করিয়ে দেন না, তাঁর কাছে প্রতিশ্রুতি রক্ষা করার প্রয়োজন কি? নারায়ণের মুখে কারও সম্বন্ধে অভিযোগ নেই, মনে ক্ষোভও ছিল না। মুখে থাকত হাসি, আর মনে কৌতুক। কারণ, কারও চরিত্র চিনতে তো তাঁর অসুবিধা হয় না। ঠকতেন অনেক সময়—অর্থে, কিন্তু বুদ্ধিতে বা জীবন বোধে নয়। এখন তাই ভাবি—প্রীতির সরসতায় তাঁর মন যে বুদ্ধি শুদ্ধ সৌন্দর্য লাভ করেছিল তাতে হয়তো ওরকম ফাঁকির অভিজ্ঞতারও প্রয়োজন ছিল—জীবনকে জানলে, মানুষের ভেতরের মানুষ সেই ফাঁকি থেকেও নিজেকে গড়ে তোলে সহৃদয় কৌতুকে। নারায়ণের ভেতরের মানুষ অন্তত তা করেছিল। তার হাসিতে, কথায় আলাপে আলোচনায় প্রতি মুহূর্তে তাই মনে হয়েছে, নারায়ণ সহৃদয় শিল্পী শুধু নয়, সকৌতুক জীবন দ্রষ্টাও। এই কৌতুক-সরস নারায়ণকে তাঁর গল্প-উপন্যাসের পাঠক-পাঠিকারা কতটা পেয়েছেন?" [গোপাল হালদার]

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের সাহিত্য-জীবনের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনার আগে, তাঁর শিক্ষা-জীবনের সঙ্গে সঙ্গে রাজনৈতিক চিন্তাদর্শের বিষয়ে যতটুকু সংবাদ বা তথ্য জানা যায়, সে সম্পর্কে কিঞ্চিৎ আলোচনার প্রয়োজন আছে।

শ্রদ্ধেয় গোপাল হালদার মহাশয় তাঁর "সংস্কৃতির সতীর্থ" প্রবন্ধে বলেছেন: "নারায়ণের পাঠকেরা জানেন—দেশের মুক্তি, সাধারণ মানুষের স্বাধিকারে প্রতিষ্ঠা—এসব নারায়ণের শিল্পী-সত্তার কাছেও ছিল এক প্রধান প্রেরণা। তাঁরাও অনেকে হয়তো জানেন না—নারায়ণের বাল্য-কৈশোরের সন্ধিস্থলে তাঁর অগ্রজ, তরুণ শেখর গাঙ্গুলী ছিলেন সে বিপ্লবী আন্দোলনের গোপন পথিক। নারায়ণের কাছে তাঁর সে রূপ গোপন ছিল না। নারায়ণের মনে সমতুল্য শ্রদ্ধা ও আস্থা ছিল দাদার মেধায় ও চরিত্রে। কলেজের প্রথম ধাপেই পুলিশের কবল থেকে সেই দাদা যে উধাও হয়ে যান আর বাড়ি-ঘরে তাঁকে নারায়ণ

দেখেন নি বহু বৎসর। উত্তর প্রদেশের বিপ্লবী গোপন কর্মীর জীবন, সেখানকার নানা জেল ও দেউলির বন্দীনিবাস পেরিয়ে কর্মে ও মতে রূপায়িত হতে হতে ক্রমে আবার প্রকাশিত হয় সে প্রদেশের কৃষক আন্দোলনে,—তার পরে বিহারের কমিউনিস্ট পার্টির উদ্যম-প্রয়াসে।" পরবর্তীকালে নারায়ণ বাবুর মার্ক্সীয় রাজনীতির প্রতি আকর্ষণ, উচ্চ-শিক্ষার্থে কলকাতায় আগমনের পর এবং আরও নিশ্চিতভাবে কর্মক্ষেত্রে যোগদানের পর এখানকার কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ, 'প্রগ্রেসিভ রাইটার্স এ্যাসোসিয়েশন'-এর সঙ্গে যোগ-এর ভিত্তিভূমি গঠনে মেজদা শেখর গাঙ্গুলী যে তাঁকে প্রভাবিত করেছিলেন এ কথা ভাবা হয়তো অসঙ্গত হবে না। তাঁর সহপাঠী, সমালোচক-সাহিত্যিক শ্রীঅচ্যুত গোস্বামী মহাশয় কিশোর তারকনাথের সম্বন্ধে যা বলেছিলেন এখানে আর একবার উল্লেখ করতে চাই—"সেই সময়ে [আই. এ. পড়বার সময়—১৯৩৩-৩৪ সাল] সে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের পরম অনুরাগী, গান্ধীজীর নীতিতে বিশ্বাসী।" প্রথম কলেজ-জীবনে যাঁর জীবনচর্যায় 'আশ্রমিক প্রভাব' বিবেকানন্দ ভক্তি এবং গান্ধীজীর নীতিতে বিশ্বাস লক্ষ্য করেছিলেন অচ্যুতবাবু, তিনিই আবার লিখেছেন: "অনেক বছর পরে কলকাতার এক ফ্যাসিস্ট বিরোধী সাহিত্য সম্মেলনে যোগ দিতে এসে তারকনাথের সঙ্গে আকস্মিক ভাবে সাক্ষাৎ লাভ করি।……সেদিন তার সঙ্গে অনেকক্ষণ আলাপ-আলোচনা হয়েছিল। জনেতে পারলাম, সে এখন মার্কসবাদের প্রতি অনুরক্ত। ভারতবর্ষে People's War নামক পত্রিকাটিকেই সে একমাত্র সুস্থ মস্তিষ্কের পত্রিকা বলে মনে করে। পূর্ব জীবনের সে ঈশ্বরবাদী চিন্তাধারাকে ত্যাগ করে নিরীশ্বরবাদী চিন্তাধারা গ্রহণ করেছে বলে বিস্ময়ের কিছু নেই। সে জানাল, তার প্রথম জীবনের ধর্মমূলক শিক্ষা নিষ্ফল হয় নি। সেই শিক্ষা জীবন সম্পর্কে তার মনে যে নিষ্ঠার জন্ম দিয়েছিল, সেই জীবননিষ্ঠাই তাকে মার্কসবাদের দিকে ঠেলে দিয়েছে।" অতএব নারায়ণবাবুর প্রথম তরুণ জীবনের (ফরিদপুর কলেজে পাঠকালীন) রাজনৈতিক বিশ্বাস পরবর্তীকালে বরিশালে ব্রজমোহন কলেজে পাঠদশায় মেজদার সক্রিয় বিপ্লবী আন্দোলন এবং পরে কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগদান যে, নারায়ণবাবুর চিন্তার জগতে একটি আন্দোলন সৃষ্টি করেছিল, এরূপ কল্পনা আমরা করতে পারি। অতঃপর কর্মজীবনে প্রবেশ করে মার্কসবাদী চিন্তার সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা—বিষয়ে তাঁর দু-একজন বন্ধুর উক্তির সামান্য কিছু অংশ আমরা এখানে তুলে ধরব। সময়টা সম্ভবতঃ ১৯৪৬ সাল।

জলপাইগুড়ির আনন্দচন্দ্র কলেজ থেকে নারায়ণবাবু কলিকাতার আমহার্স্ট স্ট্রীটের সিটি কলেজে যোগদান করেছেন। তাত্ত্বিক অধ্যাপক সতীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী এখানে তাঁর সহকর্মী। তিনি নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের স্মৃতিচারণা করতে গিয়ে বলেন: "সে যুগে সিটি কলেজে আমরা কয়েকজন 'কমউনিস্ট' অধ্যাপক ছিলাম। ঐ যুগটা এখনকার যুগ থেকে নানাদিক থেকেই স্বতন্ত্র। সে যুগে কমিউনিস্ট অধ্যাপকেরা শুধু বেতন বৃদ্ধির আন্দোলনকেই পরমপুরুষার্থ বলে স্বীকার করেন নি। শত ভুলভ্রান্তি সত্ত্বেও তাঁদের মধ্যে ছিল আদর্শবাদ, দেশপ্রেম এবং কর্তব্যনিষ্ঠা। এঁদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন

খ্যাতিমান শিক্ষক। 'কমিউনিস্ট নেতৃত্ব' বলতে তখনকার কমিউনিস্ট অধ্যাপকেরা মনে করতেন যে, এই নেতৃত্ব চারিত্র্য মর্যাদায়, বিদ্যায়, বুদ্ধিতে,—কর্তব্যকর্ম যথাযথ সম্পন্ন করে প্রতিষ্ঠিত করতে হয়। হয়েও ছিল তাই। সিটি কলেজে সে যুগে মুষ্টিমেয় 'কমিউনিস্ট' অধ্যাপক ছিলেন। তাঁদের সম্পর্কে কেউ-ই বীতশ্রদ্ধ ছিলেন না। কলেজে তাঁদের নেতৃত্ব স্বীকৃত হয়েছিল। নারায়ণবাবু কার্ড হোল্ডার কমিউনিস্ট না হলেও কমিউনিস্ট ভাবাপন্ন ছিলেন। ফলে সহজেই তিনি আমাদের ঘনিষ্ঠ সহযোগী ও পরামর্শদাতা হয়ে উঠলেন অল্প সময়ে।

"নারায়ণবাবুর রাজনীতি-জিজ্ঞাসা ছিল। সমাজতন্ত্রে তিনি বিশ্বাসী ছিলেন। কমিউনিস্ট পার্টির তিনি ছিলেন সমর্থক-সমালোচক। পার্টিম্যান হলে যে গোঁড়ামি ও মতান্ধতা প্রায়ই প্রগলভ হয়ে ওঠে, ভক্তিতে গদগদ হয়ে কমিউনিস্ট আন্দোলনের বিচ্যুতি ও বিকৃতিকেও সমর্থনের প্রবণতা দেখা দেয়, পার্টিম্যান না হওয়ায় নারায়ণবাবুর তা ছিল না। স্বাধীনচিত্ততা তিনি অনেকখানি বজায় রাখতে পেরেছিলেন।"

অধ্যাপক সতীন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর বক্তব্য থেকে এ কথা খুবই স্পষ্ট যে, নারায়ণবাবু মার্কসবাদী রাজনীতিতে আকৃষ্ট হলেও বা তাঁর সমর্থন থাকলেও তাঁর 'স্বাধীনচিত্ততা' যা শিল্পীর পক্ষে অপরিহার্য বিষয়, তা বজায় ছিল। নারায়ণবাবু বিশেষ কোন রাজনৈতিক মতাদর্শের আলোয় সাহিত্যকে আচ্ছন্ন, বা প্রভাবিত করেন নি ;—প্রকৃত শিল্পীর সংযমই এখানে তাঁকে রাজনৈতিক চিন্তার মোহান্ধতা থেকে রক্ষা করেছে। এ সম্পর্কে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যাপক, নারায়ণবাবুর সহকর্মী, শ্রীবিজন বিহারী ভট্টাচার্যের মন্তব্যটি উল্লেখ্য : "অনেকের ধারণা নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রাজনৈতিক মতবাদের দিক থেকে ছিলেন বামপন্থী। হয়তো ছিলেন, হয়তো ছিলেন না। কোনো পন্থা সর্বাংশে নিন্দনীয়ও নয়, প্রশংসনীয়ও নয়। কিন্তু সে বিতর্ক এখানে অবান্তর। আমাদের দেখার কথা কারও রাজনৈতিক মত তাঁর কর্মক্ষেত্রের উপর কোনো অবাঞ্ছনীয় প্রভাব বিস্তার করছে কিনা। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়কে আমি গত চোদ্দ বছর ধরে একান্ত অন্তরঙ্গভাবে দেখেছি এবং তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশেছি। প্রত্যক্ষ রাজনীতির সঙ্গে তাঁর যদি কোন যোগ থেকে থাকে সে দিন তাঁর কৈশোরে স্বাধীনতার পূর্বে। সে রাজনীতির প্রকৃতি ছিল স্বতন্ত্র রকমের। একালে রাজনৈতিক কোনো গোষ্ঠীর সঙ্গে তাঁর কোনো যোগ ছিল বলে জানি না। অন্ততঃ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকরূপে আসার পর তাঁকে প্রত্যক্ষভাবে কোনো রাজনৈতিক কার্যকলাপের সঙ্গে যুক্ত হতে দেখি নি। আমার মনে হয় অধ্যাপকরূপে তিনি যে ছাত্র-ছাত্রীর হৃদয় জয় করতে পেরেছিলেন এটাও তার একটা বড় কারণ। শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত গোপাল হালদার মহাশয় নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রাজনৈতিক চিন্তা, বিচার, বিশ্লেষণকে কেমন ভাবে ভারতের মুক্তি আন্দোলন থেকে বিশ্বমানবের মুক্তি আন্দোলনের পর্যায়ে উন্নীত করেছিলেন, সে কথা খুব স্পষ্ট করে জানিয়েছেন। "নারায়ণ নিজের জীবন জিজ্ঞাসার দায়েই নিজের রসচেতনাকে বুদ্ধিতে, যুক্তিতে মানবিক কল্যাণবোধে মার্জিত ও পরিপুষ্ট করতে কার্পণ্য করেন নি। নারায়ণ

পড়তেন, বুঝতেন, বিচার করতেন—আর সামগ্রিকভাবে গ্রহণ করতে চাইতেন। আস্থা রাখতেন সেই জীবনদর্শনে যাতে সর্বাঙ্গীণ ও সর্বজনীন সংস্কৃতির তীর্থ রচিত হয়ে চলেছে। যে কোনো কারণেই হোক বুঝেছিলেন সভ্যতার সংকটে কারও নিরপেক্ষ থাকার উপায় নেই। আরেকটা কথাও বুঝেছিলেন—ভারতবর্ষের মুক্তির আন্দোলন বিশেষ একটা জাতির শুধু রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভের আন্দোলন মাত্র নয়। নিশ্চয়ই জাতীয় স্বাধীনতা তার একটা অপরিহার্য রূপ। কিন্তু জাতীয় মুক্তি আন্দোলনও বিশ্বমানবের মুক্তি আন্দোলনেরই অঙ্গ।"*

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের সাহিত্যিক জীবন শুরু হয়েছিল ঠিক কবে থেকে, তা আমরা সাল-তারিখ মিলিয়ে বলতে পারব না। তবে ১৯৩৩ খ্রীস্টাব্দে ফরিদপুরে কলেজে পড়তে এসেছেন যখন, তখনই যে কাব্য-শিল্প সম্বন্ধে তাঁর চিন্তা-ভাবনা অনেকখানি পরিণত, সে কথা আমরা তাঁর ফরিদপুরের কলেজ-জীবনের সহপাঠী শ্রীঅচ্যুত গোস্বামীর লেখা থেকে জানতে পারি। আরও জানতে পারি, তাঁর প্রথম সাহিত্য চর্চা কবিতা দিয়ে। এ বিষয়ে আমরা তাঁর সহপাঠীর কথার ওপর নির্ভর করতে পারি: "যাঁরা ঔপন্যাসিক ও প্রাবন্ধিক নারায়ণ গাঙ্গুলীকে চেনেন তাঁদের শুনলে হয়তো অবাক লাগবে যে, কিশোর তারকনাথের সাহিত্য-জীবনের হাতেখড়ি হয়েছিল কবিতা-রচনা দিয়ে। সেদিন আমরা ভেবেছিলাম একদিন হয়তো কবি হিসাবেই সে প্রতিষ্ঠা লাভ করবে।" সম্ভবত স্কুল-জীবন থেকেই কবিতা লেখার অভ্যাস তাঁর ছিল। তরুণ বয়সে দু'চারটি কবিতা রচনা হয়তো অল্পবিস্তর সবাই আমরা করে থাকি; কিন্তু রীতিমত কবিতা চর্চা যে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় করতেন যার জন্য তাঁর বন্ধুবান্ধবের মনে হয়েছিল যে, কবি হিসাবেই তাঁর একদিন প্রতিষ্ঠা হবে,—সে পরিচয়ও দিয়েছেন তাঁর সহপাঠী বন্ধু। "সেই সময়ে আমার অগ্রজের এক বন্ধু একখানি হাতের লেখা পত্রিকা বার করেন। তাতে আমি একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখেছিলাম নর-নারী সম্পর্কিত নীতির বিষয়ে। ঐ পত্রিকাতে তারকনাথের একটি কবিতা প্রকাশিত হয়। কবিতাটির বিষয়বস্তু যে আমাকে খুব আকৃষ্ট করেছিল তা নয়। কিন্তু তার মধ্যে যে ছন্দচাতুর্য এবং শব্দচয়নের দক্ষতা প্রকাশ পেয়েছিল তা ঐ বয়সের ছেলের কাছে সুলভ প্রাপ্য নয়; তারকনাথকে সে কথা বলতেই সে আমাকে তার আস্তানায় নিয়ে গেল। দেখলাম তার টেবিলে রবীন্দ্রনাথ সত্যেন দত্ত থেকে আরম্ভ করে অনেক কবির কাব্যগ্রন্থ সজ্জিত। প্রেমেন্দ্র মিত্রের কাব্যগ্রন্থ প্রথমাও রয়েছে দেখলাম। তারপর সে একখানি মোটা বাঁধানো খাতা বার করে দেখালো,

* সাহিত্যিক নবেন্দু ঘোষও, একসময় নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে রাজনৈতিক আলোচনার উপসংহার কেমনভাবে নারায়ণবাবু টেনেছিলেন, তা জানিয়েছেন তাঁর একটি লেখায়: "তখন আমরা রাজনীতি নিয়েও খুব আলোচনা করতাম। মনে পড়ে? বিভিন্ন দলের নানা ফতোয়া নিয়ে বিশ্লেষণ করার পর আপনি ওই প্রসংগের একদিন ইতি টেনেছিলেন এই বলে, কি হবে এত ভেবে? আমরা দেশকে ভালবাসি, যা দেশের পক্ষে শুভ তাকে সমর্থন করব আর যা অশুভ তার সঙ্গে লড়ব ব্যস, এই শেষ কথা।" 'ইদানীং সুনন্দর জার্নালে' আপনার এই মতটিই বার বার ধ্বনিত হচ্ছিল।"

দেখলাম সম্পূর্ণ খাতাখানি ভরে গেছে তার কবিতায়। একটি বেশ দীর্ঘ কাব্যও—বোধ করি নবীন সেনের পলাশীর যুদ্ধের ধাঁচে—সে লিখে ফেলেছে। কয়েকটি কবিতা সে আমাকে পড়ে শোনাল।……সব কবিতাই ছিল ছন্দে লেখা এবং অন্ত্যমিল যুক্ত। পয়ার ছন্দেরই প্রাচুর্য দেখেছিলাম ; তবে অন্যান্য ছন্দের পরীক্ষা-নিরীক্ষার চেষ্টাও অনুপস্থিত ছিল না। তখন সবে কল্লোল-কালীন কবিরা ছন্দবিহীন বা ভাঙ্গা ভাঙ্গা ছন্দে মিল ছাড়া কবিতা লিখে আধুনিক কবিতার গোড়াপত্তন করতে শুরু করেছেন। কিন্তু কিশোর তারকনাথের উপর তাদের প্রভাব তখনও পড়ে নি।"

বন্ধু ও সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার দে একটি দুর্লভ কাজ করেছেন। ছাত্রাবস্থায় নারায়ণবাবুর কয়েকটি প্রকাশিত কবিতা পুনর্মুদ্রিত করে পাঠকের অশেষ উপকার করেছেন। ১৩৪৪ খ্রীস্টাব্দের 'বিচিত্রা'র অগ্রহায়ণ সংখ্যায় নারায়ণবাবুর একটি কবিতা প্রকাশিত হয়। কবিতাটির শেষ কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করা গেল।

"পায়ে চলা ছায়াপথে,
একাকিনী চলে সাঁওতাল মেয়ে হাল্কা খুসির রথে।
পায়ে পায়ে তার তৃণের পুঞ্জ উঠিছে রোমাঞ্চিয়া,
অঞ্চল ঘায়ে নব কিশলয়ে তুলিছে চঞ্চলিয়া।
অলকে তাহার মঞ্জরী-মালা—কানে ঝুমকোর দুল,
চলার ছন্দে ঝ'রে ঝ'রে পড়ে নাগকেশরের ফুল।
দক্ষিণা বাতাসে বীথিকা-বিতানে বাজে বীণা মঞ্জুল,
বাসন্তী বনে ফুটিল বিজনে নাগকেশরের ফুল।"

ঐ বৎসরই ফাল্গুন সংখ্যায় 'বিচিত্রা' পত্রিকায় তাঁর দ্বিতীয় কবিতা "খোলা চিঠি"—বেশ দীর্ঘ—প্রকাশিত হয়। কয়েকটি পংক্তি উদ্ধৃত করতে চাই লেখকের কবি-স্বভাবের প্রকৃতিটি বোঝবার জন্য।

সম্মুখে মোর 'ম্যাক্‌বেথ' আছে খোলা,
বাতাসে উড়িছে সাইকোলজীর পাতা,
কাগজ-কলম এলোমেলো চারিদিকে,
মেঝেতে লুটায় 'হিস্ট্রি'র নোট খাতা।
শূন্য বাড়িটা—গেছে সবে সিনেমায়,
স্তব্ধ-নীরব নির্জন চারিধার,
জাপানী পর্দা দোলে জানালার গায়ে
সঙ্গীত শুধু শোনা যায় কুকারের।

ইংরাজী শব্দের যেমন-তেমন যথেচ্ছ প্রয়োগ করতে কবি এতটুকু দ্বিধা করেন নি। অর্থাৎ কবিতার শব্দ প্রয়োগ সম্পর্কে গোঁড়ামি বা কোন সংস্কার কবি রাখেন নি। কোথাও ছন্দপতন ঘটেই নি, ভাবের সহজ ও সাবলীল প্রবাহ অব্যাহত রয়েছে। তবে নারায়ণবাবুর রোমাণ্টিক কল্পনা প্রকৃতি বর্ণনায় সহজ ও স্বাভাবিক স্বাচ্ছন্দ্য বোধ

করে। পূর্বোদ্ধৃত কবিতাংশে তাঁর প্রকৃতি প্রীতির পরিচয় যেমন ফুটে উঠেছে, তেমনি এই কবিতায়ও যেখানে তিনি প্রকৃতি বর্ণনার সুযোগ পেয়েছেন, সেখানেই তাঁর রোমান্টিক কল্পনা যেন উপযুক্ত ক্ষেত্র পেয়েছে :

মনে পড়ে আজ বিহারের সেই গ্রাম,
স্নিগ্ধ নিবিড় দীর্ঘ শালের বন,
ভুট্টার ক্ষেত দূর দিশে বিসারিত,
সাদা আকাশে ভ্রমরের গুঞ্জন।
পল্লী নদীর স্বচ্ছ ফটিক্ জল,
বৈঁচি কুঞ্জে শোভিত দুইটি তীর,
পায়ে চলা পথে চলি তুমি আর আমি,
যাত্রী দুজনা শাশ্বত পৃথিবী।
সেই মনে পড়ে জালিম-গড়ের বন
মজে' আসা সেই পদ্মদীঘির পার
বটের শিকড়ে জড়ানো হাজার পাকে
জেগে ওঠে স্মৃতি ভাঙ্গা মন্দিরটার।
সূর্য তখন নামে পশ্চিম-নভে,
মাঠের বাতাসে উড়িছে তোমার চুল ;
আমি দিনু তুলে, তুমি সুস্মিতাননা
পরিলে খোঁপায় বন গোলাপের ফুল।

কিংবা,

জাগে কী স্মরণে শাল-বনান্ত পারে
তিন পাহাড়ের গোধূলি-ধূসর ছবি
সোনার পরশ বুলায় যাহার শিরে
অস্ত পথিক রক্ত-রঙীন রবি ?
বাঁধের মতন দেখা যায় রেলপথ,
কেয়ার গন্ধে ঝিমায় বিজন বন,
লঘু সাদা মেঘে আবীরের উৎসব,
তোমার কন্ঠে সুরের গুঞ্জরণ" ?

উদ্ধৃতি বাড়িয়ে লাভ নেই। দীর্ঘ কবিতাটিতে প্রকৃতির সৌন্দর্যের পট-ভূমিকায় কবির প্রেম, পুষ্পের সৌরভে সুরভিত হয়ে উঠেছে। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের সাহিত্যিক-জীবন কবি হিসেবেই শুরু হয়েছিল, এবং কবি হিসেবেই হয়তো তিনি প্রতিষ্ঠিত হতেন, কিন্তু সুসাহিত্যিক পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়—যিনি তখনকার কল্লোল, ভারতবর্ষ, শনিবারের চিঠি, বিচিত্রা, দেশ-এর যুগে কত তরুণ, উদীয়মান কবি-শিল্পীকেই হাতে ধরে বঙ্গ-সাহিত্যের পবিত্র আসরে এনে উপস্থিত করেছেন, উৎসাহ দিয়েছেন, জায়গা করে দিয়েছেন, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় কবি-জীবনের খাত বদলের পরোক্ষ কারণ স্বরূপ এ কথা বলা যেতে

পারে, এ বক্তব্যের সমর্থনে পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়ের নিজের লেখাই আমি উদ্ধৃত করব :
"......নারায়ণের সাহিত্যিক জন্ম, শৈশব ও বৃদ্ধি আমার স্মৃতিপটে সজীব হয়ে উঠছে যখন তখন।

"আমি তখন 'দেশ' পত্রিকায়। বরিশাল থেকে একটি কলেজের ছাত্র নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় নামে পর পর ক'টি কবিতা পাঠিয়েছে প্রকাশের জন্য। কবিতার স্বচ্ছ ও স্নিগ্ধ রূপ, তার দৃশ্যমাধুর্য ও শব্দচয়ন, সহজ সাবলীলতা এবং পূর্ব বাংলার সরস প্রকৃতির সুগন্ধ আমাকে মুগ্ধ করেছে। গোটা চার-পাঁচ কবিতা দেশ পত্রিকায় ছাপা হওয়ার পর তরুণ কবির কাছ থেকে একখানা চিঠি পেলাম,—লেখার বদলে সামান্য কিছু দক্ষিণা পেলেই তার চলে, লেখা পাঠানো, চিঠিপত্র লেখা প্রভৃতি টুকিটাকি খরচের জন্য বাবার কাছ থেকে পয়সা চেয়ে নেওয়ার প্রথম যৌবন সুলভ সঙ্কোচ তাকে স্বোপার্জনে আগ্রহী করেছে।......

"......পত্রোত্তরে জানালাম কবিতার জন্য পয়সা দেওয়ার নিয়ম নেই। গল্প লিখে পাঠাও, চেষ্টা চরিত্র করে যা পারি দেবার ব্যবস্থা করবো। উত্তর এলো, গল্প লেখা সম্ভব নয়, কারণ প্লট খুঁজে পাই না। আমিও হাল ছাড়ি না, কত ডাকাত ঠ্যাঙাড়ের কাহিনী, মাঝি মাল্লার দুঃসাহসিকতা, দলাদলি মারামারি চর দখলের হাঙ্গামা। বুড়োদের ও বড়দের কাছে শুনে নিয়ে গুছিয়ে লিখে দিলেই তা গল্প হয়ে উঠবে।

"হলও তাই। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় এবার এক গল্প পাঠালো, যতদূর মনে পড়ে আমার নির্দেশ মতই একটি কাহিনী, সুন্দর বাঁধুনি, অনবদ্য বিন্যাস, সত্যিকার ছোট গল্পের স্বাদে ভরপুর।"

এই ভাবে যিনি কবিতার স্বর্গ থেকে ছোটগল্পের রাজ্যে নেমে এলেন, কিছুদিন পরে দেখা গেল, এই রাজ্যের রাজা-উজীরদের দখল থেকে সিংহাসনটি কেড়ে নিয়ে এই নবীন আগন্তুককেই সেখানে বসিয়ে দেওয়া হোল। কীভাবে—তা ঘটনাটি বললেই স্পষ্ট হবে। তখন নারায়ণ বাবুর কয়েকটি গল্প এবং উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছে। মুখে মুখে তাঁর যশ ও খ্যাতি। এত দ্রুত তাঁর নাম যে প্রধানদের সঙ্গে উচ্চারিত হতে পারে তা অনেকের কাছেই বিস্ময়। এই রকম সময় ক্যালকাটা কেমিক্যাল কোম্পানি ছোটগল্পের এক প্রতিযোগিতার আয়োজন করে। এই প্রতিযোগিতায় তখনকার নামী-খ্যাতিমান অনেকেই গল্প পাঠিয়েছিলেন—স্বয়ং তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ও তাঁদের মধ্যে একজন। সেই প্রতিযোগিতার বিচারক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'ইতিহাস' গল্পটিকেই বিজয়ীর সম্মান দেন। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন, "তাঁর কাছে গল্প প্রতিযোগিতায় একবার আমরা সকলেই পরাজিত হয়েছিলাম।" পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়ের লেখায় এ বিষয়টি আরও সুন্দর ভাবে ব্যক্ত হয়েছে :

"ক্যালকাটা কেমিক্যাল কোম্পানি প্রদত্ত শ্রেষ্ঠ গল্পের জন্য 'ইতিহাস' লেখক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় যেদিন হাজার টাকা পেল, ড. নরেশচন্দ্র সেনগুপ্তের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সেই পুরস্কার বিতরণ সভায় ওই কাহিনীর উল্লেখ করেছিল নারায়ণ। একদিন পাঁচ টাকায়

টোপ দেখানো স্কুলের টাস্ক করার মত করে তাকে প্রথম ছোটগল্প লেখানো হয়েছিল, তারই লেখা একটি গল্প বাঙলার বিদগ্ধজনের কাছে শ্রেষ্ঠগল্প বলে স্বীকৃত হয়েছে, তাতে বিস্ময় প্রকাশ করে আবেগে গদোগদো হয়েছিল নারাণ।

"দুদিন বাদে কেন যেন তারাশংকরের বাড়ি গিয়েছিলাম। দেখলাম নারাণের ওই পুরস্কার লাভে তার আবেগ যেন আরো বেশী। 'নারাণের এই যে বনস্পতির মত বৃদ্ধি, তার স্বীকৃতিতে' তারাশংকর আনন্দে অভিভূত এবং তা প্রকাশে অকুণ্ঠ"। বাংলা সাহিত্যের আসরে এইভাবে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় একজন শক্তিমান ছোটগল্প রচয়িতা হিসেবে একটি মহিমময় আসন অধিকার করে নিলেন। অতঃপর একে একে অসংখ ছোটগল্প তিনি রচনা করেছেন এবং, অধিকাংশ গল্পেই তাঁর প্রতিভার স্বাক্ষর তিনি রেখেছেন। ঔপন্যাসিক হিসেবে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের খ্যাতি যতখানি, ছোটগল্পকার হিসেবে তাঁর খ্যাতি তদপেক্ষা বেশী-বই-কম নয়। বাস্তবিক পক্ষেই আধুনিক বাংলা সাহিত্যে ছোটগল্প রচনায় যাঁরা সর্বাপেক্ষা শক্তিমান শিল্পী হিসাবে খ্যাত—সেই প্রেমেন্দ্র মিত্র; তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়, বনফুল প্রমুখের সঙ্গে একই পংক্তিতে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়েরও নাম করা হয়ে থাকে।

পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের কথা-সাহিত্য রচনার উৎসমুখটি খুলে দিয়েছিলেন। তাই কবিতার স্বর্গ ছেড়ে ছোটগল্পের রাজ্যে নেমে আসতেই পাশ্ববর্তী কথা-সাহিত্যের, তথা উপন্যাসের বিশাল-বিস্তৃত রাজ্যটি দেখলেন তাঁর নাগালের মধ্যেই রয়েছে। অতএব শুরু হ'ল অধিকার করার প্রচেষ্টা। তাঁর প্রথম উপন্যাস 'উপনিবেশ'। তিন খণ্ডে সমাপ্ত, প্রায় মহাকাব্যোপম বিস্তার নিয়ে 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। তাঁর উপন্যাসের জন্মলগ্নটির সংবাদ পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়ের কাছ থেকে শোনাই ভাল—যাঁর আগ্রহ ও চেষ্টাতেই উপন্যাসখানা লেখকের খাতা-বন্দীর আড়াল থেকে পাঠকের দৃষ্টিপ্রদীপের সামনে আত্মপ্রকাশ করে এক অভূতপূর্ব চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে।

"আমি তখন 'দেশ' পত্রিকা ছেড়ে 'ভারতবর্ষে' যোগদান করেছি। সম্পাদক জলধরদার (জলধর সেন) পক্ষে সম্পাদনার কাজ এমনভাবে করা তখন আর সম্ভব নয়, কারণ দাদা তখন প্রায় স্থবির। আর সহকারী সম্পাদক ছিলেন ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। আমার উপর গল্প-উপন্যাস নির্বাচনের দায়িত্ব অর্পিত হয়।

"নারায়ণ তখন এম. এ. পড়বার জন্য এসেছে কলকাতায়।* উঠেছে সুরেন ভট্টাচার্য নামে একজন মাস্টার মশাইর বাসায়। উভয়ের আমন্ত্রণে একদিন সে বাসায় গিয়েছি। কি লিখছে এই প্রশ্নের উত্তরে নারাণ সসংকোচে জানালো তার সদ্য রচিত প্রথম উপন্যাসের কথা। আমি দেখতে চাওয়াতে আমাকে পাণ্ডুলিপি দেখাতেও

* অর্থাৎ সময়টা ১৯৩৮-৩৯ খ্রীষ্টাব্দ। কারণ নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের সহপাঠী বন্ধু হরপ্রসাদ মিত্র মহাশয় লিখেছেন: "কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে এম. এ. ক্লাসে আমরা একসঙ্গে ভর্তি হয়েছিলুম ১৯৩৮-৩৯ খ্রীষ্টাব্দে"

নারাণের সংকোচ কম ছিল না। আমার আদেশে কয়েক পাতা পড়লো সে। আমার সমগ্র চেতনায় শিহরণ জাগলো। ওর হাত থেকে টেনে নিয়ে নিজেই পড়তে শুরু করলাম। তারপর চেয়ে নিলাম ওর কাছ থেকে 'উপনিবেশ', প্রথম খণ্ডের পাণ্ডুলিপি। ধারাবাহিকভাবে তা প্রকাশ হল 'ভারতবর্ষ' মাসিক পত্রিকায়। পরবর্তী দুই খণ্ডও ভারতবর্ষেই ছাপা হয়।" তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন : "উপন্যাসখানি প্রকাশিত হয়েছিল ভারতবর্ষে। সঙ্গে সঙ্গে চমকিত হয়ে উঠেছিল সকলে। আমার মনে আছে আমি তাঁকে একখানি পত্রও লিখেছিলাম।" উপন্যাসখানি "বরিশালের সমুদ্র মোহনায় অরণ্যসংকুল নরম মাটির পটভূমিতে রচিত।" গ্রন্থরূপে 'উপনিবেশ' প্রকাশিত হয়েছে —প্রথম খণ্ড ১৯৪৪ খ্রীস্টাব্দে, দ্বিতীয় খণ্ড ১৯৪৫, এবং তৃতীয় খণ্ড ১৯৪৭ খ্রীস্টাব্দে। অবশ্য নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের সৃষ্টি-মুখর লেখনী এর মধ্যে থেমে ছিল না। একটির পর একটি গল্প ও উপন্যাস নির্ঝর ধারায় প্রবাহিত হয়েছে। সেই ১৯৩৮-৩৯ সালের পর থেকে ১৯৪৪ সালের মধ্যে যত গল্প ও উপন্যাস তিনি রচনা করেছেন, তার আংশিক তালিকা দিলেই বোঝা যাবে তাঁর সচল লেখনীর কিঞ্চিৎ পরিচয় 'মন্ত্রমুখর', 'স্বর্ণসীতা,' 'শিলালিপি,' 'মহানন্দা,' 'লালমাটি,' 'পদসঞ্চার,' 'রামমোহন' (জীবনী-নাটক), 'সম্রাট ও শ্রেষ্ঠী,' 'অসিধারা,' 'স্ব-নির্বাচিত গল্প,' 'শ্রেষ্ঠগল্প,' 'সঞ্চারিণী,' 'সরস গল্প,' 'একতলা,' 'কালা বদর,' 'জন্মান্তর,' 'দূরে মেদুর,' 'তিমির তীর্থ,' 'তৃতীয় নয়ন,' 'দুঃশাসন,' 'উর্বশী,' 'ভাঙা বন্দর,' 'ছুটির আকাশ,' 'খুশির হাওয়া,' 'ভোগবতী,' 'ভাটিয়ালী,' 'সূর্যসারথি,' 'স্রোতের টানে,' 'সনেত্রা,' 'সাপের মাথার মণি,' 'রোমান্স,' 'রূপমতী,' 'রঞ্জনা,' 'শ্বেতকমল,' 'মেঘরাগ,' চারমূর্তি,' 'গন্ধরাজ,' 'গল্প-সংগ্রহ,' 'বীতংস,' 'বৈতালিক,' 'বিদূষক,' ভস্মপুতুল,' 'শুভক্ষণ,' 'রাঘবের জয়যাত্রা,' 'ট্রফি,' 'নীলদিগন্ত,' 'ছোটদের ভালো ভালো গল্প,' 'চোখের বাহিরে,' নিশিযাপন,' 'বন-বাংলো,' 'পাতাল কন্যা,' 'নির্জন শিখর,' 'তিন প্রহর,' 'শিলাবতী,' 'টেনিদার গল্প,' 'মেঘের ওপর প্রাসাদ,' 'ছায়াতরী,' 'চিত্ররেখা,' 'কৃষ্ণচূড়া,' 'কিশোর সঞ্চয়ন,' 'একজিবিশন,' 'বন-জ্যোৎস্না,' 'বিদিশা,' 'নতুন তোরণ,' 'পদ্ম পাতার দিন,' 'কাঁচের দরজা,' 'অমাবস্যার গান,' 'আলোকপর্ণা,' 'হাঁসির আকাশ ইত্যাদি। সাল-তারিখ মিলিয়ে এ তালিকা নয় এবং সম্পূর্ণও নয়। আরও গল্প ও উপন্যাস এবং শিশু ও কিশোর রচনা তাঁর আছে, আছে 'সুনন্দর জার্নাল', আছে প্রবন্ধের বই, নাটক প্রভৃতি।

সাহিত্যিক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের একটি সাধারণ পরিচয়, যাকে 'আউট লাইন' বলা যেতে পারে, পাঠকের কাছে দেওয়া হল। প্রথমতঃ, তাঁর মধ্যে যে একটি চির-শ্যামল, হাস্যোচ্ছল, হাস্যরসিক, প্রসন্ন-কিশোর মন আছে, সেটিই শিশু ও কিশোর সাহিত্য রচনায় তাঁকে উৎসাহিত করেছে। এই রচনাগুলি কৌতুকরসের উৎসারে, হিউমারের গভীর প্রসন্নতায় এবং খুশির প্রাণাবেগে কলমন্দ্রমুখর নির্ঝরের মতোই হিল্লোলিত-প্রাণ। অবনীন্দ্রনাথ, উপেন্দ্রকিশোর, সুকুমার রায় প্রমুখের শিশুসাহিত্যের কথা বাদ দিলে, কল্লোলোত্তর যুগে শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্রের পাশে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়েরও নামটি এক

বিশেষ ধরনের কিশোর সাহিত্যের জন্য এক নিঃশ্বাসে উচ্চারিত হওয়ার যোগ্য। শরদিন্দুবাবুর ব্যোমকেশ, বিমল দত্তের সিংখুড়ো, প্রেমেন্দ্র মিত্রের ঘনাদা, এবং নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের টেনিদা কিশোর কেন, কিশোরদের পিতামাতাকেও সমানভাবেই নন্দিত করে।

অবশ্য বড়দের রচনায় যশ ও খ্যাতিলাভের অনেক পরে নারায়ণবাবু ছোটদের জন্য রচনায় হাত দেন। বিশু মুখোপাধ্যায় "ছোটদের সাহিত্যে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়" রচনায় জানিয়েছেন, "যতদূর মনে পড়ে, ১৩৫৭ সালে 'মৌচাক' মাসিক পত্রিকায় তাঁর প্রথম রচনা প্রকাশিত হয় এবং বলতে দ্বিধা নেই, এর জন্যে উদ্যোগী ছিলুম আমি নিজেই।" "ছোটদের শ্রেষ্ঠগল্প" গ্রন্থের ভূমিকাতেই স্বয়ং নারায়ণবাবুই সবিনয়ে এই স্বীকৃতি জানিয়েছেন। লেখকের স্বীকৃতির অংশবিশেষ উদ্ধার করলে পাঠকবর্গ এই সামান্য তথ্যটুকু ছাড়াও আরোও কিছু জানতে পারবেন ; তাই লোভ সংবরণ করতে পারলাম না : "বড়দের জন্যই গল্প লিখছিলাম। হঠাৎ একদিন বিশু মুখোপাধ্যায় এলেন। এসেই ফরমাস করলেন, 'মৌচাকে' গল্প লিখতে হবে ছোটদের জন্য। ছোটদের গল্প! সে দু'একবার লিখেছি কৈশোরে। মফঃস্বলের ছেলে—পাঠিয়েছিলাম কলকাতার দুটো কাগজে। তাঁরা ছেপেও ছিলেন, কিন্তু না পাঠিয়েছেন মনোনয়ন সংবাদ, না পাঠিয়েছেন কাগজ। তারপর আর একটু বড় হয়ে বড়দের পত্রিকায় চলে এসেছি। এখন ছোটদের গল্প! সে মন কোথায় পাব—ছেলেবেলায় সেই খুশির জগৎটাই বা কোথায় পাই। তবু চেষ্টা করা গেল। ...বিশুদা শুরু করিয়ে দিলেন—আর থামতেও দিলেন না। ফরমাস দিলেন হাসির গল্প লেখ একটা বার্ষিকীর জন্য। ...এমনি একটা গল্প দিলাম বিশুদাকে। সেই যে মনের ভেতর হাসির স্রোত বইল আজও তা আর থামল না"।

টেনিদা-সিরিজের গল্পগুলিই প্রধানতঃ নারায়ণবাবুকে কিশোরদের হৃদয়-সিংহাসনে সসম্মানে বসিয়ে দিয়েছে। তাঁর "চারমূর্তি" ছোটদের জন্য লেখা উপন্যাস। এই উপন্যাসখানি হাবুল সেন, প্যালারাম বাঁড়ুজ্যে, ক্যাবলা আর টেনিদাকে নিয়ে। পাড়ায় চাটুজ্যেদের রোয়াকে টেনিদার সভাপতিত্বে যে সভা বসে তা হাসির ফোয়ারা-বিশেষ।

পটলডাঙার টেনিদা নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের এক চিরস্মরণীয় চরিত্র। প্রেমেন্দ্র মিত্রের ঘনাদার মত অত 'সাবলাইম' না হলেও, টেনিদা ঘনাদারই গোত্রের। হয়তো ঘনাদার কিঞ্চিৎ প্রভাব টেনিদার মধ্যে পড়েছে। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় হিউমার-এর স্পর্শে টেনিদার যে পরিচয় দিয়েছেন, তার একটু উদ্ধৃত করি : "সে ম্যাট্রিক দিয়েছে—কে জানে এনট্রান্সও দিয়েছে কিনা। এখন স্কুল-ফাইন্যাল দিচ্ছে—এর পরে হয়তো হায়ার সেকেণ্ডারিও দেবে। স্কুলের ক্লাস টেন-এ সে একেবারে মনুমেন্ট হয়ে বসে আছে—তাকে সেখান থেকে টেনে এক ইঞ্চি নড়ায় কার সাধ্য"। টেনিদা গুলপট্টির রাজা, বাক্‌পটুতায় তুখড়, সত্যি-মিথ্যে বলে কোন কিছু তার ডিক্‌শ্‌নারিতে নেই। উদ্ভট মজার কথায় সকলকে বিস্ময়ে তাক্ লাগিয়ে দেয়। কুট্টিমামাও নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের আর এক মজাদার চরিত্র। কুট্টিমামা অর্থাৎ গজগোবিন্দ হালদার। টেনিদাই তাঁকে সকলকার সামনে প্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছে :

"জানিস, আমার কুট্টিমামা আস্ত একটা পাঁঠা খায়? তিন সের রসগোল্লা ফ‍ুঁকে দেয় তিন মিনিটে? ..." ইত্যাদি।

নারায়ণবাবুর এই সব গল্প ও চরিত্রের মধ্যে কোথাও প্রেমেন্দ্র মিত্র, কি বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়কে মনে পড়তে পারে, কিংবা ফাজলামি-চ্যাংড়ামিতে শিবরাম চক্রবর্তীর কথা মনে আসতে পারে, এমন কি, হাল্কা রসের গল্পগুলি পরিবেশন ভঙ্গীতে পি. জি. উডহাউস, মার্ক টোয়েন, বা, জেরোম কে. জেরোম-এর কথাও মনে আসতে পারে—কিন্তু বাংলা সাহিত্যে বড়দের সাহিত্য রচয়িতাদের মধ্যে একমাত্র প্রেমেন্দ্র মিত্র ও শিবরাম চক্রবর্তী ছাড়া ইদানীং আর কারুর নামই তেমনভাবে মনে পড়ে না, যিনি নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের মতো বড়দের সাহিত্যের পাশে পাশে ছোটদের জগৎটিকেও সমানভাবে আনন্দ জুগিয়ে গেছেন।* নারায়ণ বাবুর ছোটদের রচনা সম্পর্কে শ্রীবিশু মুখোপাধ্যায় বলেছেন: "নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের রচনা-বৈশিষ্ট্য, স্বল্প কালের মধ্যে তাঁকে যে ছোটদের রাজ্যে পরিচিত করেছিল, তার প্রধান কারণ, ছোটরা পেয়েছিল তাঁর রচনার মধ্যে কিছুটা অনাস্বাদিত-পূর্ব রসের স্বাদ। সে স্বাদ ছোট ছোট মনের দুঃখ-বেদনা ও হতাশার উপর দিয়েছিল আনন্দের প্রলেপ। ছোট ছোট মুখগুলি তাঁর গল্প পড়ে হাসিতে-খুসিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। ইতিপূর্বে এমন করে যেন তাদের হাসিয়েছিল খুব কম লোকই। এ হাসি স্বতোৎসারিত।"

হাস্যরস নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের সাহিত্যের স্বাদুতার একটি কারণ। প্রসন্ন হাসি, বুদ্ধিদীপ্ত হাসি, স্মিতহাসি থেকে প্রাণখোলা হাসি, তির্যক হাসি পর্যন্ত—সব হাসিতেই শিল্পীর ব্যক্তিত্বটি সহজ-সুন্দর ভাবে উন্মোচিত হয়। এইসব হাসিতে জ্বালা নেই, রোষ নেই, আঘাত করার বাসনায় এ হাসি উদ্যত ছুরিকা নয়। 'সুনন্দর জার্নাল'-এ এই রকমফের হাসির পরিচয় লুকিয়ে আছে। লেখক কুমারেশ ঘোষ নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের একটি গল্পের দৃষ্টান্ত দিয়ে হাস্যরসিক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের স্বভাবটি সুন্দর বুঝিয়ে দিয়েছেন। "'যষ্টিমধু'তে একটি ছোট্ট গল্প দিয়েছিলেন সেও যেন স্মিতহাসি।' এক অধ্যাপক পরীক্ষার খাতা দেখার আগে তাঁর এক বন্ধুকে চিঠি দিলেন এবং খাতা দেখার পর একটা চিঠি লিখলেন বন্ধুকে। শেষের চিঠিতে অজস্র বানান ভুল। পরীক্ষার খাতা দেখার ফল।

"কত পরিচ্ছন্ন মিষ্টি গল্প। সরস অথচ সরোষ নয়।"

"সুনন্দ-র জার্নাল' ছিল এই রকমই সরস আর স্মিতহাস্যময়"।

* নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের পাঠ-জীবনের সহপাঠী বন্ধু শ্রীনরেন মিত্রের মন্তব্যটি স্মরণীয়: "মনে হয় নারায়ণের মধ্যে একটি সহজ সরল ছেলেমানুষ শেষ দিন পর্যন্ত মিশে ছিল। যে সহজে হাসে সহজে ভালোবাসে, অল্পে তুষ্ট হয় অথচ যার কৌতূহলের সীমা নেই। বিদ্বান পণ্ডিত চিন্তাশীল পরিণত রসস্রষ্টার পাশাপাশি একটি চির কিশোর বাংলাদেশের কিশোর পাঠকদের সঙ্গে খেলা করে বেড়িয়েছে। তাদের হাসিয়েছে ছুটিয়েছে লম্ফঝম্পের বীরত্বে অংশ নিয়েছে। এ ক্ষমতা সাধারণ ক্ষমতা নয়।"

বিংশ শতাব্দীর চতুর্থ দশকের শুরু থেকেই একরূপ, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের বাঙলা উপন্যাসের জগতে বিচরণ। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষে সারা পৃথিবী জুড়ে তখন তীব্র অর্থনৈতিক সংকট দেখা দিয়েছে। রাজনৈতিক পরিবর্তন ও পরিস্থিতি দ্রুত নতুন রূপ নিচ্ছে। মার্কসের তত্ত্ব ও চিন্তা পুঁজিপতিদের বিরুদ্ধে ও পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থার শোষণ ও শাসনের বিরুদ্ধে, ধন বণ্টনের বৈষম্যের বিরুদ্ধে আপোসহীন সংগ্রামের ডাক দিচ্ছে পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তের দিকে। ধর্মের বন্ধন শিথিল হওয়ায় এবং ফ্রয়েডীয় যৌনতত্ত্ব মানুষের চেতনার মূলে নাড়া দিতে থাকায় এবং তৎসহ বৈজ্ঞানিক যন্ত্র যুগের দানবীয় আবির্ভাবে মানুষের মূল্যবোধ কমতে শুরু করেছে। ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে এর সংগে অধিকন্তু যুক্ত হয়েছে বিদেশী শাসকের শোষণ-বঞ্চনা-অত্যাচার একদিকে, অপরদিকে বিদেশী শাসকের বিরুদ্ধে রক্তপ্লাবী মুক্তিসংগ্রাম। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনা লগ্নে এই অর্থনৈতিক, সামাজিক, ও রাজনৈতিক সংকট ও সমস্যাগুলি তীব্রতর রূপ গ্রহণ করেছে। একদিকে ফুলে ফেঁপে উঠছে দেশী-বিদেশী মজুতদার, কালোবাজারী, ফাট্‌কাবাজারীর দল, অপরদিকে দেশজুড়ে দুর্ভিক্ষ, অভাব, অনটন, ক্ষুধার জ্বালা, শীর্ণ শোষিত শ্রেণীর "একটু ফ্যান দেবে মা," "একমুঠো ভিক্ষে দাও মা" ইত্যাদি কাতর আর্তনাদ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধান্তে নতুন এক সমস্যা ও পরিস্থিতি দেখা দিল। আমরা স্বাধীনতা লাভ করলাম ঠিকই, সেই সঙ্গে দেশ বিভাগ জনিত উদ্ভূত হ'ল উদ্ভট পরিস্থিতি, ঘনীভূত হ'ল সংকট, দেখা দিল গণবিক্ষোভ, নানা ধরনের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক আন্দোলন।

এই সময়ের ঘটনাবর্তের সঙ্গে মিলিয়ে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পটভূমিকার পরিপ্রেক্ষিতে আধুনিক যুগের উপন্যাস বিচার করতে হবে। এই সমস্ত ঘটনা ও পরিবেশ-পটভূমিকা শিল্পীর জীবনদর্শন নিরূপণে সহায়ক। বঙ্কিমচন্দ্র-রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্র উপন্যাস রচনার যে পথ, কৌশল ও পদ্ধতি তুলে ধরেন, আধুনিক যুগের ঔপন্যাসিকগণ সে পথ ত্যাগ করে নতুন আঙ্গিক-রীতি নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু করেন। শিল্পকাহিনীর গঠন-কৌশলে নব-নব রীতি, নব-নব পদ্ধতি নিয়ে পরীক্ষা চলে। উপন্যাসের বিষয়বস্তুতেও অভিনবত্ব এল। কঠিন-কঠোর বাস্তব সমাজের নানা সমস্যা ও সঙ্কট, অর্থনৈতিক সঙ্কট ও পরিস্থিতি, নর-নারীর যৌন সমস্যা, রাজনৈতিক আন্দোলন, ইতিহাসের বিচার ও নবমূল্যায়ন চেষ্টা উপন্যাসের বক্তব্য বিষয় হয়ে উঠতে লাগল। ঘটনাপরিস্থিতি ও চরিত্রের-বিচার ও বিশ্লেষণে মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গী এবং শিল্পীর তীক্ষ্ন বুদ্ধির ঔজ্জ্বল্য চোখে পড়ল; চোখে পড়ল তীক্ষ্ন বুদ্ধিদীপ্ত ভাষা। এক কথায় উপন্যাসের এক নতুন যুগ শুরু হল। জগদীশ গুপ্ত, ধূর্জটিপ্রসাদ, অন্নদা-শঙ্কর, বিভূতিভূষণ, গোপাল হালদার, মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর, প্রেমেন্দ্র-অচিন্ত্য-বনফুল প্রমুখ ঔপন্যাসিকগণ এই নতুন যুগ গঠনে সক্রিয় ছিলেন। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় এই নতুন যুগের তরুণ পথিক, নবীন আগন্তুক। সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, "তিরিশের ঔপন্যাসিকদের সার্থক উত্তরাধিকারকে উপন্যাসে বহন করার

কর্তব্যবোধ চারের ও পাঁচের দশকে একমাত্র নারায়ণ বাবুরই ছিল। সে উত্তরাধিকারের মূল কথা হল জীবনপ্রেম।" ("বাঙলা উপন্যাসের কালান্তর"।)

নারায়ণবাবুর প্রথম উপন্যাস তিনখণ্ডে সমাপ্ত 'উপনিবেশ'। প্রচলিত বঙ্কিমী ঐতিহাসিক উপন্যাসে যেমন ঐতিহাসিক ঘটনা-কাহিনী ও ইতিহাসখ্যাত চরিত্রগুলির সাহায্যেই মুখ্যত ঐতিহাসিক কাহিনী-অংশটি গড়ে তোলা হয়, তার সঙ্গে যুক্ত হয় শিল্পীর জীবনদর্শন সঞ্জাত উপন্যাসের কল্পিত কাহিনীর একটি ধারা। নারায়ণবাবু সেই গতানুগতিক পথকে নবরূপ দান করলেন। তিনি বুঝিয়ে দিলেন, ইতিহাসের ঘটনা বা কাহিনী এবং চরিত্র থাকলেই একটি যুগের পরিমণ্ডল গড়ে ওঠে না, একটি যুগের ইতিহাস বলতে বোঝায় সেই যুগের সামাজিক অবস্থা-প্রথা-সংস্কার, আচার-ব্যবহার, অর্থনৈতিক অবস্থা, ধর্মীয় সংস্কার প্রভৃতি সব কিছুই। ইতিহাসের বিচার-বিশ্লেষণ ও নবমূল্যায়নেই ঐতিহাসিক উপন্যাসের নতুন কাঠামো, নতুন মহিমা দিলেন নারায়ণ বাবু। এ পথ ঠিক প্রচলিত পথ নয়, একটু স্বতন্ত্র। শুধু তাই নয়, ইতিহাসের বিষয় নির্বাচনেও তিনি তাঁর গভীর সমাজবোধ এবং মননশীলতার পরিচয় দিলেন। ভারতের মধ্যযুগের ভোগ-বিলাস, মোঘল ইতিহাস, বা ঐ যুগের রাজপুত-মহারাষ্ট্রের বীরগাথা অবলম্বন করে অসংখ্য কাব্য, নাটক এবং উপন্যাস বাঙলা সাহিত্যের একটি বড় অংশ অধিকার করে আছে। শিল্পীরাও এই ইতিহাস গ্রহণ করে সহজ তৃপ্তি এবং নিশ্চিন্ততা লাভ করে আসছিলেন। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ইতিহাসের বিষয় নির্বাচন করলেন মধ্যযুগ ও আধুনিক যুগের সন্ধিলগ্ন থেকে, যে ইতিহাস-কাহিনী ও ঘটনার মধ্যে নাটকীয় চমক আছে যথেষ্ট কিন্তু কেউ সেদিকে ফিরে তাকায় না, জীবনের স্রোত আছে তীব্র, কিন্তু রয়ে গেছে অগোচরে, জীবনের ঘাত-প্রতিঘাতে, উত্থানে-পতনে, গভীরতায় ও বিস্তারে মহাকাব্যোপম যে জীবনধারা সুপ্রাচীন কাল থেকে মানব-ধমনীতে প্রবাহিত হয়ে আসছে, তার জটিল ও আদিম প্রবৃত্তি হিংসা-দ্বেষ—প্রেম প্রভৃতি রক্তের সংস্কারে—সেই-ইতিহাস কাহিনীকে শিল্পরূপ দিলেন নায়ায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়। এ পথে তাঁর আগে কেউ চলেন নি। এ পথ অকর্ষিত ছিল। প্রথম উপন্যাসেই শিল্পী নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় দুঃসাহসিকতার পরিচয় দিলেন। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের জীবন ও ইতিহাস-সম্পর্কিত নতুন দৃষ্টির পরিচয় ড· শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় খুব সুন্দর করে দেখিয়েছেন, "বাঙলা দেশের দীর্ঘ-প্রসারিত, বৈচিত্র্যহীন সমভূমির প্রান্তভাগে যেমন একটি পার্বত্য বন্ধুরতা ও আরণ্য দুর্ভেদ্যতার প্রাচীরবেষ্টনী আছে, তেমনি তাহার শান্ত, নিস্তরঙ্গ জীবনযাত্রার সুদূর পশ্চাৎপটে একটা অসংস্কৃত হৃদয়োচ্ছ্বাস ও বন্য, দুর্বার আবেগের গভীর-রেখাঙ্কিত সীমান্ত প্রদেশ আছে। ভারতের অন্যান্য প্রদেশের আর্যজাতির সহিত তুলনায় বাঙালীর রক্তধারা ও চিত্তবৃত্তিতে আদিম অনার্য প্রভাবের বিচিত্রতর সংমিশ্রণ সুপ্ত আছে। মনের অবচেতন স্তরে সংবৃত এই অতীত সংস্কার কখনও কখনও অতর্কিতভাবে তাহার রক্তে দোলা দেয়, তাহার জীবনের ধূসরতার মধ্যে এই রক্তরেখা কোন কোন মুহূর্তে ঝিলিক দিয়া উঠে। বাঙালী জীবনের এই প্রখর-রাগদীপ্ত প্রত্যন্ত-

প্রদেশ আধুনিক যুগের যে সমস্ত ঔপন্যাসিকের তীব্র কৌতূহল ও ঐতিহাসিক অনুসন্ধিৎসা জাগ্রত করিয়াছে তাহাদের মধ্যে শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, সর্বাপেক্ষা বয়ঃকনিষ্ঠ হইলেও, শ্রেষ্ঠতম। তাঁহার তিন পর্বে সমাপ্ত 'উপনিবেশ' উপন্যাসটি এই ভূগর্ভলুপ্ত খরতর চেতনাধারাকে, এই আদিম আরণ্য সংস্কারকে নূতন করিয়া উপলব্ধি করার একটি চমকপ্রদ প্রচেষ্টা।" ["বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা—" ৩য় সং, ১৯৫৬ ।]

আরণ্য প্রকৃতি ও মানুষের আদিম প্রবৃত্তির সংস্কারের ইতিহাস থেকে আধুনিক যুগের জীবন ও সমাজ ভাবনায় উত্তরণেই নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের মুন্সিয়ানা এবং শক্তিমত্তার পরিচয় নিহিত। 'উপনিবেশ' যে ত্রুটিমুক্ত এ কথা কেউই বলবেন না, এবং এ আলোচনাও এখানে অবান্তর। শিল্পীর ইতিহাস-চেতনা ও সমাজবোধ কেমনভাবে তাঁর উপন্যাসগুলিকে একটি স্বাতন্ত্র্য দিয়েছে, এটি দেখানোই আমাদের উদ্দেশ্য। ড. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 'উপনিবেশ'-এর আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন, "লেখক একটা বিশেষ উপপত্তিমূলক উদ্দেশ্য লইয়াই এই উপন্যাস লিখিয়াছেন ইহাই মনে হয়। অতীত যুগের বংশপরম্পরাগত জীবনপ্রেরণা কিরূপ অলক্ষ্য অনিবার্যতায় আধুনিক জীবনে সংক্রামিত হয় ইহাই তাঁহার প্রতিপাদ্য বিষয়।" আধুনিক যুগের সমাজ-জীবনে পুঁজিপতি, শিল্পপতি, কালোবাজারি, অত্যাচারী শাসক প্রভৃতির প্রতাপে দরিদ্র শ্রমিক-কৃষক প্রভৃতি সাধারণ মানুষ শোষিত, নিপীড়িত ; মানবিক অধিকার নিয়ে বাঁচার সুযোগ নেই তাদের। এই কঠোর কঠিন বাস্তবের বিরুদ্ধে, সর্বহারা অসহায় মানুষের পক্ষে যারা লেখনী ধারণ করেছিলেন, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় তাঁদেরই অন্যতম। তাঁর উপন্যাসগুলিতে শোষিত, বঞ্চিত, পীড়িত, দুর্গত মানুষের চিত্রই শুধু নেই, তাদের ন্যায়সঙ্গত অধিকার বা দাবির দিকটিও তিনি চিন্তা করেছেন। সুসাহিত্যিক এবং সাংবাদিক শ্রীদক্ষিণারঞ্জন বসু মহাশয় " 'উপনিবেশ' থেকে 'সন্দেহের অবকাশে' " প্রবন্ধে দুর্গত শ্রেণীর জন্য নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাসগুলিতে যে সমবেদনা ও সহানুভূতি প্রকাশ পেয়েছে তারই বিশ্লেষণ করতে চেয়েছেন। তাঁর প্রথম উপন্যাস থেকেই যে এই মনোভাব ব্যক্ত শ্রীবসু সেটিই বলতে চেয়েছেন, "চব্বিশ-পঁচিশ বছর বয়সের যুবক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রথম উপন্যাসে সেদিন যে দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিফলিত হয়েছিল, আমরা তাতে এক তরুণ লেখকের মধ্যে নতুন জীবন-দর্শনের আভাষই মাত্র পেয়েছিলাম। সেই জীবন-দর্শনের গভীরতা শিল্পীর বয়ঃবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশই যে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে তাঁর পরবর্তী রচনাবলীর বিশ্লেষণেই তা' অনুভূত হবে। কিন্তু সমস্ত মানুষের সমান অধিকারের বোধকে সব মানুষের মধ্যে জাগিয়ে তোলার লক্ষ্যে স্থির ছিলেন কথাশিল্পী নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় এবং ব্রেখ্‌ট-এর **'Fighting Realism'** শ্লোগানের সঙ্গে তাল রেখেই তিনি যেন শোষিত ও দুর্গত মানুষের সমাজ-চিত্র আঁকতে আঁকতে শেষ অবধি 'মানব প্রকৃতির জটিল রহস্যের উন্মোচন' করেই চলেছিলেন।"

এই কথাটিই ভবানী মুখোপাধ্যায় 'নারায়ণের জগৎ' প্রবন্ধে খুব সুন্দর করে বলেছেন : "নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের দৃষ্টিভঙ্গী ছিল যুগ-সচেতন এবং সেই পর্ব-

সুরীদের পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলশ্রুতি চোখের সামনে থাকলেও তিনি একটি স্বতন্ত্র পথ ও আদর্শ অনুসরণ করেছিলেন।

" 'উপনিবেশে'র কাহিনী গতানুগতিকতা মুক্ত। চর-ইসমাইলকে কেন্দ্র করে কয়েকটি চরিত্র আবর্তিত। এই দুঃসাহসী এবং দুর্দম মানুষগুলি সকলে ঠিক বাঙালী না হলেও তারা বাঙলা দেশের সংগে জড়িয়ে পড়েছে। তাদের সংগে আছে কয়েকজন রহস্যময়ী রমণী। এরা নরমাংশ লোলুপ কাপালিক। সবরকম দুষ্কর্মে এদের অসীম উৎসাহ; কিন্তু যৌবন চিরস্থায়ী নয়। যৌবনের আবেগ ক্রমশঃ স্তিমিত হয়ে আসে, জীবনের অপরাহ্নে পৌঁছে এইসব মানুষের রূপান্তর ঘটে, তারপর এসেছে যুদ্ধ এবং তার আনুসঙ্গিক উপসর্গ। মহাজন আর মজুতদারদের দল এদের জীবনে নিয়ে আসে মরণের হাতছানি। এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে এরা রুখে দাঁড়ায়। এদের যে বন্য হিংস্রতা অন্যপথে চলেছে সেই মনোভঙ্গী বিদ্রোহের মূর্তিতে মাথা তুলে দাঁড়ায়।"

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাসগুলিতে যেমন তাঁর গভীর সমাজবোধের পরিচয় আছে, যে সমাজবোধের সংগে অম্বিষ্ঠ হয়েছে শিল্পীর ইতিহাস-চেতনা, তেমনি প্রকাশ পেয়েছে সমসাময়িক কালের রাজনৈতিক চিন্তা ও ভাবনা। ড. শ্রীকুমার বন্দোপাধ্যায় নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাসগুলিতে ইতিহাস-চেতনা ও রাজনৈতিক-চেতনার মৃণাল-সন্ধি লক্ষ্য করেছেন: "...প্রায় সমস্ত উপন্যাসেই তাঁহার ইতিহাস-চেতনা ও রাজনৈতিক বোধের প্রখর প্রাধান্য তাঁহার ঔপন্যাসিক জীবন-দৃষ্টিকে গভীরভাবে প্রভাবিত করিয়াছে। 'সম্রাট ও শ্রেষ্ঠী,' 'মহানন্দা' ও 'লালমাটি' উপন্যাস-ত্রয়ে বরেন্দ্রভূমির প্রাচীন ইতিহাস ও ভূতত্ত্ব,..........নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের সদা-প্রবুদ্ধ ঐতিহাসিক চেতনা এই সুদূর মহিমান্বিত অতীতকে বাঁচাইয়া তুলিয়া আধুনিক জীবনে ইহার দুর্নিরীক্ষ অথচ নিগূঢ় ভাবে ক্রিয়াশীল প্রভাবটি পরিস্ফুট করিতে চাহিয়াছে।" ভবানী মুখোপাধ্যায় এই উপন্যাস তিনটি সম্বন্ধে আরও সুন্দর করে বলেছেন: "এই তিনটি উপন্যাসের মধ্যে লেখকের ইতিহাস চেতনার পরিচয়। ঐতিহ্য আর ইতিহাসকে তিনি অবজ্ঞা করতে পারেন নি। কিন্তু ইতিহাসের প্রাণহীন কঙ্কালটুকুকে আঁকড়ে ধরেও রাখেন নি; তাই ইতিহাসের সংগে মিশেছে সমকাল—ইতিহাসকে আশ্রয় করে তিনি তার সংগে যুক্ত করেছেন এ কালের ভাবনা। 'লালমাটি'তে আছে ব্যবসায়ী-বণিক সম্প্রদারের সংগে স্থিতিমান জমিদারদের স্বার্থ-সংঘাত। জমিদারের রক্তে রক্তে আছে প্রভাব ও প্রতিপত্তি প্রকাশের আগ্রহ। লালমাটির লালজী ও অপর্ণা চরিত্র বাংলা সাহিত্যের এক বিস্ময়কর সৃষ্টি। জমিদার যখন পরাভূত তখন সে এগিয়ে এল প্রজার স্বার্থ রক্ষার দায়িত্ব ঘাড়ে নিয়ে। মধ্যবিত্ত যেমন কিষাণ ও শ্রমিকের নেতৃত্বভার নিজের হাতে তুলে নেয় আত্মরক্ষার তাগিদে, তেমনই জমিদার বণিকদের সংগে লড়াই-এ প্রজাদের সংগে হাত মিলিয়েছেন।

"...'স্বর্ণসীতা' উপন্যাসেও আছে রাজনীতি। রাজনীতি কিভাবে স্বামী-স্ত্রীর জীবনে অভিশাপ রচনা করে তার ইঙ্গিত আছে।"

'মহানন্দা'-র প্রতীকধর্মী পরিকল্পনায় রোমান্টিক কবি-কল্পনার স্পর্শে মানুষের শুকিয়ে আসা জীবনে নবজীবনের প্রবাহ আনার চেষ্টার সঙ্গে শিল্পীর রাজনৈতিক ভাবনা এমনভাবে স্বাঙ্গীভূত হয়েছে যে, কোথাও তা শিল্পরূপকে বিঘ্নিত করে নি।

"পদসঞ্চার"-এ ইতিহাসচেতনার সঙ্গে মিলেছে তদানীন্তন কালের রাজনৈতিক ঘটনাবর্ত এবং গভীর সমাজবোধ যার মূল নিহিত আছে ধর্ম ও সংস্কৃতির গহন গভীরে।

পরবর্তীকালের উপন্যাসগুলিতে সমসাময়িক কালের রাজনীতিগত দলাদলি, তরুণ যুবশক্তির তাতে অংশ গ্রহণ, তাদের সামনে নেই কোন উচ্চ আদর্শ, আছে হিংসা, হানাহানি, দ্বেষ-বিদ্বেষ, স্বার্থান্বেষী সমাজের আত্মকেন্দ্রিকতা ; আছে কালোবাজারি ও মজুতদারদের শোষণ, আছে তথাকথিত রাজনীতিবিদ ও তাদের গুণ্ডাশ্রেণী। দেশের যুবশক্তির অপচয়, অবক্ষয়িত সমাজের চিত্র, এবং রাজনীতির নামে গুণ্ডামি-দলবাজি, গদি নিয়ে কাড়াকাড়ি। বলা বাহুল্য, স্বাধীনতা-উত্তর যুগে বিশেষভাবে ষাটের দশক থেকে সমাজের এই প্রখর বাস্তব চিত্র তাঁর উপন্যাসগুলিতে স্পষ্টরেখায় চিত্রিত। 'মেঘের ওপর প্রাসাদ', 'নির্জন শিখর', 'অমাবস্যার গান', 'ভস্মপুতুল', 'সন্দেহের অবকাশে', 'আলোকপর্ণা', প্রভৃতি উপন্যাসে শিল্পীর এই গভীর সমাজবোধ রাজনৈতিক চেতনাকে তার সঙ্গে অন্বীষ্ট করে নিয়ে উজ্জ্বল বর্ণে ফুটে উঠেছে। কিন্তু এই অবক্ষয়ী সমাজের ছবি এঁকেই তিনি তাঁর দায়িত্ব শেষ করে দিলে তাঁকে একজন প্রতিভাবান শিল্পী হিসাবে আমরা ভাবতাম কিনা সন্দেহ। এরই মধ্য থেকে জীবনের সত্যকে অন্বেষণ করতে চেয়েছেন তিনি। শুষ্ক, হতাশাগ্রস্ত জীবনে আশা-আদর্শকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন ; করুণা ও প্রেমের স্পর্শে জীবনকে সঞ্জীবিত করতে চেয়েছেন। অন্ধকারের গর্ভ থেকে একটি আলোর পাপড়ি উর্ধ্ব আকাশের দিকে নিজেকে বিকশিত করতে চাইছে: "অন্ধকার—যন্ত্রণার অন্ধকার। তবু একটা আলোর পাপড়ি থেকে থেকে ভেসে উঠতে লাগল তার ওপর।" [আলোকপর্ণা]

প্রখর বাস্তববাদী সমাজ-চেতন-শিল্পী হলেও নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের গল্প-উপন্যাসগুলির মধ্যে রোমান্টিক কল্পনার জাদুস্পর্শ আছে ; আর তারই জন্য তাঁর গল্প-উপন্যাসগুলি পাঠকের কাছে এত আস্বাদনীয় এবং আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে বলেই মনে হয়। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের শিল্পী-সত্তা 'রিয়ালিজম' এবং 'রোমান্টিসিজম'-এর মৃণালসন্ধি। "উপনিবেশ" থেকে সম্ভবতঃ—সর্বশেষ—উপন্যাস "হাঁসের আকাশ" (শারদীয় 'বেতার জগৎ', ১৩৭৭-এ প্রকাশিত)—পর্যন্ত কবি নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের রোমান্টিক কল্পনা কোথাও বিবর্ণ হয়ে যায় নি। তাঁর এই রোমান্টিক কল্পনা প্রধানতঃ প্রকৃতি বর্ণনায় এবং কবি-ভাষায় আত্মপ্রকাশ করেছে, আর মিশে আছে শিল্পীর জীবনভাবনায়—জীবনের আশায় ও স্বপ্নে—ঔপন্যাসিক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের জীবন-দর্শনের ভিত্তিভূমি হয়ে। কয়েকটি যেমন-তেমন উদ্ধৃতি প্রথম থেকে শেষ [সম্ভবতঃ] উপন্যাসের মধ্য থেকে বেছে নিয়ে সাজিয়ে দেওয়া হোল, শিল্পীর বর্ণনা-কৌশল, এবং ভাষার সৌন্দর্যের নিদর্শনস্বরূপ :

(১) "আবার ওদিকে যখন মেঘনার কালো জলে কলকল করিয়া ঘূর্ণী ঘুরিতে থাকে, আকাশের একপ্রান্তে এতটুকু একটু বৈকালী মেঘ দেখিয়াই বৈশাখী নদী ইলসা উন্দাম হইয়া উঠে, তেঁতুলিয়ার মুখ দিয়া যখন পাহাড়ের মত খাড়া হইয়া দুর্জয় বেগে 'শরের' জল ছুটিয়া আসে, তখনো সেই মৃত্যু-তরঙ্গের নিভৃত তলাটিতে বসিয়া জীবন-কীট অন্ধপ্রেরণায় রচনা করিয়া চলে।" ['উপনিবেশ']

(২) "এই সাতদিন—সাতরাত্রে একাদশীর চাঁদ কলায় কলায় মধুচক্রের মতো ভরে উঠল। শীতের কুয়াশামাখা রাত্রির সমুদ্রের ওপর দেখা দিল পূর্ণিমার রাত—উজ্জ্বল কুয়াশাকে মনে হল কার অপরূপ মুখের ওপর সোনালি মসলিনের এক বিচিত্র অবগুণ্ঠন। ভোর বেলা সেই চাঁদ সামুদ্রিক শঙ্খের মতো বিবর্ণ হয়ে অস্ত গেল—তার পরে চলল অভ্রান্ত ক্ষয়ের ইতিহাস। পূর্ণিমা রাতের ম্লান তারাগুলি ক্রমশ দীপিত হয়ে উঠতে লাগল—মুমূর্ষু চাঁদ দিনের পর দিন নিজের আয়ুর ইন্ধন দিয়ে নিভে-আসা নক্ষত্রদের জ্বালিয়ে তুলতে লাগল ধীরে ধীরে।" [পদসঞ্চার]

(৩) (ক) "তারপর সমস্ত রাত।

সামনের আকাশ দিয়ে মেঘের পর মেঘ ভাসল, তারার তারা ডুবল, আমার কোন্ পাশে কখন যেন মেটে-আলো ছড়ানো চাঁদটা উধাও হল কোন্‌খানে। যন্ত্রণায় কখনো কখনো আমি চিৎকার করতে লাগলুম, পিপাসায় গলা শুকিয়ে যাচ্ছিল বলে ভিজে মাটি কামড়ে নিলুম কতবার, থেকে থেকে মৃত্যুর মতো অবসাদ এসে কিছুক্ষণের জন্যে আমার সব বোধ লুপ্ত করে দিতে লাগল। আর থেকে থেকে সেই ইঁ-হি-হি করে রক্তজমানো হাসির শব্দ, একবার লালু সামনে ছুটে যাচ্ছে, একবার পেছনে, একবার ডাইনে, একবার বাঁয়ে। সবুজ চোখগুলো যেন আমার চারিদিকে ঘিরে ঘিরে লুকোচুরি খেলছে, আর লালু আমাকে বাঁচাচ্ছে—আমাকে বাঁচাচ্ছে সেই রাশি রাশি ধারালো দাঁতের অন্ধ আদিম হিংসা থেকে।" ['লাল ঘোড়া' ছোট গল্প]

(খ) "প্রাচুর্যের চিহ্ন কিছুই নেই—এর বেশি কী আর থাকতে পারে একজন অ্যাসিস্ট্যাণ্ট হেড্ মিস্ট্রেসের ঘরে? তবু যেন বাইরের শীতলতম রাত্রির মৃত্যু-সমুদ্রে ডুবতে ডুবতে সজীব একটা লাইট হাউসের কবোষ্ণ কোমল আশ্রয় পেল। ঘরের ফায়ার প্লেসের খোলা মুখটার ভেতরে কতগুলো জ্বলন্ত চারকোল যেন মুঠোমুঠো পদ্মরাগ মণির মতো জ্বলছে।" ['সেই পাখীটা'—ছোটগল্প]

(৪) "রাত্রির আকাশ বেয়ে চলে যাচ্ছিল বুনো হাঁসের ঝাঁক। লালশর, কালশর, চীনা হাঁস, ইটালীয়ান ডাক্‌স। তারা যাচ্ছিল অন্য মাটিতে, অন্য জলে, অন্য জীবনে যেখানে বেনাবনে পথ হারানোয় মৃত্যু—যেখানে জলায় জলায় রাতের অন্ধকারে সর্বনাশা আলেয়া জ্বলে—যেখানে দীপ-গাঁয়ের দীপস্তম্ভে আর কেউ প্রদীপ জ্বালায় না।" ["হাঁসের আকাশ"]

সর্বক্ষেত্রেই সংকেতময় ব্যঞ্জনাধর্মী এই ভাষা পাহাড়ী ঝর্ণার মতোই নৃত্যছন্দে কল্লোল তুলে ছুটে চলেছে। রাতের আকাশের দীপ্তিমান নক্ষত্রগুলি যেমন বেগবতী কালো জলে

ভাসতে ভাসতে ছোটে তেমনি নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের চিত্রময়ী কবি-ভাষায় আলোর ছবি নাচতে নাচতে ছুটে চলে। ড. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 'উপনিবেশ'-এর ভাষা সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছিলেন বস্তুতপক্ষে নারায়ণবাবুর সমগ্র শিল্প সম্বন্ধেই সে কথা প্রযোজ্য। "শব্দ প্রয়োগের তীক্ষ্ণ সংকেতময়তা ও চিত্রধর্মিতায়, বর্ণনার আবেগময় গতিবেগে, প্রতিবেশরচনার কুশলতায় ও অতীত ইতিহাসের বর্ণাঢ্য উদ্ঘাটনে তাঁহার শ্রেষ্ঠত্বের চিহ্ন সর্বত্রই সুস্পষ্ট।" ['বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা'।]

ছোটগল্প ও উপন্যাস রচনায় নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের শিল্পীসত্তাকে তাঁর প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য, বা শিক্ষকসত্তা কোথাও আচ্ছন্ন করে নি, আড়াল করে দাঁড়ায় নি। তাঁর পাণ্ডিত্য ও গবেষক মনের প্রকাশ পাওয়া যাবে তাঁর প্রবন্ধগ্রন্থগুলিতে : 'সাহিত্য ও সাহিত্যিক,' "সাহিত্যে ছোটগল্প," "ছোটগল্পের সীমারেখা," "কথা-কোবিদ রবীন্দ্রনাথ" প্রভৃতি। বক্তব্য বিষয়ের গভীরতায়, অসিতীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও যুক্তির বিচার ও বিশ্লেষণে, মননশীল চিন্তায় খনিগর্ভ থেকে মণি উদ্ধারের সফল প্রয়াসে সে পাণ্ডিত্য মনস্ক বুদ্ধিমান পাঠকের কাছে ধরা পড়বে।

কথা-শিল্পী সাহিত্যিক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় এখনও গবেষণার বিষয়। কেউ কেউ হয়তো গবেষণা কার্যে রতও আছেন, কিন্তু সামগ্রিকভাবে তাঁর সাহিত্যবিচার-বিষয়ক কোন গ্রন্থ প্রকাশিত হয় নি। কিছু কিছু অনুরাগী পাঠক, পণ্ডিত গবেষক তাঁর সাহিত্য-কৃতি বিষয়ে আলোচনা ইত্যবসরে যা করেছেন তাতে শিল্পীর আংশিক পরিচয় অবশ্যই ফুটে উঠেছে। ড. অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন : "নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় একাধারে রসশিল্পী ও রসপ্রমাতা। একের মধ্যে এই দুই বিপরীতের মিলন বাংলা দেশে খুব সুলভ নয়। একজনের কাজ তাই বিশ্লেষণ করা, বিচার করা। এই দুই-বি-ষম চিত্তবৃত্তি নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের মধ্যে ভাইবোনের মতো মিলেমিশে ছিল। প্রথম যৌবনে তিনি চমৎকার কবিতা লিখতেন, পরে সে পথ ছেড়ে দিলেন—দুর্ভাগ্য আমাদের। কথা-সাহিত্য তাঁকে কবিত্বের হর্ম্যচূড়া থেকে ভূগোল ইতিহাসের কলরবের মধ্যে টেনে আনল। কল্পনার সোনার চিকের আড়াল থেকে নয়, তিনি একেবারে মানুষের মুখোমুখি দাঁড়ালেন, তার কবোষ্ণ হৃদয় তিনি নিজের হৃদ্স্পন্দনে উপলব্ধি করলেন। তিনি কল্পনার কবি নন, মানুষের কবি। অন্য দিকে অসাধারণ রসবোধ, বিশ্লেষণ নৈপুণ্য, দূরাভিসারী মননের দিগ্‌দিগন্তে যাত্রা—তাঁর প্রবন্ধ-নিবন্ধ গুলিকে এমন একটা স্বাদুতা দিয়েছে যে, সেগুলি রসসাহিত্যের মতোই বিস্ময়বিমুগ্ধতা সৃষ্টি করতে পারে। আর তাঁর সে অদ্ভুত আশ্চর্য দুর্মর স্মৃতিশক্তি কৃপণ বিধাতার অকৃপণ দান।"

ড. অমলেন্দু বসু সাধারণ মানুষের সঙ্গে সদালাপী নারায়ণবাবু ও শিল্পী স্রষ্টা নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের অন্তরের অন্তস্তলে একই শক্তি বা 'সামাজিক সত্তা'কে লক্ষ্য করেছেন। তাঁর বিশ্লেষণটি সমালোচকের পক্ষে ঔপন্যাসিক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের জীবন-দর্শনটি বুঝতে সহায়ক হবে। "বস্তুত, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ছিলেন, কথাটির নিবিড়তম

অর্থে, "সামাজিক" মানুষ। তাঁর ভিতরে যে কবিপ্রাণ ছিল, যে-কবিপ্রাণ তাঁর যাবতীয় রচনায় প্রতিভাত হয়ে তাঁকে অন্য পাঁচ জন সমকালীন লেখক থেকে স্বাতন্ত্র্য দিয়েছিল, সেই কবিপ্রাণের তাগিদে নিশ্চয় নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় কখনো কখনো আত্ম-সত্তার গভীরে নিমগ্ন হয়ে যেতেন, যে গভীরে কথা ডুবে যায়, বাণীবিৎ হন বাণীহারা, সেই কবিসত্তার সমান্তরালে এক অনাড়ম্বর অকৃত্রিম সমদরদী সামাজিক সত্তা বিরাজ করত নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের চরিত্রে। এরই জন্য তিনি সহকর্মীদের আলাপচারণে অংশীদার হতেন; এরই জন্য ক্লাশের সব ছেলেমেয়েই তাঁর কাছে আপন ছিল, তারা সাধারণত অনুমান করতে পারত না কতটা তারা তাঁর আপন ছিল, তারপরে কোন না কোনো বিশেষ ঘটনার পরিস্থিতিতে তাঁর অনায়াস সহানুভূতির পরিচয় পেয়ে তারা অভিভূত হয়েছে।

"এই সহানুভূতি, সমানুভূতি, এই আইডেন্টিফিকেশন শক্তি তাঁর পক্ষে হিসেব করা ভঙ্গীমাত্র ছিল না, তাঁর স্বধর্ম, বাহিরে থেকে আমদানি করা ছিল না, ছিল অন্তরোৎসারিত। সমানুভূতির শক্তি ব্যক্তির পক্ষে অমূল্য সম্পদ, লেখকের পক্ষে (যে লেখক নিরবধি কালের অলাঞ্ছিত ভাস্বরতায় দীপ্যমান থাকার অভিলাষী ও অধিকারী) অপরিহার্য গুণ। ইংরেজ কবি কীট্‌স্‌ এই শক্তির নামকরণ করেছিলেন "নেগেটিভ কেপেবিলিটি," যে শক্তিতে মহৎ কল্পনাবলী লেখক অপর চরিত্রের (তাঁর নিজ চরিত্রের নিতান্ত বিপরীত চরিত্রেও) সঙ্গে একাত্ম হতে পারেন, অবশ্য সেই একাত্মতা সৃজনী মুহূর্তেরই একাত্মতা, চিরতরে একাত্মতা নয়; কেননা, তা হলে লেখকের আত্মবিলুপ্তি ঘটবে। এই আইডেন্টিফিকেশন শক্তির বলে শেক্‌সপিয়র একই সময়ে মিরান্ডা হতে পেরেছিলেন আবার ক্যালিবানও হতে পেরেছিলেন। বাংলা সাহিত্যের অনেক নামী লেখকের মধ্যে এই যুগপৎ অনাত্ম-একাত্ম শক্তির অভাব, অনেক লেখকেরই রচনায় ঘটনা, তাৎপর্য, চরিত্র, সবই লেখকের আত্মজ অভিজ্ঞতার সম্প্রসারণ, আপন হতে বাহির হয়ে বাহিরে দাঁড়বার মহত্তর ও সুকঠিন শিল্পশক্তির অধিকারী তাঁরা নন। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের সমগ্র রচনায়, বিশেষত তাঁর গল্পগুলিতে এই আপন হতে বাহির হয়ে বাইরে দাঁড়াবার ক্ষমতা নিয়ত আভাসিত। এই ক্ষমতার উৎস যে চারিত্রিক সমানুভূতিতে সেই সমানুভূতি নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের সামাজিক আচরণেও উজ্জ্বল ছিল। ...আলাপচারিতায় এই সমানধর্মিতা তাঁর শিল্পসৃষ্টির সহানুভূতিতে পরিণত হয়ে যেত। ... তিনি জানতেন (এবং এই জ্ঞান মানবিক জ্ঞানের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রূপ) যে সর্বভূতে কোন না কোন পজিটিভ্‌ মূল্য, অস্তিবাচক গুণ বিদ্যমান। মানুষ ও লেখক হিসেবে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ছিলেন এই অস্তিবাচক গুণের সন্ধানী।"

ঔপন্যাসিক হিসেবে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের জীবন-দর্শন যখন পরিণত হয়ে উঠেছিল, জীবনের পাত্রে রস যখন ঘনীভূত হয়ে এসেছিল, দুঃখের-বেদনার তপস্যায় সিদ্ধি যখন ধরা দেওয়ার অপেক্ষায়, মহৎ কিছুর জন্য পাঠককুল প্রত্যাশায় যখন সংশয়হীন, ঠিক সেই মুহূর্তে বিধাতা-পুরুষের খেয়ালী কল্পনা কোন নিগূঢ় প্রয়োজনে তাঁকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল তা বলবে কে?

কবি কৃষ্ণ ধর যথার্থই বলেছেন, "নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় উত্তরকালের জন্য তাঁর অজস্র সাহিত্যকর্ম গচ্ছিত রেখে গেছেন। তাঁর কোন্‌টা স্থায়ী হবে, কোন্‌টা তলিয়ে যাবে বিস্মৃতির অতলে তা আজ বিচার্য নয়। তা হলে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাসের একজন নায়কের মতো তিনি নিজেও যেন এ কথাই উচ্চারণ করে গেছেন। 'জীবনের একটা মানে কোথাও আমাদের পাওয়া দরকার'। যে-জীবন জটিল, অন্ধ, নির্মম ও নির্লিপ্ত নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় কবির সংবেদনশীলতায়, শিল্পীর সূক্ষ্ম চেতনায়, সমাজ-বাদীর প্রাজ্ঞ বিশ্লেষণে সেই জীবনের একটি সঙ্গতিপূর্ণ অর্থ আবিষ্কারের অন্বেষণ" করেছেন।

দুই

কথাবস্তু

'কথামুখ' অংশে ভাস্কো-ডা-গামার নেতৃত্বে যে প্রথম পর্তুগীজ নৌবহর ভারতের মাটিতে কালিকটে উপনীত হয় তারই ইতিবৃত্ত। নাটকীয় এক পরিবেশ ও পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে পর্তুগীজ সেনাপতি ভাস্কো-ডা-গামা তেরজন অনুচরসহ এসে দাঁড়ালেন বাণিজ্য লক্ষ্মীর বরপুত্র কালিকটের জামোরিন, অর্থাৎ, রাজার ইন্দ্রপুরী-তুল্য মণিরত্নখচিত রাজসভায়। সালংকৃত জামোরিন সিংহাসনে উপবিষ্ট। পার্শ্বে তাম্বুলিক, বীজনকারী।

রাজদরবারে বিদেশী আরব ও মোপ্‌লা বণিকদের* প্রভাব যথেষ্টই। কালিকটের, তথা ভারতের বাণিজ্য একরূপ এই বিদেশীয় আরব বণিকদের নিয়ন্ত্রণেই ছিল তখন। আরবীয় বণিকগণ ভারতীয় বাণিজ্যে তাদের একাধিপত্যে দ্বিতীয় ভাগীদার বরদাস্ত করত না। এদিকে পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকেই ভারতের দূর ও নিকট সমুদ্রে তখন পর্তুগীজ, ওলন্দাজ, দিনেমার প্রভৃতি জলদস্যুদের লুট-পাট ও অত্যাচারের কাহিনী ধীরে ধীরে প্রসার লাভ করছিল। কাজেই এই ক্রীশ্চান পর্তুগীজ বণিকগণ যখন জামোরিনের কাছে এসে তাদের রাজা মনোএলের নামে জামোরিনের সঙ্গে বাণিজ্য করার প্রার্থনা জানালো, এবং রাজার সম্মতি লাভ করলো, তখন এই আরবীয় এবং মোপ্‌লা বণিকগণ তা আদৌ প্রসন্নভাবে গ্রহণ করতে পারল না।

শুরু হ'ল রেষারেষি, প্রকাশ পেল ঈর্ষা, বিদ্বেষ এবং নানা ধরনের হীন প্রতিবন্ধকতা। আদার সঙ্গে মাটি মিশিয়ে দিতে লাগল, মশলার সঙ্গে মুঠো মুঠো ধুলো। তাদের পর্তুগীজ সামগ্রী হিন্দু বণিকরা কিনতে চাইলে দলবেঁধে শত্রুতা করতে লাগল। কখনো বা তাদের গায়ে বা দ্রব্যে থুতু পর্যন্ত ফেলতে কসুর করল না। অজানা, অচেনা এই দেশে মুষ্টিমেয় মাত্র হয়েও তেজস্বী, বীর, এবং প্রতিশোধ গ্রহণে সদা-উন্মুখ এই পর্তুগীজদের সঙ্গে ছোট-খাট মারামারিও যে দু'একবার না হ'ল এমন নয়। জামোরিনের কাছে প্রতিবাদ করেও কোন ফল নেই।

অন্ধ আক্রোশে ফুলতে থাকে সেনাপতি ভাস্কো-ডা-গামা। তাদের ব্যবসা প্রায় বন্ধ। শেষ পর্যন্ত তিন হাজার টাকার শুল্ক আদায়ের জন্য জামোরিনের কর্মচারীরা রাজাকে কিছু না জানিয়েই তাদের গুদাম আটক করল। এর পিছনেও আরব বণিকদের চক্রান্ত

* আরব পিতা ও এদেশীয় মাতার সন্তান 'মোপ্‌লা' নামে খ্যাত।

গোপন থাকে না। জামোরিন সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিলেন দু'দিনের মধ্যে সমস্ত শুল্ক তাদের মিটিয়ে দিতে হবে। মুরদের ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের হাসির চাবুক খেতে খেতে মাথা নীচু করে রাজদরবার থেকে বেরিয়ে আসতে হ'ল সেনাপতিকে।

সেই রাত্রেই লোকমুখে খবর পাওয়া গেল যে, পর্তুগীজরা নাকি একজন আরবকে হত্যা করেছে। দাবানলের মত এই জনরব ছড়িয়ে পড়ল; আর ক্রীশ্চান বণিকদের নিশ্চিহ্ন করে দেবার সংকল্প নিয়ে যে যা হাতের কাছে পেল তাই নিয়ে ছুটলো। বিপদের বার্তা পেয়ে রাত্রির অন্ধকারেই ক্রীশ্চানদের বাণিজ্য তরীগুলি তীরভূমি ত্যাগ করে দূর সমুদ্রে পালিয়ে গেল। বুকে জেগে রইল তীব্র প্রতিশোধ পিপাসা।

সেই অভিযানে ভাস্কোকে তিক্ততম অভিজ্ঞতার স্বাদ পেতে হয়েছিল। অর্ধেক জাহাজ তার অচল হয়ে যায় পথের মধ্যে। কত নাবিক-লস্কর ব্যাধিতে প্রাণ হারায়। সহোদর ভাই, শ্রেষ্ঠ বন্ধু ও শ্রেষ্ঠ সচিব পাউলো-ডা-গামাকেও হারাতে হয়। সব কিছুর মূলে আরব-মুসলমানগণ। তাদের প্রতি এক অন্ধ বিদ্বেষ ও বিজাতীয় ক্রোধ অভিশাপের মতই বর্ষিত হতে থাকে এবং প্রকাশের পথ খোঁজে।

ভাস্কো-ডা-গামা দ্বিতীয়বার যখন ভারতের অভিমুখে যাত্রা করেন, তখন পথে মক্কাযাত্রী তীর্থকামী আরবদের জাহাজ দেখতে পেয়ে ভাস্কো-ডা-গামা নিষ্ঠুর হিংস্রতায় অনায়াসেই জ্বলে উঠেছেন। তাঁর কামানের অগ্নি বৃষ্টিতে চারশো নিরীহ, নিরস্ত্র নরনারী আর্তনাদ তুলেছে, সাদা পাল তুলে সন্ধি করতে চেয়েছে কিন্তু সব আবেদনই ভাস্কোর ইস্পাত-কঠিন হৃদয় দুয়ারে আহত হয়ে ফিরে এসেছে। অট্টহাস্যে জানিয়েছেন তাঁর অনুচরদের, "এবার ঋণ শোধের পালা। এক বিন্দু দুর্বলতার প্রশ্ন নেই।" কারণ, তাঁর মনে ভাসছে পূর্বের সেই লাঞ্ছনা ও দুর্ভোগের চিত্র। এ তিক্ত অভিজ্ঞতা শুধু তিনি একাই লাভ করেন নি। তাঁর এই দ্বিতীয় অভিযানের কিছুকাল আগে আর একজন পর্তুগীজ—পেড্রো কাব্রালকেও কালিকট বন্দরে একই অভিজ্ঞতা লাভ করে পালাতে হয়েছিল। সেবার চল্লিশজন পর্তুগীজকে মৃত্যুর কোলে রেখে পালাতে হয়েছিল। ভাস্কো-ডা-গামা এবার এসেছেন রাজা মানোএল-এর অভিপ্রায়কে জয়যুক্ত করতে, পূর্বের মুর শয়তানদের অত্যাচারের একটি একটি করে প্রতিশোধ তুলে নেওয়ার দৃঢ় সংকল্প নিয়ে। এবারের অভিযানে মনোএলের অভিপ্রায়: 'হিন্দ থেকে দুটি বস্তু সংগ্রহ করতে হবে—এক মসলা আর ক্রীশ্চান।' এগিয়ে চললেন ভাস্কো কালিকটের দিকে।

কালিকটের বন্দর ছাড়ার আগে ভাস্কো-ডা-গামা কামানের গোলায় বিধ্বস্ত করলেন বাড়ীঘর। চারিদিকে জ্বলে উঠল আগুন। ছড়িয়ে পড়ল আর্তনাদ, হাহাকার। নিরীহ ধীবর, আর হিন্দু-মুসলমান বণিকদের নিষ্ঠুরভাবে অর্ধমৃত করে ভেলায় চড়িয়ে হাত-পা কেটে, দড়ি দিয়ে বেঁধে ভেলায় আগুন লাগিয়ে জামোরিনের উদ্দেশ্যে সেই জ্বলন্ত ভেলাগুলি পাঠিয়ে দেওয়া হ'ল। প্রতিটি ভেলার গায়ে কাষ্ঠফলকে ক্রীশ্চান সেনাপতি লিখে দিলেন: "মহামহিমান্বিত জামোরিনের নৈশভোজের জন্য যৎকিঞ্চিৎ মাংস উপহার—"

সমস্ত বন্দর জুড়ে আর্তনাদ, হাহাকার। বাতাসে শুকনো আদা, লবঙ্গ ও লংকা পোড়ার শ্বাসরুদ্ধকারী গন্ধ। জামোরিন ও আরব বণিকদের অসহায় সন্ধি-প্রার্থনা। ভাস্কো-ডা-গামার কাছে কোন আবেদন-নিবেদনই সাড়া জাগালো না। তিনি জানেন এদেশের রাজারা পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষে বিচ্ছিন্ন। এরা সমবেত হয়ে তাঁকে আক্রমণ করতে আসবে না। বরং উল্টোটাই ঘটেছে। কান্নানোর-কোচিনের কাছ থেকে তাঁর সঙ্গে সন্ধির প্রস্তাব এসেছে। এই ঈর্ষা, বিদ্বেষ, বিচ্ছিন্নতার রন্ধ্রপথে একদিন মুসলমানরা এদেশ জয় করেছিল, এবার শুরু হ'ল ক্রীশ্চানদের জয়ের পালা। ভাস্কো-ডা-গামার দৃষ্টি ভারতের পশ্চিম ও দক্ষিণ দিক থেকে প্রসারিত হ'ল পূর্বে-উত্তরে, বুঝি-বা, মহাভারতের রত্নসিংহাসনের দিকেই।

॥ ১ ॥

প্রথম পরিচ্ছেদে 'কথামুখ'-অংশের সার-সংক্ষেপ বিবৃত করে পর্তুগীজগণের বাংলার মাটিতে ব্যবসা-বাণিজ্যের স্বপ্ন সার্থক করার আগে কীভাবে ভারতের দক্ষিণ ও পশ্চিম উপকূলে তারা বাণিজ্য কুঠি ও দুর্গ নির্মাণ করে ধীরে ধীরে প্রভুত্ব বিস্তার করে তারই পটভূমিকাটুকু স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে। ভারতের এবং বাঙলার হৃদ্‌পদ্মে পাশ্চাত্ত্য বাণিজ্যলক্ষ্মীর ঘট একদিনে প্রতিষ্ঠিত হয় নি। এর জন্য তাদের বছরের পর বছর অভিযান করতে হয়েছে। ঝড়ে-ঝঞ্ঝায় প্রাণ হারিয়েছে, দিগ্‌ভ্রান্ত হয়েছে। তার চেয়েও বড় বাধা জয় করেছে—তারা মুর বা আরব বণিকদের প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য জুড়ে যে একাধিপত্য ছিল, সেটি তারা গুঁড়িয়ে দিয়েছে। প্রথমে স্পেন ও পর্তুগাল থেকে হটিয়েছে হিসপানিয়ারা মুরদের। তারপর অনেক শত্রুতা, অনেক রক্ত ঝরানোর পর প্রাচ্যের বাণিজ্যাধিকারও তারা ছিনিয়ে নিয়েছে কীভাবে আরবদের হাত থেকে, তারই ইতিহাস 'পদসঞ্চার'-এ আছে। প্রথম পরিচ্ছেদে বাঙলায় বাণিজ্য করায় স্বপ্ন-সাধটুকুর ইঙ্গিত মাত্র আছে। বাংলা তখনও সোনালী ধানের মায়ায়, দোয়েল-শ্যামার গানে, সবুজ ঘাসে, নীল-আকাশের স্বপ্নে এবং দুগ্ধস্রোতরূপী নদীর কুলুকুলু তানে ঘুমিয়ে আছে। আর, একদিকে পাশ্চাত্ত্য বণিক পর্তুগীজদের লোভ এবং অপরদিকে সাসারামের বাঘ শেরশাহের শ্যেন দৃষ্টি বাঙলাকে ঘিরে জল্পনা-কল্পনায় নিমগ্ন।

এদিকে আরবীয় বণিকদের সঙ্গে হাত মিলিয়েই বাংলার বণিককুল বাংলার বাণিজ্যের স্বর্ণ-কমলটিতে লক্ষ্মীর চরণ দুখানিকে অচলা করে ধরে রেখেছিল। বাংলার বণিক শঙ্খ দত্ত চট্টগ্রাম পার হয়ে দক্ষিণ পাটনে চলেছেন বাণিজ্যের বহর নিয়ে। শুকনো লঙ্কা, মোম, লাক্ষা, আদা, হলুদ, চট, কাজকরা তামা-পিতলের বাসন, ঢাকাই মসলিন প্রভৃতির বদলে পাওয়া যাবে মুক্তো, পাওয়া যাবে অন্যান্য বাণিজ্যিক পণ্য—আসবে প্রচুর অর্থ। বৃদ্ধ পিতা ধনদত্ত তাঁকে সাবধান করে দিয়েছেন হার্মাদদের দস্যুতার বিষয়ে। পাটনে যাত্রার আগে চন্দ্রনাথ পাহাড়ে সর্ববিঘ্নহারী শঙ্করকে প্রণাম করতে গিয়ে মন্দিরের অন্যতম

ব্রাহ্মণ পূজারী সোমদেবও তাঁকে এই হার্মাদের উৎপাত ও অতিরিক্ত লোভের কথা জানিয়ে সতর্ক করে দিয়েছিলেন। জানিয়েছিলেন, শুধুমাত্র ব্যবসা করে, আর মশলা কিনেই চলে যাবে না তারা। সোমদেব অন্তরের অন্তস্তলে স্বপ্ন পুরে রেখেছেন, পাঠান-মোঘলদের তাড়িয়ে দিয়ে অদূর ভবিষ্যতে হিন্দুর সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার।

দক্ষিণে পাটনের উদ্দেশ্যে শঙ্খ দত্তের মধুকর যখন বঙ্গোপসাগরের নীল জলে সাঁতার দিতে দিতে এগিয়ে চলে, তখন আলোচ্য উপন্যাসের ইতিহাস-অংশের নায়ক পর্তুগীজ ক্যাপ্টেন ডিমেলোর জাহাজ বাংলার উদ্দেশে ভাসতে ভাসতে চলেছে কূল পাওয়ার আশায়।

॥ ২ ॥

বঙ্গোপসাগরের উদ্বেল নীল জলরাশির সঙ্গে মিশেছে মাটির অদ্ভুত এক গন্ধ। বাঙলার মাটি কাছাকাছি। ভাস্কো-ডা-গামা, কোয়েলহো সবাই এর স্বপ্ন দেখেছেন। ডি মেলো আজ তার সন্নিকটে। চট্টগ্রাম, এর প্রবেশ দ্বার। পোর্টো গ্রান্ডি—বিরাট বন্দর, সিডাডি বনিটা—সুন্দর, মনোরম শহর। আল বুকার্কের নীতিই পর্তুগীজরা এখন অনুসরণ করবে,—যুদ্ধ-মারামারি নয়, বন্ধুত্বই তাদের কাম্য—ব্যবসা হবে সম্বন্ধ-সূত্র। শত্রু তাদের মুর বা আরবের মুসলমান বণিকরা। ইয়োরোপ থেকে তাদের তাড়িয়েছে, এবার পূর্ব পৃথিবীটা থেকেও তাদের দূর করে দেবে তারা।

ডি মেলোর আগে বেঙ্গালায় এসেছেন সিলভিরা, এসেছেন কোয়েল হো—কেউই সফল হন নি। তিক্ত অভিজ্ঞতা নিয়ে ফিরে গেছেন। স্বপ্ন স্বপ্নই থেকে গেছে। ডি মেলো এবার চেষ্টা করবেন। শঙ্খ দত্তের চারটি ডিঙার দিকে মুগ্ধ চোখে তিনি দেখেছেন। কিশোর সুন্দর মুখ ভাইপো গঞ্জালো পাশে এসে উদ্বিগ্ন প্রশ্ন করে বেঙ্গালা আর কতদূর!

একটি যুদ্ধের ব্যাপারে সাহায্যের জন্য বহর নিয়ে আসছিলো ডি মেলো কলম্বোয়। ফেরার পথে বিপত্তি। ঝড় উঠল সমুদ্রে। সেই উন্মত্ত ঝড়ে ভেসে গেল তাঁর জাহাজ। সঙ্গের আর দুটো জাহাজ যে কোথায় গেল সন্ধান পেলেন না। একটা বালির চড়ায় এসে ঠেকলেন তিনি তাঁর জাহাজের সঙ্গী-সাথীদের নিয়ে। কষ্টের শেষ নেই। দিন দুই পরে তিনজন আরাকানি জেলে একটা কাঠ আশ্রয় করে ভাসতে ভাসতে এল সেই চড়ায়। খুদ্দ সান তাদেরই একজন। চট্টগ্রামে পৌঁছে দেবে সে, এই আশ্বাসে ডি মেলো তাদের তুলে নিয়েছেন তাঁর জাহাজে।

খুদ্দ সান ডি মেলোকে চট্টগ্রামে আনে নি; নিয়ে এসেছে চাকারিয়ায়। সেখানে যে ভয়াল অভিজ্ঞতা ডি মেলোর জন্য অপেক্ষা করছে, তার বিন্দু-বিসর্গও তিনি জানতে পারলেন না।

লোকালয় থেকে দূরে বিজন জঙ্গলে পাহাড়ে বাস করেন সোমদেব। সাংসারিক, শান্তিপ্রিয়, নিশ্চিন্ত, নির্বিরোধী মানুষগুলোকে তিনি সহ্য করতে পারেন না। তাঁর

বিশ্বাস, দুর্বলচিত্ত, পঙ্গু মানুষগুলোকে ঈশ্বর কখনই করুণা করেন না। এক এক সময় তাঁর সংশয় জাগে দেবতারই শক্তির ওপর। তাঁর আরাধ্য মহারুদ্র কি ঘুমিয়ে পড়েছেন? তাঁকে মহাসমুদ্রের অতল সলিলে বিসর্জন দিতে ইচ্ছা করে।

সোমদেবের অহরহ চিন্তা কীভাবে বিধর্মী মুসলমান শাসকদের হাত থেকে হিন্দুর রাজ্য ছিনিয়ে নিয়ে হিন্দুই আবার রাজত্ব করবে। ফিরে আসবে আর্যধর্ম, জ্বলবে আবার ব্রাহ্মণের হোমাগ্নি, উঠবে সামগান। ব্রাহ্মণ ফিরে পাবে তার মর্যাদা, তার তেজ ও মহিমা।

সন্ধ্যার আঁধার নেমে আসে। চন্দ্রনাথ পাহাড় এবং হিংস্র শ্বাপদের বিচরণ ক্ষেত্রে সেই নির্জন পাহাড়ীপথ, নেকড়ের গর্জনের প্রতি ভ্রুক্ষেপহীন সোমদেব বিজন কুটিরের কাছে এসে দেখলেন কে যেন তাঁর অপেক্ষায় আছেন।

॥ ৩ ॥

গুহার সামনে এসে চিনতে পারলেন সোমদেব তাঁর শিষ্য রাজশেখরকে। রাজশেখর চাকারিয়ার একজন বণিক। তরুণী কন্যা সুপর্ণাকে সঙ্গে নিয়ে তিনি এসেছেন। কন্যা সুপর্ণা মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে এসেছে; মানত ছিল ভালো হলে চন্দ্রনাথের মন্দিরে পুজো দেবেন। তাই এসেছেন। দ্বিতীয় কারণটি হ'ল রাজশেখর চাকারিয়ায় একটি মন্দির নির্মাণ করেছেন, বহু অর্থ ব্যয় করে। সেই মন্দিরে মহাদেবের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করাতে চান সিদ্ধপুরুষ সোমদেবকে দিয়ে। তাই তাঁকে নিতে আসা।

সোমদেব ক্ষোভে-ক্রোধে হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন। হিন্দুর রাজত্ব গেছে। ক্লীবের দল ভেড়ার মত দিন কাটাচ্ছে। হিন্দুর ধর্মকর্ম সব নষ্ট হতে বসেছে। এমতাবস্থায় দেবতার প্রতিষ্ঠা নয়—বিসর্জন। কিন্তু ভীত রাজশেখরের সানুনয় প্রার্থনায় শেষ পর্যন্ত রাজি হলেন সোমদেব। তবে শিবলিঙ্গ নয়; প্রতিষ্ঠা করতে হবে চামুণ্ডার মূর্তি। আজ এই দুর্বল ভীরুতার যুগে, শক্তিহীন ক্লীবের জগতে শক্তিময়ীর প্রতিষ্ঠা চাই। শৈব হয়েও সোমদেব এখন শক্তিসাধক। কারণ দেশের জন্য এখন শক্তি সাধনার বিশেষ প্রয়োজন আছে।

ডি মেলোর ঘুম ভাঙলো। চট্টগ্রাম নয়, তাঁর সঙ্গে প্রতারণা করা হয়েছে। তাঁকে চাকারিয়ায় আনা হয়েছে। চট্টগ্রামের মত এত বড় শহরও নয়, সুসজ্জিত, হর্ম্যমালা সুশোভিত নয়। বন্দরও ছোট। নগর কোতোয়াল অশ্বারোহী বাহিনী নিয়ে ঘিরে ফেলল তাঁদের। খুন্দসান পরিচয় করিয়ে দিতেই ডি মেলো অভিবাদন জানালেন তাকে।

কোতোয়াল সঙ্গীসমেত ডি মেলোকে চাকারিয়ার নবাবের দরবারে নিয়ে এল। রাজদরবারের চত্বরে, দরবারে অনেক মুরকেই ভিড় করে থাকতে দেখা গেল।

শ্বেতপাথরের সিংহাসন। মখমল দিয়ে মোড়া। মসলিন ও জরির কাজ করা পোশাক পরিহিত নবাব খোদাবকস খাঁ সিংহাসন বেদীতে। নকীব নবাবের কাছে

আগন্তুকদের আগমনবার্তা ঘোষণা করল। জনৈক অভিজাত চেহারার মুর দরবারের প্রথম সারিতে বসেছিলেন, তিনি উঠে পর্তুগীজদের আগমন-উদ্দেশ্য জানতে চাইলেন।

ডি মেলো গোয়ার গভর্নর নুনো-ডি-কুন্হার প্রতিনিধি হিসেবে নবাবকে সামান্য নজরানা দিয়ে বাণিজ্য করার অনুমতি ভিক্ষা করলেন। নবাব অভিজাত মুরটির সঙ্গে কিছু আলোচনা করে ডি মেলোকে জিজ্ঞেস করলেন পর্তুগীজরা যুদ্ধ করতে পারে কি না। এবং জানালেন, নবাব একটি শর্তে তাঁদের সবরকম সুবিধা করে দিতে প্রস্তুত। শর্তটি হ'ল, সম্প্রতি এক শত্রুরাজ্যের সঙ্গে যুদ্ধে নবাবকে তাঁরা সাহায্য করবেন। কিন্তু পর্তুগীজ ক্যাপিতান ডি মেলো সে শর্তে রাজী হলেন না। এ দেশের সবরকম বিরোধ থেকে তাঁরা দূরে থাকতে চান। এটিই ডি-কুন্হার আদেশ।

ক্রুদ্ধ নবাব ডি মেলো ও তাঁর সঙ্গীসাথীদের বন্দী করলেন।

॥ ৪ ॥

সাতদিন, সাত রাত শঙ্খ দত্ত তাঁর বাণিজ্যিক বহর নিয়ে নীল সমুদ্রে ভেসে চললেন। মনের ওপর জাগছে অসংখ্য চিন্তার বুদ্‌বুদ্। কাঁড়ারদের গান তাঁকে উদাসী করে তোলে। অনুভব করেন ঘরে তাঁর কোন সুন্দরী স্ত্রী নেই, বা নেই কোন প্রেয়সীও—যেমন তাঁর বয়সী বন্ধু-বান্ধবের আছে। শঙ্খ দত্ত পিতৃভক্ত হয়েও এই জায়গায় তিনি পিতৃ-আজ্ঞাও লঙ্ঘন করেছেন। শঙ্খ দত্তের মধ্যে আছে সুদূরের প্রতি আকর্ষণ, অজানাকে জানা, অদেখাকে দেখার আগ্রহ। ঘরের নিশ্চিন্ত আরাম-বিলাসের মোহডোর ছিন্ন করে বাইরের ঝঞ্ঝাবিপদের মধ্যে বেরিয়ে পড়ার আহ্বান তিনি শুনতে পান তাঁর রক্তে। দক্ষিণ পাটন, সমুদ্র তাঁকে হাতছানি দিয়ে ডাকে। তিনি জানেন স্ত্রী-পুত্র নিয়ে সংসার যাত্রা তাঁর এই ভবঘুরে চঞ্চল, সচল, গতিশীল মনটাকে মেরে ফেলবে। অর্থ, নারীসঙ্গ, ভোগ-লালসাতেই তখন চলবে জীবন-কণ্ডূয়ন। তাই বিবাহে তাঁর অনাগ্রহ। নারী, বা রূপমোহ তাঁর চিত্তে যে কখনও চাঞ্চল্য ঘটায় নি, এমন নয়, কিন্তু সে দুদণ্ডের মাত্র। এর চেয়ে যা নেই, তার জন্য হঠাৎ উদাস হয়ে যাওয়া, একটা অজানা বেদনা অনুভব করার মধ্যে একটা রোমান্টিক আমেজ আছে। চিন্তার স্রোত থামে কার যেন 'পুরীধাম' এই চিৎকারে। শঙ্খ দত্ত নীলমাধব দর্শনের মানসে, তাঁর আশীর্বাদ কামনায় নৌকা ভেড়াতে বলেন।

শীতের ভোর। জগন্নাথ ধামের মন্দির চূড়া দূর সমুদ্রের দিকে দৃষ্টি প্রসারিত করে দাঁড়িয়ে আছে। শঙ্খ দত্ত মন্দিরের দিকে চললেন। পথে তীর্থযাত্রীর ভিড়, কোলাহল—ভারতবর্ষের নানা জায়গা থেকে এসেছেন তাঁরা দারুব্রহ্মের আশীর্বাদ কামনায়। মন্দিরের প্রধান দরজার সামনে আসতেই পরিচিত পাণ্ডা উদ্ধবের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ। তিনি শঙ্খ দত্তকে সেদিন সন্ধ্যায় বিশেষ পূজায় নির্বাচিত ভক্তদের একজন রূপে উপস্থিত থাকার দুর্লভ নিমন্ত্রণ জানালেন।

মন্দিরের সামনে প্রসাদ বিতরণ হচ্ছে। সকলের সেখানে সমান অধিকার। বাজারের পথে আসতেই পরিচিত আরব বণিক গোলাম আলীর সঙ্গে শঙ্খ দত্তের সাক্ষাৎ। গোলাম আলী তাঁকে একান্তে ডেকে নিয়ে চললেন কিছু গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার জন্য।

এদিকে অসহায় ক্রোধে ডি মেলো কাঁপতে থাকলেন। তরবারির বাঁটে হাত দিয়েও নিজেকে অতি কষ্টে সংযত করেছেন তিনি। নবাবকে জানিয়েছিলেন এর পরিণাম তাঁর পক্ষে শুভ নয়। নুনো-ডি-কুনহা এ সংবাদ পেলে চুপ করে থাকবেন না। ফলে খোদাবক্স খাঁ আরও ক্রুদ্ধ হয়েছেন। তাঁর নির্দেশে পর্তুগীজগণ অস্ত্র ত্যাগ করে বন্দীত্ব স্বীকার করে নিয়েছেন বাধ্য হয়ে। কারাগারের অন্ধকার কক্ষে ডি মেলো তাঁর সঙ্গীসহ নিক্ষিপ্ত হলেন!

॥ ৫ ॥

সমুদ্রের নির্জন তীরে গোলাম আলী ও শঙ্খ দত্ত পাশাপাশি বসে। নীরবতা ভঙ্গ করে গোলাম আলী জানাল সমস্ত হিন্দুস্থান জুড়ে একটা কিছু শীঘ্রই ঘটতে চলেছে। ঝড় উঠবে। তুলবে বিদেশী বণিকরা। হার্মাদরা। শঙ্খ দত্ত বোঝাতে চান, আরবীয় বণিকগণ যেমন ব্যবসা করছেন, পর্তুগীজরাও ব্যবসা করলে কী ক্ষতি থাকতে পারে। কিন্তু গোলাম আলী সে কথা কানে তোলেন না। শঙ্খ দত্তকে সতর্ক ও সাবধান করে দিয়ে তিনি বললেন, ওরা বাণিজ্যের নাম করে আসে, তারপর তলোয়ারের মুখে দেশ অধিকার করে। গোয়া কালিকট তারা কেড়ে নিয়েছে, এবার বাংলার দিকে লোভের হাত তারা বাড়িয়েছে। হঠাৎ সোমদেবের কথাটা শঙ্খ দত্তের মনে পড়ে যায়। "ক্রীশ্চানরা দেশ জয় করবে—মানুষের তাজা রক্তের ওপর দিয়ে পদসঞ্চার করবে গৌড়ের সিংহাসনের দিকে…।" তবু শঙ্খ দত্ত বিষয়টার ওপর ততখানি গুরুত্ব দেন না। তাঁর মনে হয়, গোলাম আলী, তথা, আরব বণিকদের স্বার্থে ঘা লাগছে বলেই তারা এতখানি উত্তেজিত ও বিচলিত। শঙ্খ দত্তের কাছে দুজনেই সমান—দুজনেই বিদেশী। কিন্তু গোলাম আলী সতর্ক করে দেন আবার। চট্টগ্রাম, সপ্তগ্রাম, ত্রিবেণী কেউ বাদ যাবে না। সমগ্র পৃথিবী জুড়ে ক্রীশ্চানদের রাজ্য গড়ে উঠবে। এবং ইতিমধ্যেই পর্তুগীজদের রাজা ঘোষণা করেছে নিজেকে "ইথিওপিয়া, আরব, পারস্য আর ভারতবর্ষের বাণিজ্য আর বিজয়ের অধিপতি!" খবরটা শুনে চমকে ওঠেন শঙ্খ দত্ত। স্বপ্ন ছাড়া এ আর কী হতে পারে? গোলাম আলীর কাছে এ স্বপ্ন নয়—অদূর ভবিষ্যতে এ বাস্তব সত্য হয়ে উঠবে যদি এভাবে বাঙলার বণিকরা জেগে ঘুমিয়ে থাকেন। শুধু দেশ কেড়ে নেবে না, ওরা ছলে-বলে কৌশলে ক্রীশ্চান বাড়াবে—ধরে ধরে ক্রীশ্চান করবে মানুষকে। বিদেশের মাটিতে মাথা উঁচু করে উঠবে ওদের ঝকঝকে ইগ্রেঝার চূড়া। তাই নবাবেরা যা করবার সে তো করবেনই, কিন্তু তাঁদেরও চুপ করে থাকলে চলবে না। পর্তুগীজদের বুঝিয়ে দিতে হবে, বাঙলা দেশ কালিকট নয়।

উশ্ধবের গৃহে শঙ্খ দত্তের অভ্যর্থনা ও আতিথ্যের ত্রুটি হয় নি। ঘুমিয়ে পড়েছিলেন শঙ্খ। গভীর রাতে উশ্ধব এসে তাঁকে ডেকে নিয়ে গেল মন্দিরে। উশ্ধবের জন্যই মন্দিরে প্রবেশ করতে বাধা পেলেন না শঙ্খ দত্ত।

মন্দিরের রূপ গেছে বদলে। চারিদিকে খরদীপ্ত উজ্জ্বল আলো। দেবতার ত্রিমূর্তি ধূপ-দীপ-পুষ্প-মাল্য-চন্দনে সুরভিত; চারিদিকে সে সৌরভ স্বপ্নিল আমেজ ছড়িয়েছে। বাঁশি ও বীণার মধুর ধ্বনি স্বর্গীয় পরিবেশ রচনা করেছে। সহসা শোনা গেল নূপুরের নিক্কণ। পূজার অর্ঘ্য নিয়ে প্রবেশ করলেন দেবদাসী। ফুলসাজে সজ্জিতা তাঁর বরতনু। লৌকিক লাজ-লজ্জা ত্যাগ করে দেবতার সামনে এসে দাঁড়ালেন নগ্নিকা দেবদাসী। একটি অর্ঘ্যীকৃত শ্বেতপদ্মের মতোই তিনি দেবতার চরণে প্রণতা হলেন।

॥ ৬ ॥

রাজশেখর শেঠ চাকারিয়ার একজন গণ্যমান্য এবং ধনী বণিক। বাইরের সমুদ্রে বাণিজ্য করার জন্য অনেকগুলি বহর আছে তাঁর। অভিজ্ঞতাও তাঁর প্রচুর। সমুদ্র থেকেই লক্ষ্মী উঠেছেন যে, তাই সেই সমুদ্রে তাঁর দুর্বার আকর্ষণ। লক্ষ্মী দিয়েছেন তাঁকে উজাড় করে তাঁর প্রসাদ। সেই রাজশেখর কন্যার কল্যাণ কামনায় প্রচুর অর্থ ব্যয় করে নির্মাণ করেছেন রজতেশ্বরের মন্দির। বহু দূর থেকে সে মন্দিরের গগণভেদী চূড়া যে কোন নাবিকেরই চোখে পড়বে। কিন্তু সোমদেব তাঁর সমস্ত স্বপ্ন, আশাকে নির্মূল করে দিলেন। রজতেশ্বর নয়, চামুণ্ডার মূর্তি প্রতিষ্ঠা করা হবে সেই মন্দিরে। কারণ, শিব এখন শব হয়েছেন; মহাকালী চামুণ্ডার মহাখর্পর হাতে তাঁর বুকের উপর দাঁড়িয়ে লীলা করার সময় এখন। হিন্দুর রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করতে হবে। মুসলমান বিদেশীদের বিনাশ করতে হবে। বুঝতে পারেন না রাজশেখর গুরুদেবের এরূপ মনোভাবের, এরূপ বিদ্বেষের কারণ কি!

কিছুটা অসহিষ্ণু হয়ে তার্কিক হয়ে ওঠেন রাজশেখর। একই ইতিহাস তো হিন্দুদের ক্ষেত্রেও। আর্যরাও একদিন অনার্য শবর-কিরাতদের পরাজিত করে নিজের ধর্ম তাদের মধ্যে প্রচার করেছে। পরধর্ম সম্পর্কে হিন্দুরাও সব সময় সহিষ্ণুতার পরিচয় দেয় নি। ব্রাহ্মণদের নেতৃত্বে বৌদ্ধদের কতবার বিনাশ করা হয়েছে। কত নির্যাতিত বৌদ্ধ ইসলাম ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেছে। সমাজের যারা অন্ত্যজ আর অস্পৃশ্য, ইসলাম তাদেরও জায়গা করে দিয়েছে, মর্যাদা দিয়েছে।

কথা শেষ করতে দেন নি সোমদেব। কামানের মতো ফেটে পড়েছেন। আর গুরুদেবের চরণে লুটিয়ে পড়ে ক্ষমা চেয়ে নিয়েছেন রাজশেখর। যদিও তাঁর মনের সংশয় কাটে নি। কেননা, এক ধর্ম ছাড়া, মুসলমানদের সঙ্গে হিন্দুদের প্রভেদ আর কোথাও নেই বললেই চলে;—এমন কি ভাষায় পর্যন্ত। সুখে-দুঃখে-বিপদে জান-প্রাণ দিয়ে সবাই এক হয়ে দাঁড়ায়। তথাপি, নিজের মনের অপ্রসন্নতা চাপা দিয়ে গুরুদেবের সঙ্গে সকন্যা ফিরেছেন রাজশেখর চাকারিয়ায়।

কারাকক্ষের স্যাঁতসেঁতে অন্ধকারে সাতজন পর্তুগীজ। থমথমে, স্তব্ধ গম্ভীর তাদের মুখগুলি। একমাত্র চোদ্দ বছরের কিশোর গঞ্জালোর মুখখানিই দেবদূতের মতো। তার ভীতার্ত চোখে অব্যক্ত যন্ত্রণার ছায়া। ক্রোধে-হিংসায় ডি মেলোর স্নায়ুর তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে জ্বালা। তবু তিনি সান্ত্বনা দিতে চান গঞ্জালোকে। তাঁদের রাজা ডি-কুন্‌হার কাছে ছাড়া আর কারো কাছে তাঁরা মাথা নত করবেন না। সঙ্গী পেড্রো প্রতিবাদ করতে যায়। এভাবে মৃত্যু মূঢ়তা ছাড়া আর কী। কিন্তু ডি মেলো দলের ক্যাপিতান, তাঁর আদেশ সকলে মানতে বাধ্য। এ নিয়ে উভয়ে যখন হাতাহাতি হবার জোগাড়, সেই সময় এক অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটে। কক্ষের কপাট উন্মুক্ত হয়। প্রহরীর পাশে এসে দাঁড়ায় দুজন পর্তুগীজ—ভ্যাস্‌কন্‌সেলস এবং কোহেলহো। তাঁরা উভয়েই শেষ পর্যন্ত চাকারিয়ায় এসে পৌঁচেছেন। আর কোন ভয় নেই। মাতা মেরীর আশীর্বাদে তাঁরা নবাবের সঙ্গে মিটমাট করে এঁদের মুক্তির ব্যবস্থা করবেন।

॥ ৭ ॥

বাঁশি ও বীণার সুরের তালে তালে নানা মুদ্রার সাহায্যে দেবদাসী নৃত্যের ছন্দে এক মায়াময় পবিত্র ভাবের জগৎ সৃষ্টি করলেন। ধূপে-দীপে-মাল্যে-পুষ্পে-চন্দনে সে ভাবের জগৎ স্বর্গীয়, রমণীয় হয়ে উঠল ধীরে ধীরে। তাই নৃত্যোৎসব শেষ হয়ে গেলেও বহুক্ষণ হুঁশ থাকে না শঙ্খ দত্তের। উদ্ধব তাঁকে ফিরিয়ে আনেন বাস্তবে। উদ্ধব বুঝতে পারে শঙ্খের মোহবন্ধতার মধ্যে কোথায় যেন কামের ছোঁয়া এসে লেগেছে। অতি কৌশলে বুঝিয়ে দেয় সে, দেবদাসী দেবতার বধূ—মানবের যিনি অধরা। যৌবন আসার আগেই কুমারী কন্যাকে দেবতার সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দেওয়া হয়,—তারপর গুরুর কাছে নৃত্য-গীত শিখে দেবতার চরণে আত্মনিবেদন করে তিনি বন্দনার অধিকার লাভ করেন। নানাভাবে এই দেবদাসীরা আসেন—তাই এঁদের পরিচয়ও তদনুসারে হয়; দত্তা, বিক্রীতা, ভক্তা, অলঙ্কৃতা, গোপিকা, হৃতা ইত্যাদি। যে দেবদাসীকে শঙ্খ দত্ত নৃত্য করতে দেখলেন, তিনি হৃতা। শোনা যায় উজ্জয়িনীর কোন্ এক গ্রাম থেকে একদল তীর্থযাত্রী শৈশবে তাকে হরণ করে জগন্নাথের মন্দিরে সমর্পণ করে যায়। তারপর একজন প্রধান পুরোহিত তাঁকে লালন-পালন করেন, এবং সর্বশ্রেষ্ঠ সঙ্গীত ও নৃত্যগুরু রায় রামানন্দ তাঁকে ললিতকলা শিক্ষা দিয়েছেন। দেবদাসীর নাম শম্পা।

'হৃতা' শব্দটি শঙ্খ দত্তের হৃদয়ে এক আলোড়ন উপস্থিত করে। যে হয়তো সংসারের প্রেমে ভালোবাসায় একদিন সার্থক হয়ে উঠতে পারত তাকে কোন্ বাপ-মায়ের কোল থেকে ছিনিয়ে আনা হয়েছে, তা কে বলবে! আবার যেদিন যৌবন চলে যাবে, নাচতে আর পারবে না, সেদিন কোথায় হারিয়ে যাবে এই দেবদাসী, নতুন দেবদাসীর অভিষেকে! শঙ্খের তাত্ত্বিক চেতনায় অমর্ত্য লোকের দেবদাসী ধীরে ধীরে রক্তমাংসের মানবী মূর্তি

ধারণ করেন। শঙ্খ দত্তের রক্তে উত্তেজনার ঢেউ জাগে। আর একবার তাঁকে দেখবার প্রবৃত্তি খোঁচা দিতে থাকে।

পারেন না শঙ্খ দত্ত শুয়ে থাকতে, বেরিয়ে আসেন বাইরে। তীর্থযাত্রীরা স্নানের উদ্দেশ্যে চলেছেন। একটি দল হরি-সংকীর্তন করতে করতে চলে গেল। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু প্রচার করেছেন এই সংকীর্তন—নবদ্বীপের পথে পথে। তিনি স্বয়ং এই জগন্নাথ ধামেই উপস্থিত বলে শোনা যায়। শঙ্খের মনে বৈষ্ণবদের সম্বন্ধে কোন আগ্রহ নেই। তাঁর গুরু সোমদেব তো ক্ষেপেই ওঠেন বৈষ্ণবদের নাম শুনলে। তাঁর মতে এই ক্লীবের দেশকে আরও ক্লীব করে তুলছে বৈষ্ণবরা। শঙ্খ দত্ত যেন চাবুক খেলেন এই ভাবনায়। কারণ তিনি গুরু সোমদেবকে কথা দিয়েছেন ব্রাহ্মণের অধিকার ফিরিয়ে দিতে, এবং হিন্দুর রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করতে সাহায্য করবেন যথাসাধ্য। অতএব এখানে থেকে কালবিলম্ব আর নয়। সমুদ্রের দিকে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেন তিনি। স্নান ঘাট পেরিয়ে নির্জন তীরে এসে দাঁড়ান। ভোরের সূর্য উঠেছে, এখনও নীল জলে তার অঙ্গের লাল আবীর ছড়িয়ে আছে। শঙ্খ দত্ত রাত্রির জাগরণ-ক্লান্তি ও তপ্ত চিন্তার স্রোতকে শীতল করতে জলে নেমে স্নান করে নেন দীর্ঘক্ষণ। তারপর ধীরপদে যখন উদ্ধবের বাড়ীর দিকে চলা শুরু করেন, তখন কানে আসে সম্মিলিত নারী কণ্ঠের গান ও বাজনার আওয়াজ। চলেছে বিয়ের শোভাযাত্রা। কিন্তু সহসা দৃষ্টি তাঁর স্থির হয়ে যায় নীলশাড়ী পরিহিতা যিনি দলের আগে আগে চলেছেন—তাঁর ওপর এসে। অবিশ্বাস্য ব্যাপার। যাঁকে গতরাত্রে নৃত্যে মদিরতা ছড়াতে দেখেছিলেন, সেই দেবদাসী শম্পা চলেছেন দলের আগে আগে, গান গাইতে গাইতে। এখানকার এইটিই প্রথা। শুভ কাজে দেবদাসী থাকবেন সবার আগে। মন্ত্রমুগ্ধের মতো শঙ্খ দত্ত শোভাযাত্রা যেদিকে চলেছে সেইদিকে এগিয়ে চললেন।

॥ ৮ ॥

নারী-সুরা-নৃত্য—এই স্ফূর্তিই খোদাবক্স খাঁ-এর জীবনমন্ত্র। তিনি চান নি পর্তুগীজদের ঘাঁটাতে। কিন্তু উজীর জামান খাঁ-ই গণ্ডোগোল বাধালেন নবাবের সঙ্গে স্থানীয় যুদ্ধে পর্তুগীজদের সাহায্য চেয়ে। ইত্যবসরে দু'জন পর্তুগীজ—ভ্যাসকনসেলস্ ও কোয়েলহো এলেন ডি মেলোর মুক্তির দৌত্যে। মুক্তিপণ নিয়ে দরকষাকষি করলেন উজীর সাহেবই। নবাব হয়ে রইলেন নিমিত্ত মাত্র। তাঁরা দু'হাজার ক্রুজাডো পর্যন্ত দিতে চেয়েছিলেন, নবাবেরও আপত্তি ছিল না, কিন্তু রাজী হলেন না উজীর সাহেব। পাঁচ হাজার ক্রুজাডো তাঁর দাবী। পর্তুগীজগণ ভেবে দেখতে দু-একদিন সময় নিলেন, মনের আগুন চেপে রেখে।

কারাকক্ষের অন্ধকারে সমস্ত দিন উদ্‌গ্রীব অপেক্ষায় কাটিয়েছে পর্তুগীজরা মুক্তির দূতের আগমন আশায়। অবশেষে হতাশায় ভরে গেছে মন। মনের মধ্যে দ্বিধাদ্বন্দ্ব উঁকি

মারতে থাকে। রাত গভীর। সহসা কারাকক্ষের রুদ্ধদ্বার খুলে যায়। চাপা কণ্ঠে ভ্যাসকনসেলস জানান, পালাতে হবে এখনই—প্রহরীদের খুন করে তাঁরা দরজা খুলেছেন। ভ্যাসকনসেলস পথ দেখিয়ে এগিয়ে চলেন। নিঃশব্দ পায়ে সবাই অনুসরণ করেন। কারাগারের পিছনে সুউচ্চ প্রাচীরের বাইরে একটা বটগাছ। ডালে দড়ি বেঁধে তাঁরা এসেছেন, আবার এই পথেই বেরিয়ে যেতে হবে। সকলে সেই মত প্রস্তুত। দু'একজন উঠেছে। এমন সময় সহসা কতকগুলি মশাল জ্বলে উঠল। নবাবের প্রহরীরা জানতে পেরেছে। দু'একজন যাঁরা দড়ি ধরে ঝুলছিলেন তাঁরা অন্ধকারে ঝাঁপ দিলেন, প্রহরীদের বন্দুকের গুলিতে এক-আধজন প্রাণ হারালেন। সুতরাং ডি মেলো সমেত প্রায় সকলেই আবার শৃঙ্খলিত হলেন। বাইরে চলে যেতে পেরেছিলেন ভ্যাসকনসেলস, কোয়েল হো এবং ডি মেলোর ভাইপো, কিশোর গঞ্জালো।

অন্ধকারে ঝাঁপিয়ে পড়ে গঞ্জালো প্রথমে ভেবেছিল সে বুঝি মুক্তি পেয়েছে। ভুল ভাঙতে দেরী হোল না। বাইরেও ততক্ষণে শুরু হয়ে গেছে কোলাহল, অশ্বারোহীর ক্ষুরধ্বনি, বন্দুকের আওয়াজ। কাজেই ঊর্ধ্বশ্বাসে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটলো গঞ্জালো সেই অচেনা-অজানা দেশে, পাথর-জঙ্গল মাড়িয়ে।

দূরে একটি আলোর রেখা দেখে সেই দিকেই ছুটে গেল গঞ্জালো। সেটি ছিল রাজশেখর শেঠের নবনির্মিত মন্দির। গুরু সোমদেব সেখানে ধ্যানতন্ময় হয়ে মহাকালীর কাছে অন্তরের আকুল প্রার্থনা জানাচ্ছিলেন। এমন সময় গঞ্জালো সেখানে সহসা এসে উপনীত হ'ল। সোমদেব তার হাত ধরলেন। ভাবলেন, মহামায়াই তাঁর পুজোর বলি এনে উপস্থিত করেছেন।

॥ ৯ ॥

শঙ্খ দত্তের অন্তরে সঞ্চিত হয়েছে এক দারুণ মোহ। দেবদাসীর দেহ ও রূপের চিন্তায় দিবারাত্র তিনি বিভোর। রক্তে ছড়িয়েছে কামনার আগুন। 'স্বতা' শব্দটিই যেন তাঁকে প্রলুব্ধ করছে দুঃসাহসিক কিছু একটা করার জন্য। রাজপ্রাসাদের সামনে পথের ওপর দাঁড়িয়েই শঙ্খ তন্ময় হয়ে ভাবছিলেন। এমন সময় রাজার সৈন্য ও হাতির আবির্ভাবে হুড়োহুড়ি পড়ে যায়। তারই ধাক্কায় পথের ওপর মুখ থুবড়ে পড়ে শঙ্খের মুখ-হাত-পা কেটে গেল। মুখে লবণাক্ত রক্তের স্বাদ নিয়ে ফিরে চললেন তিনি।

পুরীধামে এইভাবে থেকে যাওয়ায় উদ্ধব পান্ডার মনের কোণায় হয়তো কিঞ্চিৎ সন্দেহ দেখা দেয়। শঙ্খ দত্ত-ও সচেতন হয়ে ওঠেন—ব্যবসা-বাণিজ্য ভুলে কীভাবে কালক্ষেপ করছেন তিনি! অতএব আর দেরী নয়—কালই যাত্রা করবেন।

বাণিজ্যিক পণ্য সওদা করছিলেন শঙ্খ। সেখানে দুই সাধারণ মানুষের কথাবার্তা থেকে তিনি জানতে পারেন দেবদাসী শম্পার বাড়ীটি কোথায়। শান্ত হয়ে আসা শঙ্খের মনটি উত্তেজনায় আবার বিচলিত হয়ে ওঠে। দ্রুতপদে শম্পার বাড়ীর প্রাচীরের পাশে চলে

এলেন। জানালায় বসে চুল বাঁধছিলেন দেবদাসী। শুষ্ক করুণ মুখে ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসছিলেন শঙ্খ দত্ত। এমন সময় তাঁকে বিহ্বল-বিস্মিত করে দিয়ে প্রাচীরের একটি ছোট দরজা খুলে গেল। এক তরুণী চাপা কণ্ঠে তাঁকে আহ্বান জানাল। দেবদাসী তাঁকে ডেকে পাঠিয়েছেন। দুরু দুরু বক্ষে সম্মোহিতের ন্যায় শঙ্খ সেই তরুণীকে অনুসরণ করে শেষ পর্যন্ত দেবদাসীর কক্ষে এসে প্রবেশ করলেন।

নমস্কার জানিয়ে অভ্যর্থনা করলেন দেবদাসী। স্বপ্ন-ঘোর কাটিয়ে শঙ্খ দত্ত নিজের পরিচয় দিলেন। বাণিজ্যযাত্রার কথা বললেন। সাবধান করে দিলেন শম্পা, গৌড়ের বণিককে। ভিক্ষুকের মত যাঁর দর্শন প্রার্থনায় দাঁড়িয়েছিলেন শেঠ শঙ্খ দত্ত, তাঁকে পাওয়ার চেষ্টা করা আর মৃত্যুর ফাঁদে পা দেওয়া একই ব্যাপার! দেবদাসীর প্রতি সকাম দৃষ্টির পুরস্কার হল, রাজার প্রহরীর হাতে মস্তক ছিন্ন হওয়ার নিশ্চিত দণ্ড। এই কথাটা জানাবার জন্যই একান্ত গোপনে শেঠকে ডেকে এনেছেন তিনি।

সহসা সব ভয়, আড়ষ্টতা অন্তর্হিত হ'ল শঙ্খ দত্তের। বললেন এ পর্যন্ত যাঁরা মৃত্যু বরণ করেছেন তাঁরা ছিলেন ভীরু, ভিক্ষুকের মতো প্রার্থনাই জানিয়ে ছিলেন; কেড়ে নেওয়ার সাহস তাঁদের হয় নি। শঙ্খ দত্ত ভীরু নন। তিনি শেষ চেষ্টা করে দেখবেন। আহত, আর্ত কণ্ঠে শম্পা তাঁকে বাঙলার সর্বস্বত্যাগী সন্ন্যাসী মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন। স্মরণ করিয়ে দিলেন, তাঁর গুরু রামানন্দ সেই চৈতন্যের সেবক।

বাইরে বেরিয়ে এসে শঙ্খ দেখলেন, চাঁপা ফুলের মতো উজ্জ্বল স্বর্ণাভ গায়ের রঙ, কৌপীনধারী এক সন্ন্যাসী সংকীর্তনের একটি দলের মধ্যে নৃত্য করতে করতে গাইতে গাইতে চলেছেন "না সো রমণ না হাম রমণী" শ্রীচৈতন্যদেব পথের দুপাশের জনতাকে প্রেমমুগ্ধ করে চলে গেলেন। শঙ্খ দত্তের যেন চমক ভাঙল।

॥ ১০ ॥

ক্লান্ত-শ্রান্ত-অবসন্ন গঙ্গালো। পিছনে বন্দুকের আওয়াজ, কোলাহল। সামনে ভয়ঙ্কর দর্শন জটাজুটধারী তান্ত্রিক সন্ন্যাসী সোমদেব। হাত ধরে সোমদেব অন্ধকার পথে গঙ্গালোকে নিয়ে এলেন রাজশেখরের প্রাসাদোপম গৃহে। গঙ্গালো রাজশেখরের কাছে এসে কিছুটা স্বস্তি অনুভব করলো।

জীর্ণ-প্রাচীন, গাছপালা ঘেরা প্রাসাদের একটি ঘরের মধ্যে গঙ্গালো আশ্রয় পেল। মাতা মেরীর কাছে প্রার্থনা জানিয়ে উঠতেই দেখলো, খাবারের থালা ও জল নিয়ে এসে দাঁড়িয়েছে দুটি প্রাণী। গঙ্গালো প্রাণ পেল। নিদ্রা এসে হরণ করলো তার ভাবনার ভার।

সকালের আলোয় গঙ্গালো জাগলো। ঘরের পিছনেই 'যখের জঙ্গল'। বিষধর সাপের আড্ডা। নানা চিন্তায় মন তার বিষণ্ণ। বাইরে বেরিয়ে এসে দেখতে পেল

তার জীর্ণ মহলটার পাশেই রাজশেখরের নতুন মহল। তারই ছাদে দাঁড়িয়ে আছে একটি সুন্দরী মেয়ে। সোনার রোদে স্নান করে উদাস মুগ্ধ চোখে বনের দিকে তাকিয়ে আছে সে। সুপর্ণা—রাজশেখরের কন্যা। একসময় গঞ্জালোর দিকে তার চোখ পড়ে যেতেই অবাক হ'ল সুপর্ণা। কে, এই বিদেশী? সুন্দর কান্তি—অদ্ভুত বেশবাস! গঞ্জালোও তাকে দেখে খুশি হয়েছে। অপরিচিত ভাষায় ডাকছে তাকে।

ইত্যবসরে নবারের সৈন্য এসে রাজশেখরের কাছে বিদেশী পলাতক বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে। কেউ তাঁর গৃহে আশ্রয় নিয়েছে কিনা সে প্রশ্নও করলো তারা। কিন্তু শেঠজীর প্রতি তাদের অগাধ বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা। কাজেই তিনি 'না' বলায় নবাব সৈন্য চলে যায়। চিন্তিত রাজশেখর গুরুদেবের অপেক্ষায় থাকেন, মন্ত্রণার জন্য। পিছন থেকে শম্পা এসে তাঁকে জিজ্ঞাসা করে—কে এই বিদেশী। তাকে বিশেষ কিছু না বলে, রাজশেখর এড়িয়ে গেলেও, শম্পার মনের কৌতূহল নিবৃত্ত হ'ল না। নিঃঝুম দুপুরে চুপি চুপি সে গঞ্জালোর দরজায় এসে দাঁড়ালো।

॥ ১১ ॥

নবাব খোদাবক্স খাঁ-এর দরবারে যখন ডি মেলোদের ডাক পড়ল, তখন তাঁদের মনে কোন সন্দেহ ছিল না, এই পলায়নের চেষ্টার ফলে তাঁদের মৃত্যুদণ্ডের জন্যই ডাকা হয়েছে। কিন্তু সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য ঘটনা ঘটল। জনৈক পার্শী বণিক, নাম খোজা সাহাবুদ্দিন, মুক্তিপণ দিয়ে নবাবের কারাগার থেকে তাঁদের সকলকে মুক্ত করেছেন। যে ঘটনা ঘটে গেছে, নবাব তার জন্য দুঃখিত। ডি মেলো প্রথমটায় বিশ্বাসই করতে পারছিলেন না। কিন্তু সাহাবুদ্দিন যখন বন্ধুত্বের হাত তাঁর দিকে বাড়িয়ে দিলেন, তখন সানন্দেই ডি মেলো তা গ্রহণ করলেন। সাহাবুদ্দিন তাঁর জাহাজে সকলকে নিমন্ত্রণ করলেন।

জাহাজে আহার্য ও মদ্যপানীয়ের সঙ্গে সাহাবুদ্দিন ডি মেলোকে সংবাদ দিলেন যে, তিনি মাননীয় ডি-কুনহার প্রতিনিধি হয়ে এসেছেন খোদাবক্সের কাছে। ৩০০০ হাজার ক্রুজাডো তিনি তাদের মুক্তিপণ হিসাবে দিয়েছেন। ডি-কুনহার সঙ্গে তাঁর পরিচয়ের সূত্রটিও জানালেন সাহাবুদ্দিন।

পর্তুগীজ ক্যাপিতান ভ্যাজ-পেরিরা কিছুকাল আগে সাহাবুদ্দিনের দু'খানি পণ্য-ভরা জাহাজ আটক করেন এই অজুহাতে যে, তাঁর জাহাজ দু'খানি পর্তুগীজ জাহাজের মতো দেখতে এবং ঐ জাহাজে করে তিনি নাকি সমুদ্রে ডাকাতি করেন, আর তার দোষ বর্তায় পর্তুগীজদের ওপর। যাই হোক, নিরুপায় হয়ে সাহাবুদ্দিন শেষ পর্যন্ত গোয়ার গভর্নর ডি-কুনহার কাছে যান, সবকিছু বুঝিয়ে বলেন, এবং আশ্বাস দেন তিনি, যদি তাঁর পণ্যভরা জাহাজ দুটি ফিরিয়ে দেবার ব্যবস্থা করেন, তাহলে তিনি ডি-মেলোর মুক্তির প্রতিশ্রুতি দিতে পারেন।

বাঙলায় পর্তুগীজদের ব্যবসা করার স্বপ্নকে সার্থক করতে সব রকম সাহায্য করবার প্রতিশ্রুতিও সাহাবুদ্দিন দিতে রাজি যদি পর্তুগীজ ক্যাপিতান তাঁকে বিপদ থেকে উদ্ধার করেন। ডি মেলো তৎক্ষণাৎ সে আশ্বাস দিলেন এবং জানতে চাইলেন কী সাহায্য তাঁকে করতে হবে। সাহাবুদ্দিন বলেন, গৌড়ের সুলতান নসরৎ শাহের সঙ্গে তাঁর বিরোধ চলছে। এর একটা মীমাংসা হওয়া প্রয়োজন। এ বিষয়ে পর্তুগীজদের সাহায্য তাঁর একান্ত প্রয়োজন। ডি মেলোও তাঁকে সে প্রতিশ্রুতি দিলেন।

গুরু সোমদেবের কথায় কেঁপে উঠলেন রাজশেখর। পরশু অমাবস্যা। ঐদিন মধ্যরাত্রেই গঙ্গালোকে বলি দিতে হবে দেবীর চরণে। এর অন্যথা হবে না, এ-ই চামুণ্ডার আদেশ। রাজশেখরের সমস্ত প্রতিবাদ, অনুনয়-বিনয় নস্যাৎ করে দিলেন সোমদেব।

॥ ১২ ॥

নীলাচলে শ্রেষ্ঠী শঙ্খ দত্তের ঘোর-ঘোর অবস্থা, এবং কালহরণ দেখে হয়ত উদ্ধব পাণ্ডার মনেও একটা সন্দেহ উঁকি দেয়। শঙ্খ দত্তকে সামান্য কিছু জিজ্ঞাসাবাদও সে করে। অতএব আর নয়। শঙ্খকে এবার দক্ষিণ পাটনে বেরিয়ে পড়ার আয়োজন করতেই হয়, এবং মনটাকে তিনি অনেকখানি আয়ত্তেও এনে ফেলেন। খোলা হাওয়ায় একটু বেড়িয়ে আসার জন্য দেবদাসী যেদিকে থাকেন একেবারে তার বিপরীত পথে চলতে চলতে নগরের সীমা ছাড়িয়ে অপরিচিত অঞ্চলে এসে পড়েন তিনি। একটা গোলমাল চিৎকারে আকৃষ্ট হয়ে দেখেন, কতকগুলি ব্যাধ জাতীয় লোক একটি নিহত সম্বর হরিণকে নিয়ে মারমুখী। দানব সদৃশ একটি লোকের বিরুদ্ধে পনেরো জন রুখে দাঁড়িয়েছে হরিণের ভাগ নিয়ে। শেষ পর্যন্ত সকলকে ভীত-সন্ত্রস্ত করে সেই দৈত্য চেহারার লোকটিই—নাম রাঘব—হরিণ ঘাড়ে তুলে এগিয়ে চলল। এই দৃশ্য দেখে সহসা শঙ্খ তাঁর নিজের মধ্যে একটা হিংস্র জান্তব শক্তিকে আবিষ্কার করে চমকে উঠলেন। তিনি লোকটির পিছু নিলেন এবং নির্জন স্থানে এসে লোকটিকে ডাকলেন। চারিপাশে শুধু ফণিমনসার উদ্যত ফণা। শঙ্খ রাঘবকে শম্পা হরণে নিযুক্ত করলেন।

রাত্রির কালোয় রাক্ষস সমুদ্র কালো। অশ্রান্ত গর্জন। শঙ্খ দত্ত ভয়, উত্তেজনা-অনুতাপ সব নিয়েই রাঘবের আগমন প্রতীক্ষায় প্রহর গুনতে থাকেন। অবশেষে ভয়-উত্তেজনা-শিহরণের মাঝেই অন্ধকারের বুক চিরে রাঘব শম্পার অসাড় দেহটাকে শূন্যে তুলে নিয়ে নৌকার খোলের মধ্যে শুইয়ে দেয়। শঙ্খ বিবেকের যন্ত্রণাকে চেপে রেখে নৌকায় উঠে পড়েন। পাল তুলে ভেসে পড়ে শঙ্খের মধুকর ডিঙা।

॥ ১৩ ॥

ভাষা অপরিচিত হলেও—একের মুখের কথা অন্যে সারোদ্ধার না করতে পারলেও দুটি তরুণ-তরুণী পরস্পরের চোখের আলোয় হৃদয়ের ভাষা কিছুটা আন্দাজ করে নিতে

পারছিল। তাই কিশোর গঞ্জালো এবং কিশোরী সুপর্ণা পরস্পরের দিকে তাকিয়ে মুগ্ধ হয়ে থাকে। তাদের চোখে আলো, মুখে হাসি, এবং ইঙ্গিতময় ভাবপ্রকাশে বাধা হয় না। সুপর্ণা তাকে এনে দেয় ফল-মিষ্টি।

কিন্তু ততক্ষণে গঞ্জালোর খুশির সুর গেছে কেটে, ফিকে হয়ে গেছে আনন্দের রঙ। ভয় ও শিহরণ এসে মনটাকে বিষণ্ন-বিস্বাদ করে দিয়েছে। যে প্রসন্ন নীল আকাশ, সোনালী রোদ, সবুজ প্রকৃতি ও সবার চেয়ে সুন্দর কিশোরী সুপর্ণাকে, যে তাঁর **minha pequena** ('আমার বান্ধবী'), যাকে দেখে তার মন খুশিতে ঝলমল করে উঠেছিল, সহসা দূরে ভয়ঙ্কর দর্শন সোমদেবকে দেখেই তার মনে অজানা আশঙ্কা এসে সব সুর কেটে দিয়েছে।

গঞ্জালোকে নিয়ে সুপর্ণার মজা ও খেলা ক্রমশঃ একটা মোহে পরিণত হয়। গঞ্জালোর মুগ্ধাবেশ তাকে নিজের দেশে,—গোলাপের জলপাই-এর পথে টেগাস নদীর ধারে ধারে—সুপর্ণাকে পাশে নিয়ে ভ্রমণ করায়। হঠাৎ তার কণ্ঠে সুর জাগে, বক্ষ নিঙড়ে গান বেরিয়ে আসে, চোখে জল। এ গান তার দেশের গান, মাটির গান, এর নাম 'ফ্যাডোস'। আবেগ-চঞ্চল চিত্তে সুপর্ণার হাতখানি সে ধরে বসে। ধীরে ধীরে হাতখানি ছাড়িয়ে নিয়ে চলে যায় সুপর্ণা।

অমাবস্যার রাত। রাজশেখরের মনে সুপর্ণার প্রতি ব্যৎসল্য স্নেহটা সহসা উত্তাল হয়ে আরো দুর্বল করে দিয়েছে। চন্দ্রনাথের দয়াতেই ফিরে পেয়েছেন তিনি সুপর্ণাকে। তাঁরই প্রতিষ্ঠার জন্য নতুন মন্দির নির্মাণ, গুরু সোমদেবকে আনতে যাওয়া—কিন্তু কোথা থেকে কি হয়ে গেল। দুর্বল মন হু-হু করে ওঠে। বারে বারে ভাবেন গুরুকে জানাবেন গিয়ে তাঁর দ্বারা সম্ভব নয় গুরুর নিষ্ঠুর আদেশ পালন করা।

সুপর্ণা গমনোদ্যত পিতাকে আঁকড়ে ধরে থাকতে চায়। বলে তিনি ফিরে এলে তবে ঘুমুবে। মেয়েকে মিথ্যা স্তোক বাক্য দিয়ে রাজশেখর মন্দিরের উদ্দেশে বেরিয়ে যান।

উজ্জ্বল তারা। অন্ধকার অমাবস্যার রাত। তন্দ্রা-স্বপ্ন থেকে ভীত হয়ে জেগে ওঠে সুপর্ণা। ছুটে যায় বাবার অন্বেষণে মন্দিরে। সেখানে বীভৎস দৃশ্য দেখেই সুপর্ণার মূর্ছিত দেহটা মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। বেদীর ওপর কালীর মূর্তি। তাঁরই পায়ের কাছে মাটিতে সোনালি চুল কিশোর গঞ্জালোর ছিন্ন মুণ্ড। রক্তে ভেসে যাচ্ছে চারিধার। চিৎকার করে রাজশেখর ছুটে গেলেন মূর্চ্ছিতা কন্যার দিকে।

॥ ১৪ ॥

সমস্ত ব্যাপারটাই অতিদ্রুত এবং আকস্মিকভাবেই যেন ঘটে গেল। অসংখ্য চিন্তার জট শঙ্খ দত্তের মনকে আরও বিষণ্ন-ভারাতুর করে ফেলেছে। তাঁর বহর ঢেউ-এর নাগর দোলায় দুলতে দুলতে চলেছে। জগন্নাথের মন্দিরের চূড়া আর চোখে পড়ে না। চৈতন্যের কীর্তনের সুরও ভেসে আসে না। শুধু সমুদ্রের তরঙ্গ, আর গর্জন।

গহন, গভীর। তাঁরই হৃদয়ের প্রতিচ্ছবি যেন। রাঘব যেন তাঁর অন্তরের কুটিল, ক্রূর কামনার প্রতিমূর্তি নিয়েই হাজির হয়েছিল। সে যেন তাঁরই সৃষ্টি। নিজের সৃষ্টির কাছে নিজেই হার মেনেছিলেন শঙ্খ দত্ত। কিন্তু এখন আর ফেরার পথ নেই। শম্পার সামনে দাঁড়াবার মত সাহসও তাঁর নেই। দু'দিন তিনি শম্পার সঙ্গে দেখা না করে পালিয়ে ছিলেন। শম্পাই শেষে কথা বলেছেন প্রথম। একটু একটু করে তর্কের জাল বিস্তার করতে গিয়ে সাহস ফিরে এসেছে শঙ্খ দত্তের।

শম্পা জানিয়েছেন শঙ্খকে এতক্ষণে হয়তো রাজার নাবিকের দল সমুদ্রে শম্পাকে খুঁজতে বেরিয়ে পড়েছে। তার চেয়েও সাংঘাতিক মন্দিরের প্রধান পুরোহিতের কালপুরুষের মত দৃষ্টি। পৃথিবীর যে প্রান্তেই শঙ্খ যান-না-কেন নিস্তার নেই তাঁর হাত থেকে।

শঙ্খের দুরাশাগ্রস্ত মন ভাবে, শম্পা একদিন তাঁকে ক্ষমা করবেন। ধরা দেবেন তিনি শঙ্খের হাতে। কিন্তু শম্পার কথায় তাঁর পিঠে যেন চাবুক পড়ে। তিনি দেবতার : দেবতার সঙ্গে তাঁর সপ্তপদী হয়ে গেছে। দেববধূ তিনি। তার্কিক শঙ্খ নাস্তিকের মত বলে বসেন, দেবতা, চৈতন্য পারেন নি শম্পাকে শঙ্খ দত্তের হাতের মুঠি থেকে ছিনিয়ে আনতে। তথাপি টলাতে পারেন নি শঙ্খ শম্পার বিশ্বাস। গর্বিতভাবেই তিনি উত্তর দেন দেবতা তাঁর সঙ্গেই আছেন সর্বদা। শঙ্খ দত্ত তাঁর অঙ্গস্পর্শ করার চেষ্টা করলে দেবতার বিছানো কোল—সমুদ্রে আশ্রয় নিতে দেরী করবেন না শম্পা।

মোহমুগ্ধ শঙ্খ দত্ত ভাবেন শম্পা যখন সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করেন নি, তবে বোধ হয় কোথাও কোন দুর্বলতা তাঁর আছে। তৃতীয় রাত্রে নিজেকে আর সংযমের তন্ত্রীতে বেঁধে রাখতে পারেন না শঙ্খ। শম্পার কক্ষে গিয়ে দেখেন দরজা খুলেই পরম নিশ্চিন্তে নিদ্রামগ্না তিনি। এর আগে শঙ্খ বারবার ব্যর্থ-তিরস্কৃত হয়ে ফিরে এসেছিলেন। কিন্তু ঘরে ঢুকে দেখেন শম্পার ভয়লেশহীন শিথিল দেহখানি স্পষ্ট রেখায় জেগে আছে। দেখেই লালসার পরিবর্তে এক অদ্ভুত ভয়-শীতলতা শঙ্খের সর্বাঙ্গে প্রবাহিত হয়ে গেল। নিঃশব্দে পালিয়ে এলেন—কোনদিনই আর শম্পাকে ছুঁতে পারবেন না তিনি।

ব্যর্থ, মৃত্যুমুখ থেকে পালিয়ে আসা কোয়েলহো এবং ভ্যাসকন্‌সেলস তাঁদের জাহাজে বসে ক্রোধের আগুনে পুড়ছিলেন। অক্ষম আক্রোশে মুরদের কীভাবে সর্বনাশ করা যায় ভাবছিলেন। এমন সময় চোখে পড়ল জেণ্টুর শঙ্খ দত্তের বহর। কোন দ্বিধা নয়, কোয়েলহোর নির্দেশে সে বহর কামান দেগে ডুবিয়ে দেওয়া হ'ল। শঙ্খ দত্তের শ্বেতপতাকাকে গ্রাহ্যই করল না তারা। কোথায় হারিয়ে গেলেন ভাসতে ভাসতে শঙ্খ দত্ত, আর শম্পাই বা কোন দিকে গেলেন!

॥ ১৫ ॥

চার বছর পার হয়ে গেছে। এক প্রসন্ন সকালে পাঁচখানি পর্তুগীজ জাহাজ চট্টগ্রামের বন্দরে এসে ভিড়ল। নুনো-ডি-কুনহার রাজপ্রতাপকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতেই

আবার এসেছেন এই দলের ক্যাপিতান হয়ে ডি মেলো। খাজা সাহাবউদ্দীন পৌঁছে দিয়েছেন তাঁকে সারা ভারতবর্ষের রত্নের খনি বেঙ্গালায়, পোর্টো গ্রাণ্ডির বাণিজ্যিক সম্বন্ধ স্থাপনের ঐতিহাসিক গৌরব প্রতিষ্ঠার জন্য ডি মেলোকে পাঠানো হলেও কিন্তু তিনি নিজেকে বড়ই ক্লান্ত মনে করছেন। বেঙ্গালা সম্পর্কে তাঁর অভিজ্ঞতাও বড়ই তিক্ত—প্রতারণা, বিশ্বাসঘাতকতার !

সাহাবউদ্দীন ডি মেলোকে নিয়ে নবাবের দরবারে উপঢৌকনসহ এলেন। অভ্যর্থনার ত্রুটি হ'ল না। তবে, নবাব জানালেন, বাণিজ্যের অধিকার, কুঠি নির্মাণ প্রভৃতি বিষয়ে গৌড়ের সুলতানের একটি ফরমান দরকার। একজন দূতকে সেখানে পাঠিয়ে, ক্যাপিতান ততদিন নবাবের আতিথ্য গ্রহণ করে বিশ্রাম নিন। সেই ব্যবস্থাই ডি মেলো মেনে নিলেন।

* * * *

সপ্তগ্রাম থেকে গৌড়—বাংলার এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত। তখনও তাল-নারকেল-সুপুরির ছায়ায় ঘেরা, নীল আকাশের স্বপ্নে ভরা দেশ, জ্যোৎস্নার মায়ায় ধোয়া ; কর্ণফুলি-ব্রহ্মপুত্র-পদ্মা-গঙ্গার শীকরসিক্ত এবং বিহঙ্গ-কূজিত দেশ। সোনার ফসল এর ঐশ্বর্য ; পুষ্পবাহার এর সৌন্দর্য। আটচালা-শিবমন্দির থেকে শঙ্খ-ঘণ্টাধ্বনি ওঠে, মসজিদ থেকে ভেসে আসে ভক্তের আজান, বৌদ্ধ পূর্ণিমায় 'গৌতম চন্দ্রিমার' আরতি হয় ধূপে-দীপে।

সাত সমুদ্র তের নদী পার হয়ে, কত দেশ-মহাদেশ পার হয়ে, গোয়া-দিউ-কালিকট হয়ে, তবে বেঙ্গালা ! কত ঝড়-ঝঞ্ঝা মাথায় করে, দুঃখসাগর সাঁতরে তবে বেঙ্গালা। আজেভেদো, ডি মেলোর দূত হয়ে এলেন সেই বেঙ্গালায়—গৌড়ে। তিনি মহামান্য গৌড়েশ্বরকে রাজা নুনো-ডি-কুনহার উপঢৌকন দিলেন। চাইলেন সুলতানের বন্ধুত্ব, এবং বাণিজ্যের অধিকার ও কুঠি নির্মাণের অনুমতি। একদিন অপেক্ষা করতে বললেন সুলতান মামুদ শা।

কিন্তু সিদ্ধান্ত হয়েই গিয়েছিল মামুদের। উজীর সাহেবকে ডেকে পাঠিয়ে আদেশ দিলেন ক্রীশ্চানগুলোকে কোতল করার। এবং চট্টগ্রামেও যারা আছেন তাঁদেরও গর্দান নেওয়ার। কারণ পর্তুগীজ দূত যে উপঢৌকন গৌড়েশ্বরকে দিয়েছেন তার মধ্যে আছে লুটের সামগ্রী, কয়েক পেটি ইরানী গোলাপজল। তাদের এই স্পর্ধার শাস্তি হ'ল মৃত্যুদণ্ড।

উজীর এবং বিচক্ষণ আলফা হাসানী সুলতানকে তাঁর বর্তমান জটিল রাজনৈতিক পরিস্থিতির কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা বন্ধ করার পরামর্শ দিয়েও বিফল যখন, তখন সহসা আলখাল্লাধারী জনৈক ফকিরের আবির্ভাব ও নিষেধে মৃত্যুদণ্ড রদ হয়।

॥ ১৬ ॥

সোমদেবের ভুল হয়েছিল রাজশেখর শ্রেষ্ঠীকে বুঝতে। শক্তিমন্ত্রে দীক্ষা নেবার মতো তাঁর কোন মানসিক ক্ষমতাই নেই। সামান্য রক্তপাতে সুপর্ণা পাগল হয়ে গেছে,

আর দুর্বল রাজশেখর অনুশোচনায় নবাব দরবারে গিয়ে নিজ অপরাধ স্বীকার করে কারারুদ্ধ হয়েছেন। বর্তমানে তাঁর কী অবস্থা সোমদেব তার কিছুই জানেন না। তিনি সময় মতো পালিয়ে বেঁচেছেন। এখন দেখতে পাচ্ছেন—দেশ জুড়ে ক্লীবের দল। দেশের ভূস্বামীরাও বিধর্মী শাসকের পায়ে মাথা বিকিয়ে বসে আছে।

তবুও হাল ছাড়েন নি সোমদেব। সাসারামের শের খাঁর সঙ্গে গৌড়েশ্বরের লড়াই শুরু হয়েছে। এরই সুযোগে হিন্দুরা রাজত্ব ফিরে পেতে পারে। সুতরাং সুযোগ গ্রহণ করার জন্য সকলকে প্রস্তুত থাকতে হবে। তা না হলে চতুর্থ শক্তি ক্রীশ্চানেরা দখল করবে এই রাজ্য।

কিন্তু এক সোমদেব কী করতে পারেন? কতটা পারেন? দেশ জুড়ে এখন চৈতন্য ও তাঁর শিষ্য সম্প্রদায় খোল-কর্তাল বাজিয়ে লোকগুলোকে ভেড়া বানিয়ে ফেলছে। অতএব আর চুপ করে থাকা নয়—এদের বিরুদ্ধেও সোমদেবকে লড়তে হবে।

এমন সময় শিষ্যা মালিনী এসে উপস্থিত কেশব শর্মার স্ত্রী। গুরু সোমদেবকে ভয়ে ভয়ে তিনি মহাপ্রভু চৈতন্য সম্পর্কে দু'এক কথা জিজ্ঞাসাবাদ করতেই ক্ষিপ্ত হয়ে তিনি জানিয়ে দিলেন দুর্বলের অহিংসা ধর্মে দেশ ছেয়ে গেছে। দেশের রাজনৈতিক অবস্থা খুবই জটিল, এখন শক্তির জাগরণ দরকার। কেশব পণ্ডিত এসেও সোমদেবের সঙ্গে তর্ক করেন। চৈতন্যদেবের সমন্বয়ের পথই তাঁর মতে সঠিক পথ। হিন্দুরাও একদিন বেদ-বিদ্বেষী বৌদ্ধদের প্রতি নিষ্ঠুর অত্যাচার চালিয়েছিলেন। যারা হিন্দু সমাজে অধঃপতিত নীচ, তারাও নানা প্রকার লাঞ্ছনা সহ্য করেছে হিন্দুদের হাতে। কাজেই আজ তারা সবাই দলে দলে হিন্দুধর্ম ত্যাগ করছে যখন, সেই সময়ে মহাপ্রভুর সর্বধর্মসমন্বয়কারী প্রেম ধর্মই একমাত্র পথ।

এই তর্কের পর থেকে সোমদেবের মনে সংশয় আরও গাঢ়তর ছায়া ফেলেছে। কাকে জাগাবেন তিনি? এরা হয় ভীরু, নয় স্বার্থপর, নয় দর্বল, নয় দাসানুদাস।

* * * *

ভোরে ঘুম ভেঙে উঠে বসলেন সোমদেব। শুনলেন নৈয়ায়িক ও শাক্ত কেশব পণ্ডিতের বাড়ীতেই বৈষ্ণবের কীর্তন হচ্ছে! এসে দেখেন একদল লোক উন্মত্তের মতো খোল করতাল বাজিয়ে নাচছেন প্রাঙ্গণে, অচেতন হয়ে পড়ে আছেন অনেকে। কেশবকে ধরে ঝাঁকানি দিতেই তিনি জানালেন দুঃসংবাদের কথা। মহাপ্রভু ইহলীলা সংবরণ করেছেন।

উল্কাপিন্ডের মতো ছুটে বেরিয়ে গেলেন সোমদেব। তাঁর রক্তাক্ত চোখে এখন ফোঁটায় ফোঁটায় জল।

॥ ১৭ ॥

সুলতান গিয়াসউদ্দীন মামুদ শা, উজীর এবং আলফা হাসানী তিনজনেই অবাক বিস্ময়ে চেয়ে রইলেন সেই আলখাল্লা পরিহিত দরবেশ ফকিরের দিকে। তিনি সুলতানকে

স্মরণ করিয়ে দিলেন ফিরোজ শাহকে হত্যার কথা ; যাকে হত্যা করে মামুদ সিংহাসন অধিকার করেন। অতএব সুলতান এবার নিজেকে কিছুটা সংযত করলেন। সেই দরবেশ মামুদকে, যাঁর পূর্বনাম ছিল আবদুল বদর, স্মরণ করিয়ে দিলেন যে, তিনি দেশ জুড়ে শত্রু সৃষ্টি করেছেন, এই অবস্থায় আবার নতুন করে রক্তপাত ঘটিয়ে ক্রীশ্চানদের শত্রু করলে মামুদের বিপদ ঘোরতর হবে নিঃসন্দেহে। অতএব ক্রীশ্চানদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করাই তাঁর পক্ষে যুক্তিসঙ্গত হবে।

মামুদ ক্রীশ্চানদের বধ না করলেও, তাদের কারাগারে নিক্ষেপ করলেন। এবং চট্টগ্রামেও একইরূপ ব্যবস্থা নিতে বললেন।

আজেভেদোর চোখ থেকে তখনও বাঙলার স্নিগ্ধ-কোমল মায়া ও ঐশ্বর্যের দীপ্তি মুছে যায় নি ; এমন সময় সুলতানের সৈনিকরা এসে তাঁকে সদলবলে বন্দী করে নিয়ে গেল। আজেভেদোর স্বপ্ন গুঁড়িয়ে গেল।

* * * *

ডি মেলো চট্টগ্রামে চঞ্চল হয়ে ওঠেন। কবে আসবে গৌড়ের সম্মতি—মনে এই এক প্রশ্ন। বেঙ্গালার অভিজ্ঞতা তাঁর খুবই তিক্ত। এর আকাশ-বাতাস বিশ্বাসঘাতকতার বিষবাষ্পে ভরা। এদিকে ডি মেলোর সঙ্গীরা খানিকটা হতাশ হয়ে পড়েন। এখানে ব্যবসা করতে গেলে মুরদের চেয়ে পর্তুগীজদের দ্বিগুণ শুল্ক দিতে বাধ্য করা হয়—ফলে লাভ তাদের থাকেই না প্রায়। ক্রিস্টোভাম তাই গুয়াজিলের সঙ্গে গোপন ঘুষের একটা ব্যবস্থার কথা জানায় ডি মেলোকে। মন না চাইলেও এই বিশ্বাসঘাতক মুরদের সঙ্গে সততা-আদর্শের কোন অর্থ যে নেই তা স্বীকার করেন তিনি। এই ব্যবস্থায় রাতের অন্ধকারে পর্তুগীজ জাহাজ থেকে মাল বন্দরে নামে, আবার এখানকার মসলিন ও অন্যান্য সামগ্রী তাদের জাহাজে ওঠে।

তারপর একদিন সদলবলে গুয়াজিল আসে ডি মেলোর জাহাজে। সুখবর এসেছে গৌড় থেকে। সুলতান তাঁদের বাণিজ্য করতে অনুমতি দিয়েছেন। আগামীকাল নবাবের দরবারেই সুলতানের ফরমান ডি মেলোর হাতে তুলে দেওয়া হবে। গৌড়ে আজেভেদো রাজ-অতিথি হয়ে সুখে আছেন। এই সৌভাগ্যেরই নিদর্শন হিসাবে গুয়াজিল ক্যাপিতান ডি মেলোকে সদলবলে সেদিন রাত্রে নৈশাহারের নিমন্ত্রণ করলেন। ক্যাপিতানও তা সানন্দেই গ্রহণ করলেন।

সন্ধ্যায় গুয়াজিলের বাড়ির প্রাঙ্গণে বিরাট ভোজসভা বসল। সহসা অসুস্থতা বোধ করে গুয়াজিল, আলী হোসেন নিষ্ক্রান্ত হলেন ; আর সঙ্গে সঙ্গেই ঘটল অভাবিত এক কান্ড। সহসা এক মেঘমন্দ্র ধ্বনি শোনা গেল : গৌড়ের সুলতানকে লুটের মাল উপহার দেওয়ার অপরাধে এবং শুল্ক ফাঁকি দিয়ে অবৈধ বাণিজ্য করার অপরাধে গৌড়েশ্বরের আদেশে সকলকে বন্দী করা হ'ল।

চারিদিক থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ল শত শত মুর সৈন্য পর্তুগীজদের ওপর। রক্তাক্ত দেহে অনেকেই লুটিয়ে পড়লেন মাটিতে। বাকিরা অস্ত্র ত্যাগ করে বন্দীত্ব স্বীকার করে

নিলেন। পরের দিন ডি মেলো সহ সকল বন্দীকে গৌড়ের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করা হ'ল। ডি মেলো বুঝলেন সারা বাঙলা দেশই চাকারিয়া।

॥ ১৮ ॥

বাক্যহারা, স্মৃতিভ্রংশ কন্যা সুপর্ণাকে নিয়ে শ্রেষ্ঠী রাজশেখর গত তিন বছর ধরে তীর্থে তীর্থে মন্দিরে মন্দিরে হত্যে দিয়ে চলেছেন। আজও সেই এক অবস্থা। এখন তাঁরা চলেছেন গঙ্গাসাগরের উদ্দেশে। বাক্যহারা সুপর্ণা উদাস ভাষাহীন চোখে স্থির চিত্রকল্পের মতো বাইরের দিকে তাকিয়ে বসে আছে। পৃথিবীর কোন কোলাহল, কোন হাসি-গান, কোন বৈচিত্র্য, আবেদন-নিবেদন-আহ্বান তার কানে পৌঁছায় না। খাওয়ালে খায়, না-খাওয়ালে খায়-না।

বেলা বাড়ে। দ্বিপ্রাহরিক আহারের জন্য একটা জীর্ণ নদীর ঘাটে নৌকা নোঙর করা হয়। ঠিক এই সময় সেখানকার ভাঙা একটা মন্দির থেকে বেরিয়ে আসেন জটাজুট, বিশৃঙ্খল দাড়ি-গোঁফ নিয়ে শঙ্খ দত্ত। রাজশেখরকে দেখে তিনি চিনতে পেরেছেন। 'কাকা' বলে সম্বোধন করতে রাজশেখরও তাঁকে চিনলেন। তারপর একই নৌকায় চললেন তাঁরা গঙ্গাসাগরের উদ্দেশ্যে।

শঙ্খ দত্ত সুপর্ণার সব কথাই শুনলেন। তাকে কথা কওয়াবার দায়িত্ব নিলেন তিনি। শঙ্খ দত্তও সেই বিপর্যয়ের পর একটি কাষ্ঠখণ্ড ধরে ভাসতে ভাসতে এক দ্বীপে গিয়ে প্রথম ওঠেন। সেখান থেকে মগেদের জাহাজে করে গঙ্গাসাগরের পথে এই নির্জন প্রায় স্থানে এসে তিনি আশ্রয় নেন। রাজশেখর শুনলেন শঙ্খের জীবনের ঘটনা। দীর্ঘশ্বাস ফেলে শঙ্খ বলেন গুরু সোমদেবই ঠিক বলেছেন—চুপ করে থাকলে চলবে না।

সোমদেবের কথায় রাজশেখর উত্তেজিত হয়ে ওঠেন। সোমদেবের ক্ষ্যাপামির সব কথা তিনি বলেন শঙ্খকে। অস্ত্র নেই, প্রস্তুতি নেই, কিছু নেই, অথচ তিনি রাজ্যগড়ার উন্মাদ কল্পনায় বিভোর। তাঁরই পাগলামির জন্য সুপর্ণা আজ স্মৃতিহারা বাকশক্তি বিহীন—মৌন-মূক।

শঙ্খ দত্ত বিস্ময়ের ঘোর কাটিয়ে সুপর্ণাকে কথা বলানোর দায়িত্ব নিজ স্কন্ধে নিলেন।

॥ ১৯ ॥

মামুদ শার অন্তরে অশান্তির তরঙ্গ। কবন্ধ ফিরোজ আর রক্তমাখা সিংহাসন তাঁর রাত্রের নিদ্রা হরণ করেছে। দিনে ত্রাস হয়ে দেখা দেয় হাজিপুরের মখদুম-ই-আলম এবং সাসারামের শের খাঁ। বাবরের বিরুদ্ধে নসরৎশা এবং লোহানীদের নেতৃত্বে যাঁরা একদিন সঙ্ঘবদ্ধ হয়েছিলেন, আজ তাঁরাই গৌড়ের সর্বনাশের জন্য মেতে উঠেছেন। শের খাঁ-এর সঙ্গে হাত মিলিয়েছেন মখদুম। ফিরোজ হত্যাই এর অন্যতম কারণ।

শেরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লোহানী আর গৌড়ের হার হয়েছে। কুতুব খাঁ প্রাণ দিয়েছে। মামুদের সৈন্য পরে মখদুমকে হত্যা করে প্রতিশোধ নিলেও শের খাঁ এখনও গৌড়ের ত্রাস হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। সুন্দরী বাঈজী, নাচ-গান-সুরা—কোনকিছুই মামুদকে শান্তি দিতে পারে না।

লোহানী জালাল খাঁ, এবং সেনাধ্যক্ষ ইব্রাহিম খাঁ-র সঙ্গে এক বিশাল বাহিনী পাঠিয়েছেন মামুদ, শেরের বিরুদ্ধে সুরজগড়ে। কয়েকদিন হয়ে গেল, তার ফলাফল না জানতে পারায় অতীব উদ্বিগ্ন তিনি। তিনি খবর পেয়েছেন মখদুম মারা গেলেও তাঁর কোটি টাকার হীরা-মাণিক্য শের খাঁকে দিয়ে গেছেন, যার জোরে শের এমনভাবে লড়তে পারছেন।

এমন সময় আলফা হাসানী এসে সংবাদ দেন মামুদকে যে, গোয়ার শাসনকর্তার দূত জর্জ আলকোকোরাদো গৌড়ে এসেছেন ন'খানি জাহাজ নিয়ে; তাতে আছে অস্ত্র-শস্ত্র এবং ক্রীশ্চান সৈন্য। এদের সেনাপতি সিলভা মেঞ্জেস গৌড়ের সুলতানকে জানিয়েছেন যদি দলবলসহ ডি মেলোকে তিনি এই মুহূর্তে মুক্তি না দেন তা হলে চট্টগ্রামে রক্তের বন্যা বইবে এবং আগুন জ্বলবে।

উজীর এবং আলফা হাসানীর পরামর্শে মামুদ শেষ পর্যন্ত ক্রীশ্চান দূতকে বন্দী করে রাখতে আদেশ দিলেন—ভেবেচিন্তে সিদ্ধান্ত নেবেন তিনি।

॥ ২০ ॥

রাজশেখর শেঠের বজরা রাজহাঁসের মতো ভেসে চলল। নগরের কাছাকাছি এখন তারা। শঙ্খদত্ত ভাবেন বাণিজ্য বহর খুইয়ে এভাবে মাথানীচু করে তিনি দেশে ফিরে যেতে পারবেন না। সুপর্ণার ভাবলেশহীন মূর্তিতে প্রাণ প্রতিষ্ঠার ভার গ্রহণ করেছেন তিনি। সুপর্ণাকে ডাকেন, কথা বলতে মিনতি জানান। না বুঝেই হয়তো সুপর্ণা কখনও চোখ তুলে তাকায়—কিন্তু ঐ পর্যন্তই।

সুপর্ণা কাছে থেকেও দুর্লভ, অপ্রাপনীয়া। তাই হয়তো শঙ্খ দত্তের মন টানে। সুপর্ণাকে তিনি ফিরিয়ে আনবেন। আপন করে নেবেন তাকে।

গঙ্গাসাগর। কপিল মুনির ধ্যানপবিত্র ধন্য তীর্থক্ষেত্র। সগর রাজার ষাট হাজার মৃত পুত্র এখানে পুণ্যতোয়া জাহ্নবীর স্পর্শে প্রাণ পেয়েছেন, মুক্তিলাভ করেছিলেন। সেই পুণ্যতীর্থক্ষেত্র গঙ্গাসাগরে এলেন রাজশেখর।

এখানে ঘটল উত্তেজনাকর এক ঘটনা। শ্রীপুরের ছোট রানীর সন্তান বিসর্জন হবে। তারই উত্তেজনা, কোলাহল, বাজনাবাদ্য—ইত্যাদির মধ্যদিয়ে সেই করুণ ঘটনাই ঘটল। জয় মা গঙ্গা,—ঢাক-ঢোল-কাঁসির আওয়াজ; আর সন্তানহারা জননীর আর্তনাদ-মূর্চ্ছা ইত্যাদি ইত্যাদি। পুজো দিয়ে আসতে গেলেন রাজশেখর।

ভোরের অন্ধকার ভাল করে অপসারিত হওয়ার আগেই সুপর্ণা খোলের বাইরে এসে বসে। শঙ্খ দত্ত হতাশাপীড়িত চিন্তাজর্জরিত অবস্থায় যখন নিমগ্ন এবং নৌকার অন্যান্য আরোহীরা যখন তন্দ্রাঘোরে, ঠিক সেই মুহূর্তে সুপর্ণার একটা তীক্ষ্ণ চিৎকারে শঙ্খ ছুটে চলে আসেন তার পাশে। চোখে পড়ে এক বীভৎস দৃশ্য। জোয়ারের জল সরে গেছে। পঙ্কতটে পড়ে আছে একটি শিশুর ছিন্ন মুণ্ড। সুপর্ণার দেহখানি নৌকা থেকে জলে পড়ে যাওয়ার আগেই শঙ্খ দত্ত তাকে জড়িয়ে ধরে। চার বছর পরে সুপর্ণার কণ্ঠে এই প্রথম স্বর জাগল।

॥ ২১ ॥

পশ্চিম সাগরের কূলে কূলে ইতিহাসের তরঙ্গ যখন আছড়ে পড়ছিল, ঝড়ে যখন বিপদের সঙ্কেত, তখনও গৌড় বঙ্গ নিশ্চিন্ত নিদ্রায় কাল কাটাচ্ছে; সপ্তগ্রাম তখনও আম-জাম-কাঁঠালের স্নিগ্ধ ছায়ায় স্বপ্ন রচনা করছে। মন্দিরে মন্দিরে কাঁসর-ঘণ্টার ধ্বনি বা "যোগীপাল-ভোগীপাল-মহীপালের গীত" শোনা যায়। কিন্তু ধীরে ধীরে সেই ঝড় এগিয়ে এল বাংলার দিকে। প্রথমে চট্টগ্রামে সামান্য একটু দোলা লাগল। ক্রমশঃ গৌড় থেকে সপ্তগ্রাম পর্যন্ত, বাঙলার বুকের ভেতর সে ঝড় আছড়ে পড়ল। সপ্তগ্রামে এসে ঘাঁটি গাড়লেন দিয়োগো রেবেলো। সাধারণ মানুষ তখনও বুঝতে পারল না যে, তারা যুগান্তরের এক সন্ধিলগ্নে এসে দাঁড়িয়েছে। শুধু বাঙলাই বা কেন, এমন কি শুধু ভারতবর্ষ নয়, সমস্ত পূর্ব পৃথিবীর বাণিজ্যে পাশ্চাত্ত্য শক্তির মৃত্যু-কীট প্রবেশ করল। দুটো আরব জাহাজ সপ্তগ্রামের বন্দরে প্রবেশ করতে যাচ্ছিল, রেবেলোর কামান দেখেই তারা পালিয়ে বাঁচল। ক্রীশ্চান পতাকার গৌরব বাতাসে ঘোষিত হ'ল। এমন সময় সংবাদ এলো রেবেলোর কাছে যে, গৌড়ের সুলতান মামুদ শা তাঁকে সসম্মানে আহ্বান জানিয়েছেন।

• • • •

মেজেস উদগ্রীব হয়ে অপেক্ষা করছিলেন জর্জ আলকোকোরাদোর জন্য। তাঁকে গৌড়ে পাঠিয়েছেন অনেকদিন হ'ল। বন্দী হয়েছেন কিনা তিনি, সে খবর পাচ্ছেন না। অধৈর্য হয়ে কিছু একটা করবার জন্য যখন তিনি প্রস্তুত হচ্ছেন, এমন সময় জর্জ আলকোকোরাদো বন্দী অবস্থা থেকে কোনক্রমে পালিয়ে এলেন তাঁর কাছে। মেজেসের ক্রোধের আগুনে ঘৃতাহুতি পড়ল। সুলতান মামুদ শাকে আর রক্ষা করা যায় না।

চট্টগ্রাম বন্দর থেকে যোজন দূরে সোমদেব আশ্রয় নিয়েছিলেন। বিগত বছর দুই ধরে তিনি চারিদিকে পাগলের মতো ছুটে বেড়িয়েছেন, লোককে বোঝাবার চেষ্টা করেছেন, বিধর্মীর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে আহ্বান জানিয়েছেন, কিন্তু কারুর কাছ থেকে এতটুকু সাড়া মেলে নি। তারা অবাক বিস্ময়ে শুনেছে বিদ্রোহের কথা; কিন্তু ভেবে পায় নি, কিসের বিদ্রোহ, কার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, কেন বিদ্রোহ! মুসলমান আর হিন্দু—তফাৎ কী?

তারা তো কেউ শত্রু নয়,—প্রতিবেশী ভাই, বন্ধু। শেষে জনতার মধ্যে সোমদেবের বিরুদ্ধে একটা বিপরীত প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়; তাঁকে তান্ত্রিক, পিশাচ মনে করে মারমুখী হয়ে ওঠে। জনতার লাঠির ঘায়ে হয়তো গুঁড়িয়ে যেতেন তিনি, এক বৃদ্ধ তাঁকে বাঁচান শেষ অবধি।

এইভাবে কখনও কোন বৌদ্ধগ্রাম দেখে সোমদেবের মাথায় রক্ত ওঠে। কোন গ্রামে বৈষ্ণবদের খোল-করতাল বাজিয়ে কীর্তন শুনে তাঁকে বাধ্য হয়ে কান চেপে পালিয়ে যেতে হয়। গ্রাম্য মানুষগুলোকে ক্ষমা করতে পারলেও নাগরিক বা শহুরে ভূস্বামীদের তিনি ক্ষমা করতে পারেন না। ভূস্বামীদের মধ্যেও তান্ত্রিক যাঁরা তাঁরা বেশীরভাগই বীরাচারী—সুরা আর নারীচর্চাই সার বলে জেনেছেন এবং তিল তিল করে নিজেদের ধ্বংস করে চলেছেন। এই অবস্থায় সোমদেব কাদের নিয়ে যুদ্ধ করবেন? কে তাঁর সহায় হবে! ব্রাহ্মণ? সেই ব্রাহ্মণ আজ মরেছে। অগ্নিহোত্রী ব্রাহ্মণ আজ কামাচারী।

চমক ভাঙে সোমদেবের, প্রচণ্ড কামান গর্জনে। ভোরের আলো ছড়িয়ে পড়ার আগেই চট্টগ্রাম বন্দরে আগুনের রক্তরাগ দেখলেন তিনি।

*   *   *   *

মেঞ্জেসের ক্রোধ আর হিংসার আগুন চট্টগ্রাম বন্দরকে বিধ্বস্ত করতে জ্বলে উঠেছে। ধ্বংস হ'ল বাড়ীঘর, ধ্বংস হ'ল মন্দির-মসজিদ; চারিদিকে আগুনের লেলিহান শিখা। নবাবের কামান কয়েকবার প্রত্যুত্তর দিয়েই থেমে গেছে। অগ্নিগোলা বর্ষণে নবাবের সৈন্য ছত্রখান। মেঞ্জেসের আদেশে তিনশ' পর্তুগীজ সৈন্য উন্মুক্ত তলোয়ার হাতে ঝাঁপিয়ে পড়ল বন্দরের বুকের ওপর। নারী-শিশু-বৃদ্ধ কেউ তলোয়ারের মুখে বাদ পড়ল না।

এই সময় এসে পৌঁছালেন সোমদেব সেখানে—সঙ্গীহীন, সহায়হীন, সম্বলহীন কিন্তু তাতে কী! একাই ঝাঁপিয়ে পড়লেন। অভিজ্ঞ ও নিপুণ আলকোকোরাদো সোমদেবের তরবারির আঘাত বাঁচিয়ে সজোরে নিজের তরবারি সোমদেবের নাভিমূলে ঢুকিয়ে দিলেন। শেষ পর্যন্ত নিজেকেই বলি দিলেন সোমদেব মহাকালের কাছে।

॥ ২২ ॥

রাত দুই প্রহর। সুরা ও নর্তকীর কামজ নেশায় নিজেকে ডুবিয়ে রেখেছেন মামুদ। তাঁর ভেতরে যে যন্ত্রণা দিবারাত্র কুরে কুরে খাচ্ছে, বিপদের বেড়াজাল থেকে মুক্তির কোন আলো তিনি দেখতে পাচ্ছেন না, তারই জন্য নিজেকে সর্বদা নারী ও সুরার কোলে সমর্পণ করে ভুলে থাকতে চান। কিন্তু তা হ'ল না। রাত দুই প্রহরে সহসা উজীর সাহেব এসে হাজির। তিনি সংবাদ দিলেন ক্রীশ্চানেরা চট্টগ্রাম বন্দরে আগুন লাগিয়েছে—যুদ্ধ চলছে—নবাবের বহু সৈন্য ধূলিশায়ী। সপ্তগ্রামের মুখ বন্ধ করে আছেন ক্রীশ্চান রেবেলো—কোন জাহাজ ঢুকতে পারছে না, বেরুতে পারছে না।

অতঃপর তাঁরা গৌড়ও আক্রমণ করতে পারেন। সুলতান ক্রোধে-উত্তেজনায় প্রথমে বন্দী পর্তুগীজদের শিরশ্ছেদনের কথা বললেন। কিন্তু উজীর তাঁকে বিরত করতে চাইলেন। এমন সময়, আলফাহাসানী এসে দুঃসংবাদ দিলেন। সুরজগড়ের যুদ্ধে বাঙলার সৈন্যরা বিধ্বস্ত হয়ে গেছে। সেনাপতি ইব্রাহিম খাঁ আর জামাল খাঁ সম্পূর্ণরূপে পরাজিত ও নিহত হয়েছেন। শের খাঁ দুরন্তবেগে গৌড় আক্রমণের জন্য এগিয়ে আসছেন।

সুলতানের ইচ্ছা না থাকলেও শেষ পর্যন্ত উজীর ও আলফাহাসানীর পরামর্শে তিনি ক্রীশ্চানদের সঙ্গে সন্ধি করতে রাজি হলেন। অতএব ডি মেলোকে মুক্তি দেওয়ার আদেশ দিতে হ'ল তাঁকে, এবং তাদের সাহায্য ভিক্ষা করতে হ'ল শেরের বিরুদ্ধে আসন্ন যুদ্ধে।

* * * *

গৌড়ের সুলতানের দরবারে পর্তুগীজরা আবার এসে সার দিয়ে দাঁড়ালেন—ডি মেলো, আজেভেদা, রেবেলো, স্পিণ্ডোলা, ডায়াস। উজীর, সুলতানের হয়ে দুঃখ প্রকাশ করে জানালেন, বঙ্গের সুলতান গোয়ার মহামান্য ডি-কুনহার সঙ্গে সন্ধি ও শান্তি কামনা করছেন। বাণিজ্যের সনদ তিনি পর্তুগীজদের দেবেন, এবং চট্টগ্রাম ও সপ্তগ্রামে ক্রীশ্চানদের কুঠি নির্মাণেরও অনুমতি দেবেন। এতদিনে ভাস্কো-ডা-গামার স্বপ্ন সফল হ'ল। পর্তুগীজদের দীর্ঘকালের দুঃখ-কষ্ট-যন্ত্রণার রাত্রি অবসান হ'ল, সোনার বাঙলার বুকে তাদের বাণিজ্যলক্ষ্মীর ঘটস্থাপনা করে। শর্তের কথাটিও উজীর বললেন। এর বিনিময়ে পর্তুগীজরা শের খাঁ-র বঙ্গ আক্রমণে সুলতানকে সক্রিয় সহযোগিতা করুন।

ডি মেলো রাজি হলেন সেই শর্তে এবং সনদে সই করলেন। সেই স্বাক্ষরের সঙ্গে সঙ্গেই মহাকালের পাণ্ডুলিপিতে একটি নতুন অধ্যায়ের সূচনা হ'ল। পাশ্চাত্য বাণিজ্যলক্ষ্মীকে সিংহাসন ছেড়ে দিয়ে প্রাচ্যের বাণিজ্যলক্ষ্মী ভাগীরথীর জলে হারিয়ে গেলেন।

* * * *

এরপর ইতিহাস। কেমন আশ্চর্য কৌশলে, তৎপরতায় এবং দক্ষতায় শের খাঁ গৌড়ের দিকে এগিয়ে এলেন; এবং তেলিয়াগড়ীর যুদ্ধে পর্তুগীজদের সহায়তায় সুলতানের দুর্ভেদ্য প্রতিরোধ ব্যবস্থা থাকলেও মামুদ শা তের লক্ষ টাকার সোনা উপঢৌকন দিয়ে শের খাঁর সঙ্গে নতমস্তকে সন্ধি করলেন। ডি মেলো তাঁকে নিষেধ করেছিলেন, কিন্তু কানে নেন নি মামুদ। আমোদ-স্ফূর্তি'তে আর সুরার স্রোতে গা-ভাসালেন তিনি।

কিন্তু ইতিহাসের রথ থেমে থাকে নি। ডি মেলোর ভবিষ্যদ্বাণী মিথ্যা হয় নি। প্রভূত উপঢৌকনের অর্থে তিনি তাঁর আফগান বাহিনীকে আরও পুষ্ট করে পর বৎসরেই বাঙলার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার শক্তি সঞ্চয় করতে লাগলেন।

এদিকে চট্টগ্রামে এবং সপ্তগ্রামে নতুন সূর্যের আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠল পর্তুগীজদের দুটি বাণিজ্য কুঠি।

॥ ২৩ ॥

ইতিহাসের একটা অঙ্ক শেষ হ'ল। সূচনা হ'ল নতুন অধ্যায়ের। সরস্বতীর দুধবরণ জলে ক্রুশচিহ্নিত বিজয় পতাকা উড়িয়ে তিনখানি পর্তুগীজ জাহাজ ভাসছে। সপ্তগ্রামের বুকে সগৌরবে দাঁড়িয়ে আছে।

এদিকে ডি মেলোর ভবিষ্যদ্বাণী সফল হ'ল। শের খাঁ বৎসর ঘুরতে না ঘুরতেই গৌড় আক্রমণ করলেন। হোসেনশাহী বংশের ওপর অভিশাপের ছায়া ঘনিয়ে এল। কুটোর মতো ভেসে গেলেন মামুদ শের খাঁর রণ-ঝড়ে। ডি কুনহার সাহায্য সময় মতো এসে পৌঁছায় নি।

পর্তুগীজদের নব অভ্যুদয়কে বাঙলার- বণিককুল সাধারণভাবেই মেনে নিল। কেউ বলল তাদের কাছে আরব, পর্তুগীজ দু-ই সমান; কেউ কেউ বলল, পর্তুগীজদের সঙ্গে বাণিজ্যেই তাদের বেশী লাভ। কেউ কেউ আবার পর্তুগীজদের মধ্যে অতিরিক্ত লোলুপতা ও উগ্রতার ছবিও দেখতে পান।

রাজশেখরের বজরাখানি পর্তুগীজ জাহাজগুলির পাশ কাটিয়ে সপ্তগ্রামে ফিরল। পাঁচ বছর পরে ফিরলেন শঙ্খ দত্ত নিজ গৃহে—একেবারে নিঃস্ব অবস্থায়।

বৃদ্ধ ধনদত্ত সুপর্ণাকে গৃহলক্ষ্মী করে তুলে নিলেন। শঙ্খ সুপর্ণার ভাবলেশহীন মনটিকে নিজের দিকে ফেরাবার সাধনায় নিয়োজিত। কিন্তু প্রাণ প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছেন বলে মনে হয় না। প্রেমের উষ্ণতা, প্রাণস্পন্দনে খুঁজে পান না তিনি সুপর্ণার মধ্যে। প্রশ্ন জাগে, সুপর্ণার মন থেকে গঞ্জালোর স্মৃতি কি মুছে যাবে কোনদিন? একই প্রশ্ন তাঁর নিজের সম্পর্কে, শম্পাকে কী তিনি ভুলতে পারবেন কোনদিন?

খোল-করতাল কীর্তনের সুরে চমক ভাঙে শঙ্খের। তাঁর গৃহেও এখন শ্রীচৈতন্য প্রবর্তিত প্রেমধর্ম নিজ সিংহাসন পেতে নিয়েছে। শঙ্খ গুরু সোমদেবকে বিস্মৃত হতে পারেন না সহজে। কিন্তু যুগের হাওয়ায় যুগধর্মের চরণেই শেষ পর্যন্ত মাথা নত করেন তিনি। যে বণিককুল এতদিন ছাগ-মেষ-মহিষ বলি দিয়ে এসেছেন, আজ তাঁদের অনেকেই উদ্ধারণ দত্তের মতো চৈতন্যের প্রেম ধর্মের স্পর্শে নতুন করে নিজেদের গড়ে তুলতে আরম্ভ করেছেন। শঙ্খও দূরে দাঁড়িয়ে থাকতে পারলেন না। যুগের ভাবজোয়ারে নিজেকে ভাসিয়ে দিলেন। শ্রীচৈতন্যেরই জয় হ'ল।

আরও ছ'মাস অতিবাহিত হয়ে যায়। ইতিহাসের অমোঘ গতিপথে বাঙলার ভাগ্য নির্ধারিত হয়, যার প্রভাব অলক্ষ্যে সমগ্র ভারতের ভাগ্যকেও জড়িয়ে ফেলে, ভবিষ্যতের গর্ভে যার ফল নিহিত। হুমায়ুন, শের শা, মামুদ শা, সামপায়ো—শক্তি আর কুটনীতির পাশাখেলা। প্রাণ দিয়ে মামুদ শা তাঁর অভিশপ্ত জীবন শেষ করেছেন। শেরের উদ্যত থাবা দিল্লীর দিকেও—হুমায়ুন তাই ত্রস্ত। আর, এরই সুযোগে পশ্চিমী শক্তি একটু একটু করে তার বাণিজ্যের ভিৎ পাকা করে নিচ্ছে। ভাস্কো-ডা-গামা, আলবুকার্ক, নুনো-ডি-কুন্হা আর ডি মেলোর আশা স্বপ্ন-সাধনা বাস্তবে রূপ নিয়েছে।

শঙ্খ দত্তের জন্য অপেক্ষা করছিল শুধু একটুখানি বিস্ময়। সুপর্ণার সঙ্গে তার বিয়ে হয়ে গেছে। কিন্তু সুপর্ণার অন্তর প্রেমের জাদুস্পর্শে এখনও সুর হয়ে ওঠে নি, প্রাণ ছন্দ হয়ে ওঠে নি। হয়তো সেই কিশোরের নীল চোখ ও সোনালি চুল এখনও তার মনের ওপর ছায়া ফেলে। সে নিজেও শম্পার ছায়া নিয়ে ক্লান্ত। যতদিন না দূর সমুদ্রের নেশা-ধরা আহ্বান তার রক্তে এসে পৌঁছায় ততদিন হয়তো তাকে এই ভাবেই এক অপ্রেম জীবনের ছক রচনা করে চলতে হবে

তবু সুপর্ণাকে পরিপূর্ণভাবে জাগাবার চেষ্টা করে শঙ্খ। নিশ্চিত কিছু একটা করার জন্য তিনি ছটফট করেন। ভাবহীন ভাবনার মধ্যে ভেসে বেড়াতে থাকেন। এমন সময় এক প্রত্যুষে সুপর্ণা লজ্জারাঙা মুখে কুণ্ঠার সঙ্গে তাঁকে ফিসফিস করে জানায় "আমাদের খোকা আসবে।"

শঙ্খের শিরায় শিরায় রক্তের জোয়ারের কলগান শোনা গেল। সুপর্ণা বলেছে "আমাদের। তোমার আর আমার।" সুপর্ণার পাষাণ দেহে এতদিনে প্রাণ প্রতিষ্ঠা হ'ল।

সরস্বতী নদীর ধারে ক্রীশ্চানদের বিরাট কুঠি গড়ে উঠেছে। তার সামনেই গীর্জা। —ধর্ম ও ব্যবসা। কুঠির ঘাটে একখানি পর্তুগীজ জাহাজ—সেই জাহাজ থেকে নামছে একদল ক্রীশ্চান সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনী। এঁদের মধ্যে শঙ্খ সহসা আবিষ্কার করেন শম্পাকে দেবতার ধন দেবতাই ফিরিয়ে নিয়েছেন। এক দেবতার মন্দিরে যিনি একদিন দেবদাসী ছিলেন, আর এক দেবতার মন্দিরে (গীর্জায়) তিনি তাঁর সেবিকা—সন্ন্যাসিনী।

পর্তুগীজদের কুঠি থেকে কামান গর্জে উঠল। সেই কামানের ধ্বনি ছড়িয়ে পড়ল পূর্ব থেকে পশ্চিমে, উত্তর থেকে দক্ষিণে। আর একটা ভয়াবহ জাগ্রত স্বপ্নে বুঝি চমকে উঠল বাংলা দেশের তাঁতীরা !

তিন

ঐতিহাসিক তথ্য ও উপাদান

বাণিজ্যিক বিস্তার এবং খ্রীস্টধর্মের প্রচার—প্রধানত এই দুটি উদ্দেশ্য নিয়ে প্রেস্টর জন, পেরেস-দ্য-কোভিলহাও এবং পায়ভা এ্যাফন্‌সো বেরিয়ে পড়েছিলেন অজানা সমুদ্রে, নতুন নতুন পথের সন্ধানে। সময়টা ১৪৮৭ খ্রীস্টাব্দ বা কাছাকাছি কোন সময়। তাঁরা যাত্রা করে নেপল্‌স্‌, রোহডস্‌, আলেক্‌জান্দ্রিয়া এবং কায়রোয় উপনীত হন। কায়রো থেকে একটি মুর দলের সঙ্গে তাঁরা এডেন বন্দরে আসেন। এখানে তাঁরা ভারতের কালিকট বন্দরের ঐশ্বর্যের খ্যাতির সংবাদ পান, এবং জানতে পারেন, কালিকটের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্বন্ধ স্থাপন করতে পারলে প্রভূত লাভজনক ব্যবসায় তাঁরা করতে পারবেন। পায়ভা চলে গেলেন ইথিওপিয়ার দিকে, আর মুর ব্যবসাদারদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করে তাদের জাহাজে কোভিলহাও এলেন কান্নানোরে। সেখান থেকে কালিকট, গোয়া, ওরমুজ, সোফালা পর্যন্ত ঘুরতে ঘুরতে এলেন। কালিকটে তিনি দেখে গেলেন আদা, লঙ্কা, লবঙ্গ এবং দারুচিনির অঢেল ব্যবসা-পত্র। তিনি পর্তুগীজ সম্রাটকে ভারতে আগমনের পথের নির্দেশ ও ব্যবসা-বাণিজ্যের সম্ভাবনার কথা জানান। কোভিলহাও-এর অভিযান এই পর্যন্ত। এর পর আর একবার তিনি বারথলোমিউ দিয়াজের নেতৃত্বাধীনে ভারতের উদ্দেশ্যে অভিযানে এসেছিলেন বলে জানা যায়। সেবার সান্তাক্রুজ বন্দর থেকে তাঁরা ফিরে যান।

অতঃপর রাজা মনোএল-এর রাজত্বকাল। সম্ভবতঃ ১৪৯৫ খ্রীস্টাব্দে তিনি পর্তুগালের সিংহাসনে বসেন। তাঁরই সময়ে ১৪৯৭ খ্রীস্টাব্দে ভাস্কো-ডা-গামা চারটি জাহাজ নিয়ে ভারতে আগমনের সমুদ্রপথ আবিষ্কারের অভিযানে বেরিয়ে পড়েন। উত্তমাশা অন্তরীপ (Cape of Good Hope) ঘুরে ভাস্কো-ডা-গামা মোম্বাসা, মোজাম্বিক এবং মেলিন্দে উপনীত হন। বেশ কিছুসংখ্যক পর্তুগীজের সাক্ষাৎ এখানে তিনি পান। অতঃপর ১৪৯৮ খ্রীস্টাব্দে আগস্ট মাসে ভাস্কো-ডা-গামা কালিকটে পৌঁছান। জনৈক মুর ভাস্কোর কোনো সহচরকে নাকি বলেছিলেন: "A lucky venture, a lucky venture! Plenty of rubies, plenty of emaralds! You should thank God for having brought you to so rich a country." (Vasco-Da-Gama and his Successors—K. G. Jayne; Ch. VIII

p. 53) অর্থাৎ মুরের কথা থেকে কালিকটের ঐশ্বর্যের আভাস পাওয়া গেল। জেনোয়াবাসী নিকোলাস ডি ক্যানেরিও কালিকটের ঐশ্বর্য-সমৃদ্ধির বর্ণনা দিয়েছেন। (সম্ভবতঃ ১৫০১-০২ খ্রীস্টাব্দে) "This is Caliqut……It is a most noble city discovered by the most renowned prince D. Monoel, King of Portugal. Here are much benjamin of fine quality, and pepper and numerous other commodities from many regions, with cinnemon, ginger, cloves, incense, sandal-wood and all sorts of spices ; stones of great value, and seed pearls."

ভাস্কো-ডা-গামার কালিকটে আসার এবং কালিকটের সভার যে চিত্র ঐতিহাসিকগণ দিয়েছেন, তার নির্যাস হ'ল : কালিকটের শাসনকর্তাকে পর্তুগীজগণ 'Camorij', যার ইংরাজী উচ্চারণ হ'ল 'Samuri' বা Zamorin'—নামে অভিহিত করেছেন। তিনি হিন্দু। শহরের বাইরে মর্মর প্রাসাদে বেশ জাঁকজমকের সঙ্গে তিনি বসবাস করেন। ছোটখাট ব্যবসায়ীরা তালপাতায় ছাওয়া কাঠের বাড়ীতে বাস করতেন। কিছু কিছু প্রস্তর-নির্মিত প্রাসাদও ছিল। দুটি মসজিদও ছিল মোপলা বণিকদের। এখানকার সামুদ্রিক বাণিজ্য জামোরিনের সদয় সম্মতিতে এই মোপ্লা বণিকদেরই নিয়ন্ত্রণে ছিল।

যা হোক, ভাস্কো-ডা-গামা নগরপাল বা কোন প্রভাবশালী ব্যক্তির সহায়তায় অনুচরবর্গসহ জামোরিনের রাজসভায় আসেন। কিন্তু প্রবেশ দ্বারেই প্রচণ্ড ভিড়ের জন্যই সম্ভবতঃ ছোটখাট একটি সংঘর্ষ হয়ে যায়। কে. জি. জয়নে বলেছেন : "After a scuffle at the palace gates, in which knives were unsheathed and several men injured……"

সবুজ ভেলভেটের গদীর ওপর বসেছিলেন জামোরিন। তাঁর মাথার ওপর অলংকৃত চন্দ্রাতপ, বাঁ হাতে বিশাল এক সোনার পিক্দান (spittoon)। সোনার পানপাত্র থেকে জনৈক ভৃত্য তাঁকে পান দিচ্ছে। ভাস্কো তার সামনে নজরানা-স্বরূপ মেলে ধরলেন প্রবালের ছড়া, তেলের শিশি (casks of oil), মুখহাত ধোয়ার পাত্র—এই জাতীয় সামান্য কিছু সামগ্রী। ভাস্কো রাজাকে সম্ভাষণ জানালেন, এবং মানোএলের পত্রও দিলেন। আরব দোভাষী তা পাঠ করে শুনিয়ে দিলেন। ভাস্কো জামোরিনের অভ্যর্থনা এবং ব্যবসায়ের অনুমতিও পেলেন।

কিন্তু আরবের মুসলমান বণিকদের মনে এই পর্তুগীজদের প্রতি ছিল নিদারুণ ঘৃণা, তাঁদের হাতে পর্তুগীজ বণিকেরা প্রায়ই লাঞ্ছিত, নিগৃহীত হতেন। পর্তুগীজদের ব্যবসায়ে নানাপ্রকারের প্রতিবন্ধকতাও তাঁরা সৃষ্টি করতেন। রাজার সশস্ত্র প্রহরী তাই এই বিদেশীয়গণের ওপর দৃষ্টি রাখত : "…they were watched at night by armed guards—a precaution almost certainly intended to secure them from molestation by the Muhammadan traders, who spat ostentatiously whenever they met a Portuguese."

এদিকে শুল্ক বাকি পড়ার অজুহাতে নগরপাল পণ্যসামগ্রী সমেত কিছুসংখ্যক পর্তুগীজকে বন্দী করলেন ; এবং রাজাকে জানালেন যে, শুল্ক বাবদ তাদের কাছ থেকে পাওনা 600 xerafins অর্থাৎ ২২০ পাউণ্ড। ভাস্কো প্রতিশোধ নিলেন ১৮ জন হিন্দুকে তাঁর জাহাজে বন্দী করে নিয়ে গিয়ে। পরে একটা মীমাংসা হলে, বন্দী বিনিময় ক'রে ভাস্কো ফিরে যান। পাঁচজন হিন্দু বন্দীকে তিনি নাকি মুক্তি দেন নি।

পেড্রো আলভারেস কাব্রালের নেতৃত্বাধীনে ১৫০০ খ্রীস্টাব্দে আর একদল পর্তুগীজ ভারতে আসেন। তখন মনোএলের নীতি ছিল: "Friendship with the 'Christians', war with the 'Moors' ; these were to be the watch-words of Portuguese policy in the East." কাব্রাল এসেছিলেন শিক্ষিত গোলন্দাজ বাহিনী, পাদ্রী ও বণিকের একটি দল নিয়ে। পণ্য কেনা-বেচা হবে রাজা মনোএলের নামেই—এরূপ আদেশ ছিল দলের প্রতি। এবং ইত্যবসরেই পর্তুগাল সম্রাট তাঁর উপাধি ঘোষণা করেছেন: King, by the Grace of God, of Portugal and of the Algarves, both on this side the sea and beyond it in Africa, Lord of Guinea and of the conquest, Navigation, and Commerce of Ethiopia, Arabia, Persia and India," তাই কাব্রালকে তিনি পাঠিয়েছিলেন ভ্রমণকারী হিসেবে নয়, বিজেতা হিসেবে: "Cabral himself went forth not as an explorer but as a conqueror……"

কাব্রাল কালিকটে জামোরিনের অনুমতি পেলেন বাণিজ্যকুঠি নির্মাণের। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই মুসলমান বণিকদের এবং জনতার যৌথ আক্রমণে পর্তুগীজদের সে বাণিজ্যকুঠি ধূলিসাৎ হ'ল। কাব্রাল প্রতিশোধ নিতে ছাড়লেন না। তাঁর কামানের গোলায় কাঠের বাড়ীগুলি আগুনে পুড়ে গেল। কাব্রাল পালিয়ে গেলেন কোচিনের মালাবার বন্দরে। সেখানে হিন্দু রাজা তাঁকে দ্বিতীয় বাণিজ্যকুঠি স্থাপনের অনুমতি দিলেন। ১৫০১ খ্রীস্টাব্দে কাব্রাল ফিরে গেলেন পর্তুগালে। এবং ১৫০২ খ্রীস্টাব্দে ভাস্কো-ডা-গামা দ্বিতীয়বার ভারতে পদার্পণ করলেন। সেবারের একটি রোমহর্ষক ঘটনার এরূপ বর্ণনা দিয়েছেন ঐতিহাসিক জয়নে: "Near the Malabar Coast, the fleet overhauled a large dhow named the 'Meri' which was bringing a crowd of Muhammedan pilgrims home from Mecca. Lopes declares that the wealth on board would have sufficed to ransom every Christian slave in "the kingdom of Fez.", and even then to leave a handsome balance. But the owners refused to yield up more than a tithe of their riches, and so incurred the wrath of D. Vasco. In a vivid and moving passage, Lopes describes how the Portuguese fired the 'Meri' and then stood by to watch her burn, heedless of the woman thronged the blazing

decks, holding up their babies in a vain appeal for pity."

এ সংবাদ জামোরিনের কাছেও পৌঁছেছিল। ভাস্কো যখন কালিকটে জাহাজ নোঙর করলেন, তখন জামোরিন তাঁর সংগে সন্ধি করার প্রস্তাব পাঠালেন (৩০শে অক্টোবর, ১৫০২ খ্রীঃ)। কিন্তু ভাস্কো সে প্রস্তাব ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করে জানালেন, তাঁর রাজা মনোএল তালগাছ দিয়ে জামোরিনের মতো রাজার রাজত্ব চালাতে পারেন। ভাস্কো দাবী করলেন কালিকট থেকে প্রতিটি মুসলমানকে দূর করে দিতে হবে। এবং তাঁর এই উদ্ধত আদেশকে ভীতিপ্রদ করে তুলতে বন্দরস্থ যে জাহাজ ও নৌকা পেলেন সেগুলি বিনষ্ট করলেন এবং যেসব বণিক ও জেলেদের পেলেন তাদের সকলকে ফাঁসিতে ঝোলালেন। তারপর—"The heads, hands, and feet of these unfo rtunates were then cut off and flung into a boat, which allowed to drift ashore, bearing an appropriate message written in Arabic. Correa says that the missive recommended the Samuri to make curry of the severed members." বোমা-গোলাবারুদে বিধ্বস্ত হ'ল কালিকট। শহরটায় রক্তের স্রোত আর ভস্মের স্তূপ রেখে বিদায় নিলেন ডি· ভাস্কো।

ধীরে ধীরে ভারতের দক্ষিণে ও পশ্চিমে পর্তুগীজরা রাজ্য স্থাপন করেছে। দুর্গ ও কুঠি নির্মাণ করেছে। ডি· আলমিডা ভারতের প্রথম পর্তুগীজ গভর্নর ১৫০৫ খ্রীস্টাব্দে লিসবোঁয়া থেকে ভারতে এসেছেন। তিনি যুদ্ধের পথ ত্যাগ করে শান্তির পথে প্রতিষ্ঠিত রাজ্যের বিস্তার চেয়েছেন। তাঁর পরে গভর্নর হয়ে ভারতে এসেছেন আলবুকার্ক।

১৫১৫ খ্রীস্টাব্দে আলবুকার্ক সম্ভবতঃ প্রথম ইউরোপীয় যিনি প্রাচ্যে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করার ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন তিনটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ জায়গা অধিকার করে: (১) মালাক্কা—ভারত ও চীনে বাণিজ্য করার প্রধান ঘাঁটি; (২) ওরমুজ—প্রাচ্যের বাণিজ্যতরী পারস্য হয়ে ইউরোপে যাতায়াত করার কেন্দ্র; এবং (৩) মালাবার উপকূলে গোয়া—এখানে আরব, মেলিন্দ, সোফালা, কাম্বে, বাঙলা, পেগু এবং শ্যাম, জাভা, মালাক্কা, পারস্য চীন, এমন কি আমেরিকার ব্যবসায়ীরা পর্যন্ত বাণিজ্যের জন্য সমবেত হয়; এবং এখানেই পরবর্তীকালে পর্তুগীজগণ তাঁদের শহর ও শক্ত ঘাঁটি নির্মাণ করেন। এভাবে ক্রমে ক্রমে পর্তুগীজগণ প্রাচ্যে জিব্রালটার থেকে আবিসিনিয়া, ওরমুজ থেকে মালাবার—তাদের বাণিজ্যিক প্রভুত্ব স্থাপন করে ফেলে।

১৫১০ খ্রীস্টাব্দে গোয়া পর্তুগীজ অধিকারে আসে। ১৫১৭ খ্রীস্টাব্দে চীনের ক্যান্টনে এবং শাং চোয়ান ও লিম্পপোতে পর্তুগীজরা পাকাপাকি বসবাস শুরু করে। ঐ বৎসর থেকেই তারা বাঙলার সঙ্গে বাণিজ্যিক যোগাযোগের চেষ্টা করে। ১৫১৮ খ্রীস্টাব্দে শ্রীলঙ্কায় দুর্গ নির্মাণ করে এবং এতদঞ্চলের দেশগুলির সঙ্গে একটি শান্তি চুক্তি সম্পাদিত হয়।

তৃতীয় ডোম জোয়াও-এর রাজত্বকাল (১৫২১-৫৭ খ্রীস্টাব্দে) থেকে প্রাচ্যে

পর্তুগীজদের শহর প্রতিষ্ঠা ও বসবাস চেষ্টা জোরদার করা হয়। করমণ্ডল উপকূলে ময়লাপুরে সেন্ট থোমে, নেগাপত্তম এবং জাফ্‌লাপত্তম—শহরগুলির প্রতিষ্ঠা হয়। পর্তুগীজগণ ক্রমশঃ উত্তর উপকূলের অঞ্চলগুলিতে, সিংহলে এবং অন্যত্র প্রভুত্ব বিস্তার করতে থাকে।

মাত্র পঞ্চাশ বছরের মধ্যেই প্রাচ্যের বাণিজ্যলক্ষ্মী ক্ষুদ্র পর্তুগীজ জাতিকে প্রভূত অর্থ এবং অকল্পনীয় ক্ষমতার শিখরে তুলে দিয়েছিল। এবং প্রায় দুই শতাব্দী জুড়ে এই খ্যাতি ও প্রতিপত্তি তাদের ছিল। অবশ্য বাণিজ্য সঞ্জাত অপরিমেয় অর্থ এবং ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি লাভ করতে তাদের অনেক রক্ত ঝরাতে হয়েছে, লাঞ্ছনা-অত্যাচার সহ্য করতে হয়েছে, প্রাণ দিতে হয়েছে, ক্ষয়ক্ষতিও বড় কম স্বীকার করতে হয় নি। তারা এখানে একটা দুর্গ নির্মাণ করেছে, কী ওখানে দুটো কুঠি নির্মাণ করেছে বললে কিছুই বলা হল না। ঠিক এই কথাটাই ঐতিহাসিক ক্যাম্পোস বলেছেন: "To say that a fort was built in Ormuz or that Malacca and Goa were captured is easy cnough. It is difficult, however, to realize what sacrifices it entailed." এ কথাও মনে রাখা প্রয়োজন, ইংরেজ ও ডাচ্‌গণ যে-প্রাচ্যে বাণিজ্য বিস্তার করেছিলেন; সে-প্রাচ্য অনেকখানিই পরিবর্তিত এবং সহজতর হয়ে গিয়েছিল; পর্তুগীজরা অনেক রক্ত দান করে, অনেক ক্ষয়ক্ষতির মধ্য দিয়ে সেই পথ তৈরি করেছিল। তারা যখন ভারতে প্রথম পদার্পণ করে তখন ভারতের বাণিজ্যে ছিল মুর ও মোপ্‌লা বণিকদের একাধিপত্য।

ভারতের দক্ষিণ ও পশ্চিমে প্রভুত্ব স্থাপনের পর পর্তুগীজগণ বাঙলার দিকে মন দেয়। ভারতে ও ভারতের বাইরে ব্যবসা-বাণিজ্য করতে গিয়ে ইত্যবসরেই তারা 'বেঙ্গালা'র বাণিজ্যখ্যাতির কথা শুনেছিল। 'বেঙ্গালা' সোনার দেশ, ভারতের প্যারাডাইস। এখানকার ঐশ্বর্য ও সমৃদ্ধি স্বপ্নেই বুঝি সম্ভব। বাঙলার উদ্দেশ্যে একের পর এক যখন পর্তুগীজ অভিযানগুলি পরিচালিত হচ্ছিল, তখন বাঙলায় স্বাধীন লোদী বংশীয় রাজাগণ রাজত্ব করছিলেন। ১৩৩৮ খ্রীস্টাব্দে বক্তিয়ার খিলজীর উত্তরাধিকারীদের ক্ষমতা অস্বীকার করে এই লোদী রাজাগণ স্বাধীনভাবে শাসনক্ষমতা গ্রহণ করেন। এঁদের মধ্যে সৈয়দ হুসেন শাহ ছিলেন বাঙলার সবচেয়ে শক্তিশালী স্বাধীন সুলতান। গৌড় ছিল তাঁর রাজধানী। মোঘল আমলে হিন্দুস্থানের রাজধানী যেমন ছিল দিল্লী—ঐশ্বর্যে, জাঁকজমকে, ভোগ-বিলাসিতায়, সমৃদ্ধিতে বাঙলার রাজধানী গৌড়ের খ্যাতি ও প্রতিপত্তি ছিল তদ্রূপ। ব্যবসা-বাণিজ্যে, জাঁকজমকে, ঐশ্বর্যে গৌড়বঙ্গের তখন রমরমা। ১৫৩৮ খ্রীস্টাব্দে শেরখাঁ যতদিন না বাঙলা অধিকার করে নেন, ততদিন গৌড় ছিল স্বাধীন সুলতান-শাসিত। বাঙলায় হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও সংখ্যা-লঘিষ্ঠ মুসলমানগণ কর্তৃক তারা সুদীর্ঘ ৩০০ বৎসর ধরে শাসিত হয়ে আসছে।* পর্তুগীজগণ বাঙলায় পদস্থাপনা করে শান্তিপ্রিয়,

* ১২০৩ খ্রীস্টাব্দে বাঙলার স্বাধীন রাজা লক্ষ্মণ সেন তুর্কী মুসলমানদের হাতে পরাজিত হন।

সহজ-সরল জীবনযাপনে অভ্যস্ত বাঙালীদের এই প্রকৃতিটি সম্ভবতঃ অনুধাবন করেছিলেন। তার সঙ্গে তাঁরা লক্ষ্য করেছিলেন বিদেশী মুসলমান বণিকদের প্রতি, এবং মুসলমান শাসনের প্রতি সাধারণ বাঙালীর মনের কোণায় রয়েছে চাপা ক্ষোভ। তাদের বীরত্বেরও অভাব নেই। সুযোগ উপস্থিত হলে হয়তো তারা এই মুসলমান বণিকদের ও শাসকদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করতে দ্বিধা করবে না। বাঙালীর সাধারণ মানুষের সম্পর্কে ক্যাম্পোস আরও লিখেছেন, "Peaceful by disposition, docile and easy going, the people of Bengal were submissive to this foreign rule and apparently content with seeing their liberties not trampled upon and virtue of their wives protected from force in their cloistered seclusion. But given the opportunity, the Bengalees were ready to rise against the Muhammedans and join with the new European comers as they did when Sebastiao Gonslves conquered Sandwip and ordered the Hindus to deliver up to him every Moor in the land."

পর্তুগীজ ঐতিহাসিক De Barros বাঙালী জাতি সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন: "...the people natural to the land of Bengal, are mostly Hindu, weak in fighting but the most malicious and treacherous in the whole East ; so that to injure a man anywhere it is enough to say he is a Bengala."—ক্যাম্পোস অবশ্য বলেছেন যে, De Barros ভুল করেছেন, 'Bengala' শব্দটিকে শুধুমাত্র হিন্দু মনে করে। তাঁর মতে বাঙলায় যারা বাস করে তারাই 'Bengalas' ; সেই অর্থে হিন্দু এবং মুসলমান উভয়েই। বিশেষতঃ বাঙলার মুসলমান শাসকগণ, যাঁরা পর্তুগীজদের প্রথম অভিযানগুলি নানারূপ ছলনায়, নিষ্ঠুরতায় ও প্রতারণায় ব্যর্থ করে দিতে চেয়েছেন।

পর্তুগীজগণ যখন বঙ্গে প্রথম পদার্পণ করেন, তখন চট্টগ্রাম ছিল বাঙলার প্রধান বন্দর এবং রাজধানী, গৌড়বঙ্গে প্রবেশের প্রধান পথ। এই বাঙলার ভৌগোলিক অবস্থানও ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মেঘনার মুখেই বন্দরটি। নদীর সহজ নাব্যতা বাণিজ্যের পক্ষে অনুকূল। মেঘনা ছিল গৌড়ে যাবার প্রধান জলপথ; দ্বিতীয় পথ হুগলি দিয়ে। গৌড়ের পতনের পর চট্টগ্রামের সমৃদ্ধি কিছুটা হ্রাস পায়। তখন বাণিজ্য পরিচালিত হয় সাতগাঁও বা সপ্তগ্রামের দিকে। বঙ্গদেশের রাজাদের মধ্যে (আরাকান ও ত্রিপুরা) চট্টগ্রামে প্রভুত্ব স্থাপন নিয়ে প্রায়ই যুদ্ধ-বিরোধ দেখা দিত। সপ্তগ্রাম অতি প্রাচীনকাল থেকেই পশ্চিম বঙ্গের প্রধান বন্দর ও বাণিজ্যকেন্দ্র ছিল। হুগলি নদীর শাখা সরস্বতী নদীর তীরে এই বন্দরটি অবস্থিত। হুমায়ুন, শেরশাহ, শাহজাহান, প্রভৃতি মোঘল সম্রাটগণ ঐশ্বর্যের লোভে বারে বারে বঙ্গে অভিযান করেছেন। বঙ্গদেশ নদীজপমালা শোভিত। এই নদীর জাল জলদস্যু ও পর্তুগীজ

প্রমুখ বিদেশীয়গণের দক্ষিণবঙ্গে যথেচ্ছ প্রবেশের সুগমপথ। বঙ্গদেশ তাদের সহজ হানার শিকার হয়েছে। তারা নির্বিবাদে লুটপাট করেছে এবং নদী ও সমুদ্রপথে অন্তর্ধান করেছে।

চট্টগ্রাম দিয়েই পর্তুগীজগণ একদিন বাঙলায় প্রবেশ করেছিলেন। চট্টগ্রামকে তাঁরা বলতেন 'Porto Grande' বা বড় (প্রধান) বন্দর এবং সপ্তগ্রামকে বলতেন 'Porto Pequeno' বা ছোট বন্দর।

বাঙলার সমৃদ্ধি সম্বন্ধেও পর্তুগীজগণ ছিলেন উচ্চভাষ। ভাস্কো-ডা-গামা ১৪৯৮ খ্রীস্টাব্দে বাঙলার ঐশ্বর্য ও ব্যবসা-বাণিজ্যের জনশ্রুতি থেকে এক উজ্জ্বল চিত্র নিয়ে গিয়েছিলেন। তুলাজাত সুন্দর অথচ সস্তা বস্ত্রাদি, প্রভূত রূপো, ধান-গম প্রভৃতি অর্থকরী খাদ্যফসলের কথা লিখেছিলেন তাঁর বিবরণীতে। আলবুকার্ক, রাজা মনোএলকে মাঝে মাঝেই লিখে জানিয়েছিলেন, এখানে লাভজনক ব্যবসা-বাণিজ্য করার কথা—এদেশের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের কথা। পরে বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপন করে পর্তুগীজগণের ধারণা হয়েছিল "What a mine of wealth they had found." মোঘলগণ বঙ্গকে 'ভারতের ইন্দ্রলোক' মনে করতেন।

বঙ্গে পর্তুগীজ-পদস্থাপনা একদিনে সম্ভব হয় নি। এর পিছনে বহু অভিযান দুঃখ-ব্যর্থতা-বঞ্চনার ইতিহাস রয়ে গেছে। জোয়াও ডি-সিলভিরার আগে কোয়েলহো প্রমুখ দু'একজন পর্তুগীজ বাঙলায় বন্দরে পদার্পণ করেছেন। পর্তুগীজ গভর্নর লোপো সোরেস ডি-অলবেগারিয়া সিংহল জয় করে দুর্গ নির্মাণ করেছেন, রাজাকে করদানে বাধ্য করেছেন, এবং সঙ্গে নিয়ে গেছেন প্রভূত রত্নরাজি ও মূল্যবান দ্রব্যসামগ্রী। কিন্তু বঙ্গে তিনি যে অভিযান প্রেরণ করেছিলেন তা সফল হয় নি। সিলভিরা চট্টগ্রামে পৌঁছে কোয়েলহোর সাক্ষাৎ পান। সিলভিরাকে গুপ্তচর সন্দেহে যখন বন্দী করার চক্রান্ত চলে, তখন হতাশ হয়ে তিনি সিংহলে ফিরে এসে দুর্গের ভার গ্রহণ করেন। সময়টা ১৫১৭-১৮ খ্রীস্টাব্দ বা, তার কাছাকাছি। সিলভিরা অবশ্য একটা কাজ করতে পেরেছিলেন। প্রতিবছর একটি করে পর্তুগীজ বাণিজ্যজাহাজ আসার সম্মতি তিনি নাকি রাজার কাছ থেকে আদায় করেছিলেন। সেই সূত্র ধরেই লোপো ভাজ সম্পায়ো, র‍্যুভাজ পেরিরাকে ১৫২৬ খ্রীস্টাব্দে বাঙলায় প্রেরণ করেন। চট্টগ্রামে এসে পেরিরার চোখে পড়ে শিহাবুদ্দীন নামে জনৈক পারস্য ধনী ব্যবসায়ীর পর্তুগীজ জাহাজের ঢঙের একটি বাণিজ্যভরা জাহাজ। পেরিরা মনে করেন, দুরভিসন্ধি করেই শিহাবুদ্দীন এরূপ জাহাজ নির্মাণ করিয়েছেন ; যাতে এরূপ জাহাজে করে লুটতরাজ করে অপকর্মের দায়ভার অনায়াসেই পর্তুগীজ স্কন্ধে চাপিয়ে দেওয়া যাবে। তাই তিনি কালক্ষেপ না করে বাণিজ্যসম্ভার সহ জাহাজটি বাজেয়াপ্ত করে নেন। দু'বছর পরে এই ঘটনাটির সূত্র ধরেই মার্টিম অ্যাফন্সো, ডি-মেলো বন্দীদশা থেকে মুক্তির আলো দেখেছিলেন।

১৫২৮ খ্রীস্টাব্দে ডি মেলো বঙ্গের উপকূলে আশ্চর্যজনকভাবে উপনীত হয়েছিলেন। কলম্বো থেকে ফিরছিলেন ক্যাপ্টেন ডি মেলো, সঙ্গে আরও দুটি জাহাজ। পথে ভীষণ

ঝড়-ঝঞ্ঝায় তাঁর জাহাজখানি বিচ্ছিন্ন হয়ে নেগামেল দ্বীপের বালির চড়ায় এসে আট্‌কা পড়ে। কয়েকজন জেলে এখান থেকে তাঁকে সঙ্গীসাথীসহ উদ্ধার করে চট্টগ্রামে নিয়ে যাওয়ার নাম করে চাকারিয়ার রাজসভায় নিয়ে আসে। তখন চাকারিয়ার রাজা ছিলেন খুদাবক্স খান। খুদাবক্স বঙ্গের শেষ স্বাধীন সুলতান তৃতীয় মামুদশাহ্‌-এর অনুগত ছিলেন। তখন তাঁর সঙ্গে প্রতিবেশী কোন সামন্তরাজের যুদ্ধ-মারামারি চলছিল। এমতাবস্থায় পর্তুগীজগণ তাঁর সভায় এলে, তিনি মুক্তির আশ্বাসের বিনিময়ে তাদের সাহায্যে যুদ্ধ জয় করেন। কিন্তু পরে মুক্তি দিতে অস্বীকার করেন। "They won for him the victory but far from keeping his promise he (king) imprisoned them in his city of Sore, situated on a river which emptied in the sea eight miles away."

এদিকে ডি মেলোর সঙ্গে আরও যে দুটি জাহাজ ছিল, সে দুটি কিছুকাল পরে চাকারিয়ায় এসে পোঁছায়। একটির নেতা, মেণ্ডিস ভ্যাসকনসেলস, এবং অপরটির নেতা ছিলেন জোয়াও কোয়েলহো। এই ক্যাপ্টেনদ্বয় ডি মেলোর সঙ্গীর সংবাদ পেয়ে রাজসভায় আসেন বন্ধুর মুক্তির চেষ্টায়। তাঁদের জাহাজের বাণিজ্যসম্ভারের বিনিময়ে ডি মেলোর মুক্তি যাচঞা করেন। কিন্তু খুদাবক্সের দাবীর পরিমাণ ছিল আরও অনেক, যা তাঁদের সাধ্যের মধ্যে ছিল না। কাজেই তাঁদের ভিন্ন পথের সন্ধান করতে হয়। ক্যাপ্টেনদ্বয় সেখানকার প্রভাবশালী ব্যক্তির সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে ডি মেলো এবং তাঁর অনুচরদের কারান্তরাল থেকে পালাবার ব্যবস্থা করেন; কিন্তু তাও ব্যর্থ হয়ে যায় এক করুণ ঘটনায়। সেখানকার ব্রাহ্মণের নাকি প্রতিজ্ঞা ছিল, মহামায়া কালিকার চরণে পর্তুগীজ রক্তের অর্ঘ্য দানের। কারাপ্রাচীর লঙ্ঘন করে ডি মেলোর ভ্রাতুষ্পুত্র তরুণ গঞ্জালো, যার সুন্দর নবীন মুখে শ্মশ্রুও দেখা দেয় নি—বেরিয়ে আসে এবং স্থানীয় লোকের হাতে ধরা পড়ে যায়। ব্রাহ্মণেরা তাকে কালিকার বেদীমূলে বলি দেন। নানা গ্রন্থে এ কাহিনীর উল্লেখ আছে। ক্যাম্পোসও ঘটনাটির উল্লেখ করেছেন: "The man sacrificed was the nephew of Affonso de Mello himself, named Goncalo vas de Mello, a young man on whose cheeks as de Barros says, the downy plush of youth had not yet begun to appear."

গোয়ার পর্তুগীজ গভর্নর তখন নুনো-ডি-কুনহা। দমন ও দিউ-এ দুর্গনির্মাণে তিনি ব্যস্ত থাকলেও বাঙলায় বাণিজ্য করার স্বপ্ন দেখছিলেন বহুদিন ধরেই। অনেকগুলি অভিযানও তিনি ইত্যবসরে বাঙলার উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেছিলেন। এমন সময় খাজা শিহাবুদ্দীন এসে তাঁকে জানালেন তাঁর জাহাজ বাজেয়াপ্ত করে নেওয়ার ঘটনা। ডি মেলোর বন্দীদশার কথাও জানালেন তিনি। ডি কুনহাকে শিহাবুদ্দীন আশ্বাস দিলেন, পর্তুগীজরা যদি বাণিজ্যসম্ভারসহ তাঁর জাহাজটি তাঁকে প্রত্যর্পণ করেন, তবে ৩০০০ ক্রুজাডোর বিনিময়ে বন্দী ডি মেলোকে তিনি মুক্ত করবেন।

শিহাবুদ্দীন তাঁর জাহাজখানি ফেরত পেয়েছিলেন এবং নিজ প্রতিশ্রুতিও পালন

করেছিলেন। ডি মেলো মুক্তি পেয়ে গোয়ায় চলে আসেন। শিহাবুদ্দীনও পর্তুগীজদের একজন বড় বন্ধু হয়ে ওঠেন। এটা ১৫২৯ খ্রীস্টাব্দের কথা। ব্যক্তিগত সাহায্যের বিনিময়ে বাঙলায় বাণিজ্যাধিকার ও দুর্গ নির্মাণের অধিকার লাভের ব্যবস্থা করে দেবেন বলেও শিহাবুদ্দীন ডি কুন্‌হাকে আশ্বাস দিয়েছিলেন। এ বিষয়েও শিহাবুদ্দীন তাঁদের সাহায্য করেছিলেন।

অতএব, ডি মেলোকেই আবার নেতৃত্ব দিয়ে পাঠালেন ডি কুন্‌হা বাঙলায় বাণিজ্য করার স্বপ্নকে বাস্তব রূপ দিতে। পাঁচটি জাহাজে দুশো লোক নিয়ে ক্যাপ্টেন ডি মেলো পুনর্বার বাঙলায় এলেন শিহাবুদ্দীনকে সাহায্য করতেও যেমন, তেমনি বাঙলার সঙ্গে বাণিজ্য স্থাপন ও কুঠি নির্মাণের উদ্দেশ্যেও বটে। চট্টগ্রামে এসে ডি মেলো দুয়ার্তে ডি আজেভেদোকে ১২ জন সঙ্গীসহ গৌড়েশ্বরের কাছে দূত হিসেবে প্রেরণ করলেন। সঙ্গে পাঠালেন ১২০০ পাউন্ড মূল্যের নানা ধরনের উপঢৌকন।

গৌড়বঙ্গের রাজা তখন মামুদ শাহ। সেই সময় তাঁর মেজাজ ছিল নানা কারণে ক্ষিপ্ত-বিক্ষিপ্ত। ভ্রাতুষ্পুত্র তৃতীয় ফিরোজ শাহকে হত্যা করে সিংহাসনে আরোহণ করেছিলেন তিনি। কয়েকটি কারণে পর্তুগীজদের উপর তাঁর মনোভাব বিরূপ হয়ে ওঠে। একটি কারণ হ'ল, যে-উপঢৌকন তাঁরা তাঁকে দিয়েছিলেন তার মধ্যে কয়েক বাক্স গোলাপজলও ছিল। এগুলি পর্তুগীজরা কোন মুরের জাহাজ লুট করে সংগ্রহ করেছিলেন "...... he is said to have been prejudiced against the Portuguese because he recognised among the presents some boxes of rose water which a Portuguese corsair named Damiao Bernaldes had seized from a Moorish ship." দস্যুবৃত্তি করে লুটের মাল দিয়ে বঙ্গেশ্বরের উপঢৌকন! ক্ষিপ্ত মামুদ শাহ্ দূত ও তাঁর অনুচরবর্গের সেই মুহূর্তে মস্তক ছিন্ন করার আদেশ দিলেন। অবশ্য এই ভয়ঙ্কর আদেশ কার্যকরী করার আগেই আলফ্‌খান, বা, আলফা হুসানী এবং এক ফকির সাধু মামুদ শাহ্‌কে এরূপ হত্যাকাণ্ড থেকে নিরস্ত করেন। অতঃপর মামুদের আদেশে অনুচরসহ পর্তুগীজ দূত বন্দী হল।

চট্টগ্রামে এক গুয়াজিলকেও রাজার আদেশে প্রেরণ করা হয়। সেখানে ডি মেলো তাঁর সহচরদের সঙ্গে প্রেরিত দূতের আগমন প্রতীক্ষায় ছিলেন। ইতোমধ্যেই, সেখানকার মুর শুল্ক কর্মচারীদের সঙ্গে ডি মেলোর বিরোধ দেখা দেয়। গুয়াজিল এসে সেই বিরোধের সুযোগ নিলেন। তিনি উভয়ের মধ্যস্থতা করার ভান করে এক ভোজ সভার আয়োজন করলেন। সে ভোজ সভায় পর্তুগীজগণ আমন্ত্রিত হলেন। চল্লিশজন সঙ্গী নিয়ে ডি মেলো এলেন নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে।

চারিদিকে উঁচু বারান্দাঘেরা এক বিরাট চত্বরে ভোজের আয়োজন। অল্পক্ষণ পরে সহসা অসুস্থতার ভান করে গুয়াজিল সরে গেলেন। আর তারপরেই বন্দুক ও তীর-ধনুক নিয়ে মুরেরা হতচকিত পর্তুগীজদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। তরবারি হস্তে পর্তুগীজগণ যতক্ষণ পারলেন সংগ্রাম করলেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁরা আত্মসমর্পণে

বাধ্য হন। সে রাত্রে অনেক পর্তুগীজই প্রাণ হারায়। লক্ষাধিক পাউণ্ডের দ্রব্যসামগ্রী বাজেয়াপ্ত হয়। ডি মেলো এবং তাঁর জীবিত সহচরগণ অন্ধকার কারাকক্ষে নিক্ষিপ্ত হলেন। পরে বন্দীদের গৌড়ে চালান করে দেওয়া হয়, যেখানে দুয়ার্তে আজেভেদো বারো জন সঙ্গী সহ বন্দী অবস্থায় ছিলেন।

গোয়ায় ডি কুন্‌হার কাছে এই সংবাদ পৌঁছালে তিনি ক্যাপ্টেন আন্তোনিও-ডা-সিলভা মেঞ্জেস-এর তত্ত্বাবধানে ৩৫০ জন পর্তুগীজের ন'টি জাহাজ বঙ্গের অভিমুখে পাঠালেন। জানিয়ে দিলেন, বঙ্গের রাজা ডি মেলোকে যদি সসম্মানে মুক্তি না দেন, তা হলে বঙ্গে আগুন জ্বলবে, রক্তের বন্যায় বঙ্গ প্লাবিত হবে। চট্টগ্রামে উপনীত হয়েই মেঞ্জেস আলকোকোরাদোকে রাজা মামুদ শাহের কাছে পাঠালেন, ডি কুনহার আদেশ জানিয়ে। মামুদ ডি মেলোকে মুক্তি দিলেন না ; তৎপরিবর্তে মেঞ্জেসের কাছে চিঠি পাঠিয়ে গোয়ার গভর্নরের কাছে কিছু ছুতোর, স্যাঁকরা, এবং অন্যান্য জাতীয় কিছু লোক পাঠাবার অনুরোধ জানালেন। পত্রাদিতে মাসাবধিকাল অতিক্রান্ত হলে মেঞ্জিস চট্টগ্রাম বন্দরে আগুন জ্বালিয়ে দেন। স্থানীয় বেশ কিছু সংখ্যক হিন্দু ও মুসলমানকে বন্দী ও হত্যা করে আলেকোকোরাদো সহ তিনি পালিয়ে যেতে সক্ষম হন।

এদিকে বঙ্গের ভাগ্যাকাশে দুর্যোগের ঘন মেঘ একটু একটু করে জমছিলই। শেরখাঁ-এর আক্রমণ আশঙ্কা অশনি-সঙ্কেতে ক্ষণে ক্ষণে ভীত চকিত করছিল। তাই চট্টগ্রামে এতবড় ঘটনা ঘটলেও ডি মেলো বা তাঁর সঙ্গীদের বধ করা হল না। ক্যাম্পোস লিখেছেন : "One would expect that the days of Martim Affonso de Mello and his men were membered : but new developments were taking place, and Bengal was soon to become a theatre of war owing to the quarrels between Sher Shah and Humayun in which Affonso de Mello was destined to play an important part."

অতএব বঙ্গের ইতিহাসের দিকে দৃষ্টিপাত প্রয়োজন। গৌড়বঙ্গে হুসেন শাহী রাজবংশের সংক্ষিপ্ত ধারাটি হ'ল : আলা-উদ-দীন হুসেন শাহ্‌ ১৪৯৩ খ্রীস্টাব্দ থেকে ১৫১৯ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন ; ১৫১৯ খ্রীস্টাব্দ থেকে ১৫৩২ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত নাসির-উদ-দীন নসরৎ শাহ্‌-এর রাজত্বকাল ; এর পর মাত্র কয়েক মাসের জন্য আলাউদ্দীন ফিরোজ শাহ্‌ (২য়) সিংহাসনে বসেন। গিয়াস-উদ-দীন মামুদ শাহ্‌ ফিরোজের রক্তে হাত রাঙা করে সিংহাসনে আরোহণ করেন ১৫৩৩ খ্রীস্টাব্দে এবং ১৫৩৮ খ্রীস্টাব্দে তাঁর শাসনের অবসান ঘটে।

গিয়াস-উদ-দীন মামুদ শাহ্‌ ছিলেন হুসেন শাহের এক পুত্র। ফিরোজ শাহ্‌কে হত্যা করে তিনি বঙ্গের রাজা হন। তখন হাজিপুরের গভর্নর মকদুম-ই-আলম হত্যাকারী মামুদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন। আফগান সর্দার শের খান তখন বীর বিক্রমে পদচারণা করছিলেন বিহারে। তিনি ছিলেন বিহারের জায়গীরদার। বিহারের রাজা তখন লোহানী বংশীয় জালাল খান। সেই নাবালকের মন্ত্রী ও অভিভাবক হলেন শের খান। ধীরে

ধীরে সর্বময় কর্তৃত্ব তিনি নিজের হাতেই নিয়ে নিলেন। শের খানের এই সহসা অতি দ্রুত উত্থান লোহানীরা এবং মামুদ কেউই সুনজরে দেখছিলেন না। অতএব মামুদ শাহ্ কুতুব খানের নেতৃত্বে সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করলেন, আফগানের হাত থেকে বিহার ছিনিয়ে নেবার জন্য। এই যুদ্ধে কুতুব পরাজিত ও নিহত হন। মকদুম এই যুদ্ধে মামুদকে সাহায্য না করায়, মামুদ তাঁর বিরুদ্ধেও সৈন্য প্রেরণ করেন। মখদুম তাঁর সম্পত্তি শের-এর জিম্মায় রেখে যুদ্ধে যান এবং যুদ্ধে মারা যান। শের-এর হাত থেকে মুক্তি পাবার আশায় জালাল খান শের-এর বিরুদ্ধে মামুদকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসেন। কুতুবের পুত্র ইব্রাহিমের নেতৃত্বে এক সেনাবাহিনী এবং অন্যান্য নানাবিধ সাহায্য দিয়ে মামুদ শের-এর বিরুদ্ধে ইব্রাহিমকে সুরজগড়ের যুদ্ধে জালালের সাহায্যের জন্য পাঠালেন। সেই যুদ্ধে শেষ পর্যন্ত শের-ই জয়ী হন, এবং কামান-বন্দুক হাতীসহ বাঙলার প্রচুর ধন সম্পদ তাঁর হস্তগত হয়। ইব্রাহিম যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দেন।

এরই মধ্যে মোগল সম্রাট হুমায়ুন শের-এর স্পর্ধা প্রশমিত করার জন্য ছুটে আসেন। তখন চতুর শের বিহার ছেড়ে বাঙলার প্রভু হতে বাঞ্ছা করলেন। হুমায়ুনকে বিহার ছেড়ে দিয়ে তিনি মামুদকে সরাতেই উঠে পড়ে লাগেন। বিহার হস্তগত হওয়ায় হুমায়ুন ও ফিরে যান, কারণ গুজরাট নিয়ে তিনি তখন ব্যস্ত।

সুরজগড়ের যুদ্ধে ইব্রাহিমের মৃত্যু হলে অসহায় মামুদের তখন বিদেশী বীর কামান-বন্দুকধারী পর্তুগীজের সাহায্য লাভ ব্যতীত বাঁচার দ্বিতীয় কোন রাস্তাই খোলা ছিল না। অতএব তাঁকে শেষ পর্যন্ত আবার ডি মেলোরই শরণাপন্ন হতে হয়। ডি কুন্হার বন্ধুত্ব যাচঞা করে সৈন্য সাহায্যের জন্য আবেদন জানান মামুদ। সেই সময় পর্তুগীজ ক্যাপ্টেন দিয়োগো রেবেলো সাতগাঁও এ দুটি অস্ত্র সজ্জিত পণ্যবাহী জাহাজ নিয়ে উপস্থিত হন। সেখান থেকে তাঁরা মামুদ শাহ্কে জানান ডি মেলোকে অবিলম্বে মুক্তি না দিলে ডি কুন্হার আদেশে সাতগাঁও-এও আগুন জ্বলবে, রক্তের প্লাবন বইবে। সাতগাঁও-এর রাজাকে মামুদ নির্দেশ পাঠালেন রেবোলোকে সাদরে গ্রহণ করবার জন্য। তিনি যে ডি কুন্হার বন্ধুত্ব প্রার্থনা করেছেন, এবং বাঙলার সঙ্গে পর্তুগীজদের দীর্ঘদিনের বাণিজ্য করার স্বপ্ন আকাঙ্ক্ষা পূরণ করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন সেকথাও রেবেলোকে জানিয়ে দিলেন। "He asked for Portuguese help and in return he promised to grant them land, to errect their factories and permission to build fortresses in Chitagong and Satgaon,"

অতঃপর দু'জন পর্তুগীজ সেনাধ্যক্ষের অধীনে মামুদের সেনাবাহিনী তেলিয়াগড়ির যুদ্ধে শেরের গতিরোধ করে। কিন্তু চতুর, কৌশলী শেরখান সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে ঝাড়খণ্ডের পথ দিয়ে বাঙলায় অতর্কিতে প্রবেশ করায় ১৩ লক্ষ টাকার স্বর্ণের বিনিময়ে মামুদ সন্ধি করতে বাধ্য হন। সেই অর্থে পুষ্ট হয়ে পর বৎসরেই ফিরে আসেন শের খাঁ। গৌড় অবরোধ করেন। মামুদ কোনক্রমে পালিয়ে যান। ১৩৫৮ সালের ৬ই এপ্রিল গৌড় শেরের অধিকারে আসে। অতঃপর মামুদ বাঙলার দিকে

আগুয়ান হুমায়ুনের সাহায্য ভিক্ষা করেন, কিন্তু হুমায়ুন গৌড় জয় করার অল্পকাল পরেই মামুদ মারা যান।

মামুদের একেবারে শেষ পরিণতি যা-ই হোক, শের-খানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে পর্তুগীজদের সাহসিকতা ও বীরত্ব দেখে তিনি খুশীই হয়েছিলেন, ডি মেলোকে তিনি যথেষ্ট পুরস্কৃত করেছিলেন এবং তাঁদের বাণিজ্য কুঠি নির্মাণের ও শুল্ক আদায়ের অনুমতিও দিয়েছিলেন। ঐতিহাসিক রমেশ চন্দ্র মজুমদারের "History of Mediaeval Bengal" গ্রন্থ থেকে সামান্য অংশ-উদ্ধৃতি আমাদের এ বক্তব্যের সমর্থনে তুলে ধরা হোল: "Though defeated in the war against Sher Khan, Mahmud was satisfied with the Portuguese at the courage shown by them. He handsomely rewarded Affonso de Mello. The Portuguese were given land and houses in plenty and also permission to set up trading posts and customs stations. They set up a big Custom Station at Chitagong, and a smaller one at Saptagram. The Portuguese further got the right to realise revenue from the local Hindus and Muslims besides other privileges."

চার

ঐতিহাসিক উপন্যাস

বিষয়বস্তুর দিক থেকে শ্রেণী বিচার করলে "পদসঞ্চার"-কে ঐতিহাসিক উপন্যাসের শ্রেণীতে রেখেই আলোচনা করতে হয়। এ সম্পর্কে আলোচনা করার আগে আলোচ্য উপন্যাস সম্পর্কে ঔপন্যাসিকের বক্তব্যটি সর্ব প্রথম গণ্য করতে হয়: " 'পদসঞ্চার' ইতিহাস-ভিত্তিক উপন্যাস। বাঙলা দেশে কেমন করে প্রথম ইয়োরোপীয় বাণিজ্যের পদক্ষেপ ঘটল, কি ভাবে পশ্চিমের লক্ষ্মী বাঙালীর ঘটে অধিষ্ঠান করলেন, সেই পূর্বাভাসটিই এই উপন্যাসে দিতে চেয়েছি। ইতিহাসের এই আশ্চর্য সন্ধি-লগ্নটিকে নিয়ে চর্চা করার একটি বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক এবং সামাজিক মূল্য আছে; যদি 'পদসঞ্চারে' সে চর্চা সামান্য ক্ষেত্রেও সার্থক হয়ে থাকে তাহলে সে কৃতিত্ব ইতিহাসেরই। কারণ, এই যুগের বাস্তব কাহিনী উপন্যাসের চাইতেও বিস্ময়কর।" ['লেখকের কথা'; "পদসঞ্চার"] লেখক একথাও স্পষ্টাক্ষরে জানিয়েছেন, "এই বইতে ঐতিহাসিক সততা যথাসাধ্য রাখতে চেষ্টা করেছি, এবং আমার সংগ্রহের সীমায় প্রামাণ্য গ্রন্থগুলির সাহায্য নিয়েছি।......একটা নতুন যুগের সূচনা-পর্বে এসেই আমি এই উপন্যাসে দাঁড়ি টেনেছি। এরপরে একাধিক খণ্ড লেখা সম্ভব...আপাতত 'পদসঞ্চার' তার সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ উপন্যাস।...এই কাহিনীর অধিকাংশ চরিত্র আর ঘটনাই ঐতিহাসিক; কিন্তু 'পদসঞ্চার' উপন্যাসও বটে।"

সুতরাং লেখকের স্বীকৃতি থেকে সন্দেহ থাকে না যে, 'পদসঞ্চারে' যেমন ঐতিহাসিক ঘটনা ও চরিত্র আছে, তেমনি এর সঙ্গে অঙ্কিত হয়েছে উপন্যাসের কাল্পনিক অংশও। প্রশ্ন হ'ল, ঐতিহাসিক ঘটনা ও চরিত্র থাকলেই কি 'ঐতিহাসিক উপন্যাস'আখ্যা দেওয়া যায়? অর্থাৎ নিছক ইতিকথা ও তৎসংলগ্ন চরিত্র, নাকি অন্য কিছু বা আর কিছু? ঔপন্যাসিক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'পদসঞ্চার' গ্রন্থে 'লেখকের কথা' অংশে আমাদের এ-প্রশ্নের উত্তর-সংকেত রেখেছেন; "জাতি এবং সংস্কৃতিকে বোঝবার জন্যে অতীতাশ্রয়ী কাহিনীর প্রয়োজনীয়তা আজও স্বীকৃত,...।" অতএব 'জাতি ও সংস্কৃতিকে' বোঝার বা বোঝাবার চেষ্টা যে লেখকের অন্যতম উদ্দেশ্য এবং সেইজন্যই এই ইতিহাসাশ্রয়ী কাহিনী ও চরিত্রের অবলম্বন—এ উত্তর আমরা পেয়ে যাই।

ঐতিহাসিক উপন্যাসের লক্ষণ ও বৈশিষ্ট্য :

'জাতি' ও 'সংস্কৃতি' শব্দ দুটির অর্থবিস্তার কম নয়। বরং বলাই শ্রেয়,—মহাকাব্যিক বিস্তার আছে। ঠিকই, ঐতিহাসিক উপন্যাস যেখানে কতকগুলি চরিত্র সহায়ে একটি যুগ বা কালের গণ্ডীকে ধীরে ধীরে অতিক্রম করে যায়, কতকগুলি চরিত্র যখন তাদের জীবন চর্যায়, উত্থানে-পতনে, আশায়-আকাঙ্ক্ষায় স্বপ্নে 'ব্যক্তিক'-খোলোশটি পরিত্যাগ করে 'জাতি'র কিংবা আরও বৃহত্তর কল্পনায় বিশ্বমানবের 'সার্বিক' জীবন-সত্যের অঙ্গীভূত হয়ে যায়, তখনই ঘটে ঐতিহাসিক উপন্যাসের মহাকাব্যিক বিস্তার। ভুলে গেলে চলবে না, 'যুগ' বা 'কাল'-কে অস্বীকার করে নয়, তাকে বিশ্বস্ত ভাবে গ্রহণ করেই অতিক্রম। চরিত্রগুলিও যুগীয় পরিবেশ ও ভাবনার মাটিতেই অঙ্কুরিত, পল্লবিত, এবং পরিণামী হবে ; তবে যুগোত্তীর্ণ বা কালোত্তীর্ণ পুরুষ যেমন যুগনন্ধ বা যুগন্ধরও বটে, তেমনি, এইসব চরিত্রের জীবন-ভাবনায় বা দর্শনে এমন কিছু থাকে যা তাঁকে যুগাতিক্রামী করে ; বর্তমানের সমাজভূমির ওপর দাঁড়িয়ে এক হাতে অতীতকে ধরেন, অপর হস্ত প্রসারিত হয় ভবিষ্যৎকে স্পর্শ করার আশায়। ইতিহাস তখন আর অতীতের ঘটনাপঞ্জী মাত্র নয়, কতকগুলি তথ্য এবং সন-তারিখ নয়, ইতিহাস তখন গতিশীল, অতীত থেকে ভবিষ্যৎগামী জীবন প্রবাহ—যার অন্তরে আছে মর্ত্য-পিপাসা, মর্ত্য প্রেম। ইতিহাসের উপাদান, ঘটনাপঞ্জী ও চরিত্র জীবনরসে সমৃদ্ধ, মর্ত্যপ্রেমে আপ্তকাম। তখন ইতিহাস জীবন-রসে ভরপুর স্নিগ্ধ, মায়াময়ও সত্য। এরই নামান্তর সম্ভবত 'ঐতিহাসিকরস' রবীন্দ্রনাথের ভাষায়। একটি সাম্রাজ্যের উত্থান-পতনের সঙ্গে, মিশে যায় সেই ইতিহাসের স্রষ্টাদের ব্যক্তি জীবনের সুখ-দুঃখ, সার্থকতা-ব্যর্থতার কাহিনী, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীবন নির্ঝরিণীগুলি চিরন্তন জীবন প্রবাহের সঙ্গে একাত্ম হয়ে পড়ে, খণ্ড কাল মহাকালের কণ্ঠে মালা হয়ে দুলতে থাকে, এবং অন্য দীপ্তি পায়। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন : "পৃথিবীতে অল্পসংখ্যক লোকের অভ্যুদয় হয় যাঁহাদের সুখদুঃখ জগতের বৃহৎব্যাপারের সহিত বদ্ধ। রাজ্যের উত্থান-পতন মহাকালের সুদূর কার্য-পরম্পরা, যে সমুদ্রগর্জনের সহিত উঠিতেছে পড়িতেছে সেই মহান কলসংগীতের সুরে তাহাদের ব্যক্তিগত বিরাগ-অনুরাগ বাজিয়া উঠিতে থাকে। তাহাদের কাহিনী যখন গীত হইতে থাকে তখন রুদ্রবীণার একটা তারে মূলরাগিনী বাজে এবং বাদকের অবশিষ্ট চার আঙুল পশ্চাতের সরু মোটা সমস্ত তারগুলিতে অবিশ্রাম একটা বিচিত্র গম্ভীর, একটা সুদূরবিস্তৃত ঝংকার জাগ্রত করিয়া রাখে।

"এই যে মানুষের সঙ্গে সঙ্গে কালের গতি ইহা আমাদের প্রতিদিনের প্রত্যক্ষগোচর নহে।...তাঁহাদিগকে কেবল ব্যক্তিবিশেষ বলিয়া নহে, পরন্তু মহাকালের অঙ্গস্বরূপ দেখিতে হইলে, দূরে দাঁড়াইতে হয়, অতীতের মধ্যে তাঁহাদিগকে স্থাপন করিতে হয়, তাঁহারা যে সুবৃহৎ রঙ্গভূমিতে নায়কস্বরূপ ছিলেন সেটা-সুদ্ধ তাঁহাদিগকে এক করিয়া দেখিতে হয়।

"এই-যে আমাদের প্রতিদিনের সাধারণ সুখদুঃখ হইতে দূরত্ব—আমরা যখন চাকরি করিয়া কাঁদিয়া-কাটিয়া খাইয়া-দাইয়া কাল কাটাইতেছি তখন যে জগতের রাজপথ দিয়া

বড়ো বড়ো সারথিরা কালরথ চালনা করিয়া কইয়া চলিতেছেন; ইহাই অকস্মাৎ ক্ষণকালের জন্যে উপলব্ধি করিয়া ক্ষুদ্র পরিধি হইতে মুক্তিলাভ—ইহাই ইতিহাসের প্রকৃত রসস্বাদ।" ["ঐতিহাসিক উপন্যাস"]

সুতরাং ঐতিহাসিক উপন্যাসে (১) ইতিহাসের ঘটনা ও কাহিনীর পাশাপাশি সুখদুঃখ, আনন্দ-বেদনার জীবন কাহিনীর ধারাটি, যা ঔপন্যাসিকের কবি-কল্পনা-সৃষ্ট, প্রবাহিত থাকবে ; (২) ইতিহাসের ধারক ও বাহক চরিত্রগুলি, অর্থাৎ ইতিহাস-নির্মাণকারী চরিত্রগুলির সঙ্গে শিল্পীর সৃষ্ট কাল্পনিক চরিত্র মিলে গৃহীত-ইতিহাস যুগের ভাব পরিমণ্ডল ও সমাজ বাস্তবতা গঠন করবে। শিল্পীকে সতর্ক থাকতে হবে ইতিহাসের চরিত্রগুলি সম্পর্কে। এই চরিত্রগুলির স্পষ্টতই দুটি দিক—একটি তাঁদের ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষা, আনন্দ-বেদনার দিক, দ্বিতীয়টি তাঁদের ইতিহাস সৃষ্টিকারী চরিত্র, অর্থাৎ ইতিহাসের ঘটনাবলীর সাহায্যে তাঁদের চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব যেভাবে প্রতিভাত হয়ে উঠেছে ; এক কথায় এটিকে 'ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব' নামে অভিহিত করলে বোধ হয় ভুল হয় না। যেমন, ইতিহাস পরিচয়ে ঔরঙ্গজীব আমাদের কাছে তীক্ষ্ণধী, কূট-নীতিজ্ঞ, ক্রূর, প্রখর ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন গোঁড়া মুসলমান রূপেই পরিচিত। এইটিকে তাঁর ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব'-ই বলতে চাইছি। পাঠক বা সাধারণের মনে তাঁর এই পরিচয়টি কালবাহিত হয়ে একটি ভাবমূর্তি রচনা করেছে, সিদ্ধ রূপ গ্রহণ করেছে। এই সিদ্ধরূপ, তথা, ঐতিহাসিক-ব্যক্তিত্বটিকে ঔপন্যাসিক বিকৃত করতে পারেন না কল্পনার স্বেচ্ছাচারিতায়। (৩) প্রসঙ্গত অতএব এসেই পড়ে, ইতিহাসের কাহিনী ও চরিত্রের শিল্পরূপের মধ্য দিয়ে তাঁকে সিদ্ধ রসটির দিকে দৃষ্টি রাখতে হয় ; (৪) একটি যুগ বা বিশেষ সময়ের ইতিহাস মানে নয়, শুধুমাত্র সেই যুগ বা কালের রাজারাজড়ার কাহিনী, তাঁদের শাসন-অত্যাচার, ভোগ-বিলাসিতা ও যুদ্ধ-বিগ্রহের বর্ণনা ; তার সঙ্গে আছে সেই যুগের সামাজিক-অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক এবং ধর্মীয় ভাবনা-চিন্তা, ও যুগাবস্থার* চিত্রও ; থাকবে সাংস্কৃতিক পরিচয়। নচেৎ যুগের বাস্তব অবস্থাটি বোঝা যায় না। শাসকের চিত্র-চরিত্র যেমন থাকবে, তেমনি থাকবে শাসিতের চিত্রও—তাদের প্রথা-সংস্কার, আচার-আচরণ, রীতি-নীতি, আশা-স্বপ্ন, শিক্ষা-সংস্কৃতি প্রভৃতি। (৫) সার্থক ঐতিহাসিক উপন্যাসে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যক্তি মিশে যায় সমাজে, সমাজ থেকে দেশ এবং দেশ থেকে মহাদেশ, বা বিশ্ব-মানবের অঙ্গীভূত হচ্ছে, এবং খণ্ড খণ্ড কালের ছোট-বড় ধারাগুলি মিলে-মিশে এক মহাকাল-সমুদ্রে লীন হয়ে যায় শেষ পর্যন্ত। ক্ষুদ্র-বৃহৎ জীবনের বিচিত্র-গম্ভীর সুরগুলি মহাকালের বীণায় ঝংকারে চিরন্তন কান্তি লাভ করে। ঐতিহাসিক রসে শিল্প শাশ্বত মহিমায় সুন্দর হয়ে ওঠে।

ঐতিহাসিক উপন্যাসে নায়ক কে? প্রশ্নটির উত্তর দিয়েছেন ড. সরোজ দত্ত : "ইতিহাসে যার অধিকার। আরও একটু সাহস করে বলা যাক্—ইতিহাসই ঐতিহাসিক উপন্যাসের নায়ক। কখনও ইতিহাসে চরিত্র সৃষ্টি হয়, কখনও সবল চরিত্র ইতিহাস গড়ে তোলে। বিবর্তনের ইতিহাসে দেখব, একের অধিকার কেমন করে বহুজনের

সামর্থ্যে জন্মান্তর পেয়ে যাচ্ছে। কিন্তু শেষ মূল্য কোথায়? সর্বজনের অঙ্গীকারে। এই সর্বজন ভৌগোলিক পরিধি হারাচ্ছে আস্তে আস্তে।······কালের যাত্রার রথের রশিতে আজ এদেরই অধিকার। আজ ইতিহাসের নায়ক এই মিলিত অস্তিত্ব।'' ['ঐতিহাসিক উপন্যাস'—"সাহিত্য কোষ : কথা সাহিত্য''—অলোক রায় সম্পাদিত।]

'পদসঞ্চার'-এর ঐতিহাসিক উপাদান বিশ্লেষণ :

ক. **ঐতিহাসিক কাহিনী :** 'পদসঞ্চার' ঐতিহাসিক উপন্যাস। 'লেখকের কথা' অংশে ঔপন্যাসিক তা সুস্পষ্ট ভাবেই আমাদের জানিয়েছেন। এখানে ইতিহাসের ঘটনা ও কাহিনী যেমন যথাযথ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত, তেমনি শিল্পীর কল্পনায় উপন্যাসের জীবন বৃত্তটিও ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে।

'পদসঞ্চার'-এর ইতিহাস অংশটি লক্ষণীয়। সুদীর্ঘকাল ধরে মুর বা আরব বণিকগণ প্রাচ্যের বাণিজ্যে একছত্র আধিপত্য বিস্তার করেছিলেন। ভারতের সঙ্গে নিছক বাণিজ্যিক সম্পর্কই তাঁদের নয়, বিভিন্ন প্রদেশে বিভিন্ন রাজার রাজদরবারে এবং শাসন-ব্যবস্থায়ও বিশিষ্ট স্থান তাঁরা অধিকার করে নিয়েছিলেন। শুধু প্রাচ্যে নয়, স্পেন পর্তুগাল সমেত ইয়োরোপের অনেকখানি অঞ্চল জুড়েই ইসলামের প্রভুত্ব ছিল এককালে। এটি প্রাচীন ইতিহাসের পর্যায়েই পড়ে। আরবীয়দের এই প্রভুত্ব, ও সমৃদ্ধি, মধ্যযুগের পঞ্চদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত প্রায় অক্ষুণ্ণই ছিল। তারপর Age of Enlightenment-এর উদ্বোধনে স্পেন ও পর্তুগালের সম্মিলিত শক্তি হিস্পানিয়ারা স্পেন ও পর্তুগাল থেকে প্রথমে এবং পরে অন্যান্য ইয়োরোপীয় শক্তির সাহায্যে ইয়োরোপ থেকে মুরদের বিতাড়িত করে। এক্ষণে প্রাচ্যের উপকূলে আপন ক্ষমতা ও প্রাধান্য বজায় রাখতে আরবীয়গণ বদ্ধপরিকর এবং একরূপ মরিয়া হয়ে ওঠে। কিন্তু 'Age of Enlightenment-এর আলোয় স্নাত হয়ে, নবজাগ্রত ইয়োরোপীয় শক্তির প্রতিনিধি হিস্পানিয়ারা তখন দুর্বার, দুরন্ত শক্তির নেশায় মাতাল। নতুন নতুন পথ ও দেশ আবিষ্কার করতে হবে, নতুন নতুন সম্ভাবনার দুয়ার খুলে দিতে হবে, প্রভুত্ব সম্পদ চাই—অতএব বাণিজ্যের প্রসার চাই। ইসলামী মুরদের হটিয়ে ক্রীশ্চানদের জায়গা করে নিতে হবে। কাজেই চাই ক্রীশ্চান, চাই বাণিজ্য। শুরু হ'ল দিকে দিকে অভিযান। বারথেলোমিউ দিয়াজ, কোভিলহান, কাবরাল, ভাস্কো-ডা-গামা। অবশেষে ভাস্কো-ডা-গামা ১৪৯৮ খ্রীস্টাব্দে আগষ্ট মাসে ভারতের মাটিতে পদার্পণ করলেন। কালিকটের রাজা, বা জামোরিনের অভ্যর্থনা পেলেও এখানে মুর ও মোপলা বণিকদের শত্রুতা, ঘৃণা লাঞ্ছনা ভোগ করতে হ'ল প্রতিপদে। এরপর থেকে ভূসর্গ ভারতের মাটিতে ব্যবসা বাণিজ্য করতে, কুঠি ও দুর্গ নির্মাণের আশায়, এবং ক্রীশ্চান বৃদ্ধির সঙ্কল্পে একে একে অনেকগুলি অভিযানই হ'ল পর্তুগীজদের। এর মধ্যে কিউটার দুর্গ ধবংস করে এবং সম্মিলিত আরবীদের প্রতিরোধ গুঁড়িয়ে দিয়ে সালাত্ বেন সালাত দুর্গ কামানের গোলায় বিধবস্ত করে প্রাচ্যে মুরদের শক্তির মূলকে উৎপাটিত করে ফেলার গ্রাস, সৃষ্টি করে ফেলেছেন প্রাচ্যের নবনিযুক্ত শাসনকর্তা ফ্রান্সিসকো আলমিডা। অনেক ঝড়-ঝঞ্ঝা

গেছে, অনেক লাঞ্ছনা, অত্যাচার, অনেক রক্ত ঝরেছে, প্রাণের আহুতি হয়েছে—তাই প্রতিহিংসার আগুন জ্বালিয়ে, নির্দয়-নিষ্ঠুর আঘাত হানতে সংকল্পবদ্ধ হয়েই পর্তুগীজরা প্রাচ্যের সমুদ্রকে রক্তে রাঙা করে, দস্যুতা করে বন্দরে বন্দরে আগুন জ্বালায়, কামানের গোলায় বাড়ী-ঘর ধ্বংস করে এবং দানবীয় বিক্রমে প্রাচ্যের উপকূলে ভারতের মাটিতে ফিরতে থাকে। মনে নিশ্চিত প্রতিজ্ঞা—চাই খ্রীশ্চান, চাই বাণিজ্য বা মশলা।

আলমিডার পর আলবুকার্ক। "স্থির, ধীর, বিচক্ষণ। যে সাম্রাজ্যকে আলমিডা অংকুরিত করে গিয়েছিলেন, আলবুকার্ক তাতে ধরালেন নতুন পল্লব। রক্তপান শেষ করে পশ্চিমের বাণিজ্যলক্ষ্মী বসলেন বরদা হয়ে।" ভারতের মাটিতে প্রথম পর্তুগীজ দুর্গ গড়ে তোলার কৃতিত্ব আলবুকার্কের।

এইভাবে পাশ্চাত্ত্য শক্তির প্রতিভূ হয়ে পর্তুগীজগণই ভারতের মাটিতে শুধু বাণিজ্য নয়, সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার ভিত্তি স্থাপন করলেন। কালিকট, কোচিন, গোয়া-দমন-দিউ থেকে ভারতের পূর্ব উপকূলের বাঙলার হৃদপদ্মে পাশ্চাত্ত্য বাণিজ্যলক্ষ্মীর ঘটটি স্থাপন করতে চট্টগ্রামের বন্দরে গোয়ার শাসনকর্তা ডি কুনহার প্রতিনিধি হয়ে এলেন পর্তুগীজ ক্যাপিতান ডি মেলো। 'পদসঞ্চার' উপন্যাসের মূল ঐতিহাসিক কাহিনী—বাঙলার মাটিতে পর্তুগীজরা ইয়োরোপীয় প্রভুত্বের প্রতিভূ হয়ে কেমন করে আরব বণিকদের চক্রান্তজাল ছিন্ন করে বাণিজ্যাধিকার কেড়ে নিলেন, কুঠি ও দুর্গ নির্মাণ করলেন, এবং প্রভুত্বের শিকড়কে অনেক দূর পর্যন্ত চালিয়ে দিলেন। 'কথামুখ'-এর সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর স্থাপিত হয়েছে এই কাহিনী। 'কথামুখ' অতীতের সঙ্গে বর্তমানকে বেঁধে দিয়েছে। বর্তমান বলতে হুসেন শাহী আমলের বাংলার ইতিহাস। জীবনের ধারা কিন্তু এখানে এসেই থেমে যায় নি,—ভবিষ্যতের দিকে তার চঞ্চল চরণ। পর্তুগীজরা বাঙলায় বাণিজ্য করে, কুঠি ও দুর্গ নির্মাণ করে প্রভূত সম্পদ আহরণ করেছেন, বিত্তবান হয়েছেন, কিন্তু বাঙলার সিংহাসন পরবর্তী কালের ইংরাজ বণিকদের জন্যই যেন কোল পেতেছিল; বাঙলার (তথা, ভারতের) শাসনদণ্ড তাঁদের জন্যই অপেক্ষা করছিল, বাঙলার শিল্প-বাণিজ্য তাঁদের মুক্ত কৃপাণের কাছে মাথা লুটিয়ে দেবার অপেক্ষায় ছিল। 'কথামুখ' অংশের শেষ দুটি অনুচ্ছেদ খুবই তাৎপর্যপূর্ণ :

"অন্ধকার কাঁপিয়ে আর একবার অট্টহাসি করল ভাস্কো-ডা-গামা। কোথা থেকে জেগে উঠল একটা চকিত ঝোড়ো হাওয়া—হাহাকার করে উঠল দারচিনি আর এলালতার বন। আকাশের পুঞ্জিত মেঘে বিকীর্ণ হল খর-বিদ্যুতের অসিধারা—যেন বিধ্বস্ত মুর-প্রতিষ্ঠার ভগ্ন দুর্গে অবারিত হল আর এক নতুন শক্তির তোরণ-দ্বার।

"আর সেই অট্টহাসি রাত্রির আকাশে কেঁপে চলল কোটি অলক্ষ্য নিশি বিহঙ্গের পাখার মতো। সেই তরঙ্গিত হাসির ছোঁয়ায় সুদূরে বাংলার ঢাকায়, শান্তিপুরে, চন্দ্রকোণায় ঘুমন্ত তাঁতীরা একটা দুঃস্বপ্ন দেখল একসঙ্গে। স্বপ্ন দেখল, একটা লৌহময় রাক্ষস একখানা তীক্ষ্নধার করাত দিয়ে একটির পর একটি করে তাদের আঙুল কেটে চলেছে!"

ব্যঞ্জনাধর্মী এই বর্ণনার গর্ভে লুকিয়ে আছে ভবিষ্যতের ইঙ্গিত। বাঙলার শিল্পী

দের ঠিক এই মর্মন্তুদ পরিণতি পর্তুগীজদের হাতে হয় নি, হয়েছিল ইংরাজ বণিক ও শাসকদের হাতে।* পর্তুগীজ বণিকগণ সেই পরবর্তীকালের ইয়োরপীয় বণিক ও শাসক দের প্রতিনিধি হয়েই যেন এসেছিলেন। ঔপন্যাসিকও সেই ভবিষ্যতের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করেছেন। 'কথামুখ' অংশে এইভাবে সমগ্র উপন্যাস বর্ণিত ইতিহাসকে অতীত থেকে ভবিষ্যতের অভিমুখী করে। একই শৃঙ্খলে ধীরে ধীরে বাঁধা পড়ে অতীত-বর্তমান-ও ভবিষ্যৎ। কাহিনী খণ্ডিতকালের বলয় ত্যাগ করে মহাকালের বক্ষে লীন হয়। 'কথামুখে'র সুরটির অনুরণন শোনা যাবে উপন্যাসের শেষ অধ্যায়ে (২৩-শ পরিচ্ছেদ): "আর বহুকাল আগে কালিকট বন্দরে ডা- গামার অট্টহাসির মতো সেই কামানের আওয়াজ ছড়িয়ে পড়ল পূর্ব থেকে পশ্চিমে, উত্তর থেকে দক্ষিণে। বাঙলার পথ-ঘাট-পাহাড়-নদী-বন-বনান্তর পার হয়ে সেই শব্দ ভেসে চলল ইতিহাসের দিগন্তে। আর তার সঙ্গে সঙ্গে একটা ভয়াবহ জাগ্রত স্বপ্নে বুঝি তাদের মনে হ'ল—কারা যেন তীক্ষ্নধার অস্ত্র দিয়ে নিষ্ঠুর হিংসায় এক একটি করে তাদের হাতের আঙুলগুলো কেটে চলেছে"।

এইভাবে ঔপন্যাসিক ইতিহাস কাহিনীর ভাব বৃত্তটি সম্পূর্ণ করেছেন আলোচ্য উপন্যাসে গৃহীত-ইতিহাসের ঘটনা ও কাহিনীর দুটি অংশ—(ক) একটি পশ্চিমের প্রতিনিধি

* ভারতে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির শাসনের প্রথম যুগে ভারতীয় শিল্পের বাজারকে বিশেষত বস্ত্র শিল্পের বাজারকে বিনষ্ট করে এবং এক এক করে ভারতের শিল্প গুলিকে ধ্বংস করতে ইংরাজ বণিকরা যে নৃশংসতার পরিচয় দিয়েছিলেন তার সামান্য বর্ণনা উদ্ধৃত করা হোল। উইলিয়াম বোলট্স-এর লেখা থেকে: "দরিদ্র কারিগর ও শ্রমিকগণের উপর কল্পনাতীত লাঞ্ছনা ও অত্যাচার অনুষ্ঠিত হইয়াছে। তাহাদের কার্যতঃ কোম্পানির একচেটিয়া ক্রীতদাসে পরিণত করা হইয়াছে। দরিদ্র তন্তুবায়গণের শোষণ উৎপীড়নের বিভিন্ন প্রকার ও অসংখ্য পদ্ধতি উদ্ভাবিত হইয়াছে এবং উহার প্রত্যেকটি কোম্পানির দালাল (বেনিয়ান) ও গোমস্তাগণের দ্বারা তন্তুবায়গণের উপর প্রয়োগ করা হইয়া থাকে। শোষণ-উৎপীড়নের সেই সকল পদ্ধতির মধ্যে কয়েকটি হইল—জরিমানা, কারাগারে আটক, চাবুক দ্বারা প্রহার, বলপূর্বক মুচলেকা আদায় ইত্যাদি।" ['Considerations of Indian Affairs'—অনু: সুপ্রকাশ রায় "ভারতের কৃষকবিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম" পৃ: ৫৮] এই তাঁতীদের দুর্দশা নাকি এমনই চরমে পৌঁচেছিল যে তাঁত বোনার ভয়ে তাঁদের বুড়ো আঙুলগুলি কেটে ফেলতে বাধ্য হয়েছিল ও পৈতৃক ব্যবসা ফেলে ভিনদেশে পালিয়ে গিয়েছিল অনেকে। ১৮৯০ সালে স্যার হেনরী কটন লেখেন: "...The whole commerce of Dacca...in 1817... ceased altogether. The arts of spinning and weaving, which for ages afforded employment to a numerous and industrial population, have now become extinct. Families which were formerly in a state of affluence have been driven to desert the towns and betake themselves to the villages for a livelihood ...This decadence has occurred not in Dacca only, but in all districts. Not a year passes in which the Commissioners and District Officers do not bring to the notice of Government that the manufacturing classes in all parts of the country are becoming impoverished." [রজনী পাম দত্তের 'India Today' গ্রন্থ থেকে গৃহীত] তাঁতীদের আঙুল কেটে ফেলার বিবরণ হীরেন মুখার্জীর 'ভারতবর্ষের ইতিহাস' গ্রন্থেও আছে।

হয়ে পর্তুগীজদের ভারতে আগমন, ব্যবসা বাণিজ্য স্থাপন, কুঠি দুর্গ নির্মাণ, ও কয়েকটি অঞ্চলের শাসনভার গ্রহণ ; (খ) ১৫২৬-১৫৩৮ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত হুসেন শাহী বংশের রাজত্বকালে বাংলার ইতিহাস। ইতিহাসের যে তথ্য প্রথমেই উদ্ধৃত করা হয়েছে, তার প্রত্যেকটি ঘটনা ও বিবরণের সঙ্গে উপন্যাসে বর্ণিত ইতিহাস ও ঘটনা-কাহিনীর হুবহু মিল লক্ষ্য করা যাবে। ঝড়ে ডি মেলোর জাহাজ বহর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়া, জেলের সাহায্যে চট্টগ্রামের পরিবর্তে চাকারিয়ার নবাব খোদাবক্স খানের দরবারে উপস্থিতি, বন্দীদশা, ভ্যাসকন সেলস ও কোয়েল হোর আগমন এবং ডি মেলোর মুক্তি চেষ্টা, জেল ভেঙে পলায়নের চেষ্টা ব্যর্থ হওয়া, খাজা শিহাবুদ্দিনের সাহায্যে মুক্তি, কিশোর ভ্রাতুষ্পুত্র গঞ্জালোকে ব্রাহ্মণ সোমদেব কর্তৃক কালিকার চরণে বলিদান, গৌড়েশ্বর মামুদ শাহের সঙ্গে সীমান্ত অঞ্চলের শাসনকর্তার বিরোধ ও যুদ্ধ, শেরখানের বাংলা আক্রমণ, মামুদের সঙ্গে সুরজগড়ের যুদ্ধ, তেলিয়াগড়ীর যুদ্ধে পর্তুগীজদের সাহায্য গ্রহণ, ডি মেলোর মুক্তি, বাংলায় পর্তুগীজদের বাণিজ্যাধিকার, কুঠি নির্মাণ, দুর্গ স্থাপন প্রভৃতি প্রত্যেকটি ঘটনা, স্যার যদুনাথ সরকার সম্পাদিত "(The) History of Bengal" (vol. II), K. G. Jayne-র "Vasco-Da-Gama and His Suceessors," J. J. A. Campos-এর "History of the Portuguese in Bengal," M. R. Tarafdar-এর "Husain Shahi Bengal (1494-1538)" এবং পর্তুগীজ কবি ও ঐতিহাসিক ক্যামিয়নস-এর "লুসিয়াদাস" — ঐতিহাসিক কাব্য এবং পর্তুগীজ ঐতিহাসিক De Barros-এর বর্ণনার সঙ্গে "পদসঞ্চারে"র ঐতিহাসিক ঘটনা, চরিত্র, ও কাহিনীর কোন অনৈক্য বা বিকৃতি লক্ষ্য করা যায় না। ব্যতিক্রম কেবলমাত্র একটি জায়গায়। ঐতিহাসিকদের বর্ণনা থেকে জানা যায়, ডি মেলোকে প্রথম যখন চাকারিয়ার নবাব খোদাবক্স খানের দরবারে আনা হয়, তখন, নবাব তাঁকে সব রকম সুযোগ-সুবিধার আশ্বাস দান করতে রাজি হন, যদি আঞ্চলিক একটি বিবাদে ডি মেলো তাঁকে পর্তুগীজ সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেন। ইতিহাস বলে, ডি মেলো নবাবকে যুদ্ধ জয়ে সাহায্য করেন, কিন্তু বিনিময়ে নবাব তাঁকে সাহায্য করা তো দূরের কথা—বন্দী করেন। "According to the Portuguese accounts, Khuda Bakhsh offered them liberty in lieu of their military services in a feud he had with an unfriendly neighbour. The battle was fought and won but there was no improvement in the lot of the unhappy prisoners. Khuda Bakhsh transferred them to his headquarters further inland in breach of his plighted word." ["The Portuguese in Bengal"—Dr. Surendra Nath Sen, Director, National Archives of India.] ঔপন্যাসিক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় এখানে ইতিহাসের ঘটনাকে সামান্য বদলে নিয়েছেন। তাঁর উপন্যাসে দেখি খোদা বক্স খান ডি মেলোকে প্রস্তাব দেন, যদি প্রতিবেশী শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধে ডি মেলো তাঁকে সাহায্য করেন, তাহলে নবাব তাঁকে সব রকমের সাহায্য করতে প্রস্তুত

আছেন। কিন্তু ডি মেলো কোন মতেই সেই শর্তে রাজি না হওয়ায় সঙ্গীসহ তাঁকে নবাবের হাজতে বন্দী হতে হয়।

প্রশ্ন হ'ল এই পরিবর্তন ঔপন্যাসিক কী কারণে করলেন, যিনি অন্যান্য প্রতিটি ক্ষেত্রেই ইতিহাসের মর্যাদা রক্ষায় তৎপর? এই পরিবর্তনে শিল্পের স্বার্থ রক্ষিত হয়েছে কি? প্রত্যুত্তরে বলা যায়, পরিবর্তনের এই স্বাধীনতাটুকু শিল্পী গ্রহণ করেছেন দুটি দিক থেকে—প্রথমতঃ মূল ইতিহাসের সত্য এতে ক্ষুণ্ণ হয় নি; দ্বিতীয়তঃ ডি মেলোর চরিত্রটিকে মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করে শিল্প-সুন্দর করার প্রতি তাঁর আগ্রহ ছিল। আলোচ্য উপন্যাসে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় পর্তুগীজ ঐতিহাসিকদের বিবরণ অনুসরণ করেই প্রথম পরিচ্ছেদে লিখেছেন: "আলমিডার পরে এলেন আলবুকার্ক। স্থির, ধীর, বিচক্ষণ।" পর্তুগীজদের তখন নীতি হ'ল যুদ্ধ নয়, বন্ধুত্ব। বন্ধুত্বের সূত্রে তাঁরা গড়ে তুলবেন ভারতের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক। গোয়ার শাসনকর্তা নুনো ডি কুনহারও সেইরূপ নির্দেশ ছিল। সেই নির্দেশকে মান্য করেছেন 'পদসঞ্চার'-এর ডি মেলো। সুতরাং বৃহত্তর অর্থে ইতিহাসের সত্যকে ঔপন্যাসিক লঙ্ঘন করেন নি। দ্বিতীয়তঃ খোদাবক্স খানের শর্তভঙ্গ, ডি মেলোকে বন্দী করা, প্রভৃতি বিবরণ পর্তুগীজ ঐতিহাসিকদেরই,—অন্যান্য ঐতিহাসিক সে বিবরণ উদ্ধৃত করেছেন মাত্র, সত্য-মিথ্যা নিয়ে মাথা ঘামান নি। ঔপন্যাসিকের ইতিহাস-জ্ঞান, তাঁকে নির্দ্বন্দ্ব পথটি বেছে নিতে সাহায্য করেছে—কেননা, খোদাবক্স খানের প্রতি বিদ্বেষ-প্রসূত হয়েও পরবর্তীকালের পর্তুগীজ ঐতিহাসিকগণ মনে করে থাকতে পারেন যে, ডি মেলোর প্রতি অন্যায় করা হয়েছে। এদেশের এরূপ বিশ্বাস-ঘাতকতার কথা De Borros তো স্পষ্টাক্ষরেই লিখেছেন তাঁর বিবরণে। শিল্পগত দিক থেকে ডি মেলোর চরিত্রটি এই ঘটনায় একটি সুনিশ্চিত ব্যক্তিত্বে মণ্ডিত হয়ে ওঠে। একদিকে নিজ রাজার প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা—আনুগত্য- অপর দিকে কোন ভয়, অত্যাচার, প্রলোভনেই তিনি তাঁর আদর্শ পথ থেকে বিচ্যুত না হওয়ায় এক নব মহিমায় ভূষিত হলেন। সুতরাং এই পরিবর্তন এক দিকে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ইতিহাস-জ্ঞান অপর দিকে তাঁর শিল্পবোধেরই পরিচায়ক।

খ· **চরিত্র:** 'পদসঞ্চারের' ঐতিহাসিক কাহিনী-অংশের চরিত্রগুলিও ঐতিহাসিক। ভাস্কো-ডা-গামা, রাজা মনোএল, রাজা দোম জোয়াও, যুবরাজ হেনরী, কোভিলহান, বার্থোলোমিউ দিয়াজ, কাবরাল, আলমিডা, আলবুকার্ক, নুনো ডি কুনহা, মার্টিম অ্যাফন্‌শো ডি মেলো, ভ্যাসকনসেলস, কোয়েলহো, ভ্যাজ পেরিরা, গঞ্জালো, জর্জ আল কোকোরাদো, সিলভা মেনেজেস্‌, আজেভেদো, রেবেলো প্রভৃতি প্রত্যেকটি নামই ভারতে অভিযানকারী, বা ভারত অভিযানের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তি রূপে পর্তুগীজ ইতিহাসে উল্লিখিত। বাঙলার ইতিহাসের সঙ্গে জড়িত চরিত্রগুলি হ'ল—শ্রীচৈতন্য, গৌড়েশ্বর নসারৎ শাহ্‌, ফিরোজ শাহ্‌, মামুদ শাহ্‌, বিহারের জায়গীরদার শের খাঁ, দিল্লীর মুঘল সম্রাট হুমায়ুন, চাকারিয়ার শাসনকর্তা নবাব খোদাবক্স খান, এছাড়া গোলাম আলী, ইব্রাহিম খাঁ, জালাল খাঁ, মখদুম-ই-আলম, আলফা হাসানী প্রভৃতি প্রত্যেকটি নামই হ'ল ঐতিহাসিক।

গ. ভৌগোলিক নাম ও কাল : ঐতিহাসিক ঘটনা-কাহিনী ও চরিত্রগুলি সত্য হয়ে ওঠে যুগ এবং ভৌগোলিক পরিবেশে। কালিকট, কোচিন, মালাবার, গোয়া, বেলেম, কিউটা, সালাতবেন-সালাত, আরব, স্পেন-পর্তুগাল, সিংহল, চাকারিয়া, চট্টগ্রাম, সাতগাঁ বা সপ্তগ্রাম, ত্রিবেণী, নীলাচল বা পুরী জগন্নাথের মন্দির, সাসারাম, মুঙ্গের, সুরজগড়, তেলিয়াগড়ি নবদ্বীপ, ঝাড়খণ্ড, গঙ্গা, গঙ্গাসাগর, কর্ণফুলী, সরস্বতী প্রভৃতি ভৌগোলিক নামগুলির সঙ্গে এবং প্রধানত ১৪৯৭ থেকে ১৫৩৮ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত কাল সীমায় ইতিহাসের ঘটনাগুলি স্থান ও কালের ঐক্য রচনা করেও শিল্পীর নিপুণ কৌশলে স্থান তার সংকীর্ণ গণ্ডী অতিক্রম করে এবং তার নির্দিষ্ট বলয় ত্যাগ করে মহাকাব্যিক বিস্তার লাভ করেছে।

ঘ. রাজনৈতিক অবস্থা : স্থান ও কালের সামাজিক প্রথা-সংস্কার, সামাজিক জীবনধারা, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অবস্থা, ধর্ম ও সংস্কৃতি—এই সব কিছুর সমবায়ে গড়ে ওঠে একটি যুগের ইতিহাস। 'পদসঞ্চার' উপন্যাসে লেখক আচার-সংস্কার-প্রথা সমন্বিত বাঙলার সামাজিক জীবনটিকে মূর্ত করে তুলেছেন। শান্ত মন্থর গতির বাঙলার জীবনধারা আম-কাঁঠালের স্নিগ্ধ ছায়ায় নিশ্চিন্ত, দোয়েল শ্যামার গানে, নীল আকাশের মায়ায়, সোনালী ধানের আর শিল্পকাজের ঐশ্বর্যে সে তখনও স্বপ্নাবিভোর। বাঙলার এই নিশ্চিন্ত নিরুপদ্রব জীবনে ধীরে ধীরে সর্বনাশের ছায়া এসে পড়েছে। হুসেন শাহ নসরৎ শাহের রাজত্বকালে সুখ-শান্তি-সাহিত্য-সংস্কৃতি একটু একটু করে বিঘ্নিত হ'ল রাজনীতির ঘূর্ণীঝড়ে। দিল্লী থেকে মোঘল বাদশাহ হুমায়ুনের দৃষ্টি পড়েছে 'প্যারাডাইস অফ ইণ্ডিয়া' বাঙলার দিকে, বিহারের জায়গীরদার শের খাঁর লুব্ধ শাণিত দৃষ্টিও তাকে নিজের থাবার মধ্যে আনার চেষ্টা করছে ; আর সমুদ্রপারের বিদেশী বণিক পর্তুগীজরা বাঙলার বাণিজ্য লক্ষ্মীকে আপন লৌহ কঠিন কারাগারে বন্দিনী করতে সমুদ্যত। কিন্তু এই রাজনৈতিক দুর্বিপাকে সমাজের ওপরতলার মানুষ, নবাব উজীর-গুয়াজিল-শেঠ-আরব-মোপ্‌লা বণিকের জীবন যতখানি আলোড়িত হয়েছে, দুর্ভাবনার কুটিলরেখা ঘন ঘন চমকিত হয়েছে, সাধারণ জীবনধারায় সে কুটিল আবর্ত, সে ঘূর্ণীর বেগ দেখা দেয় নি। নানা ধর্ম, নানা সম্প্রদায়, নানা জাতি এসেছে গেছে—তারপর একদিন শান্তিতে বসবাস করেছে এক সঙ্গে। বাঙলার মানুষের জীবন প্রবাহে তারা দু একটা তরঙ্গ তুলেই আবার শান্ত হয়ে গেছে। পর্তুগীজরা সপ্তগ্রামে, চট্টগ্রামের বন্দরে কুঠি নির্মাণ করেছে, তাদের জাহাজ ভিড়েছে—বাঙলার সাধাণ মানুষ বিস্ময়মাখা দৃষ্টিতে তাদের দেখেছে, তারপর তাকে মেনে নিয়ে ভেবেছে : 'মন্দ কী' "শুধুই বিস্ময় —তার বেশি আর কিছুই নয়। এমন কত আসে—কত যায়। বাঙলার ঘরে লক্ষ্মীর নিত্য কোজাগরী। বাঙালীর অন্নপূর্ণার ভাণ্ডার অফুরন্ত। কোনো ভিক্ষার্থী এখান থেকে বিমুখ হয়ে ফেরে না। আজ এরা এসেছে—এরাও নিয়ে যাক।" ['পদসঞ্চার' ২৩শ পরিঃ] দেশের মধ্যে যখন মোগল-পাঠান কাটাকাটি মারামারি করছে, গৌড়ের নবাব যখন উম্মাদ হয়ে মাথার চুল ছিঁড়ছেন, বা সুরা-নারী নিয়ে ভুলে থাকতে চাইছেন,

তখন সমাজের গোঁড়া ব্রাহ্মণরা বিদ্রোহ করতে চাইলেও, তাঁরা হিন্দুর রাজত্ব ফিরে পাবার স্বপ্ন দেখলেও, সাধারণ মানুষ এ স্বপ্ন বিশ্বাস করে নি, বিন্দুমাত্র বিচলিত হয় নি। তাদের মন্থর নিরুপদ্রব জীবনযাত্রায় গতিবেগ বা টান লাগে না। সোমদেব যখন রাজায় রাজায় হানাহানির দুর্বল লগ্নে সাধারণ মানুষকে বিদ্রোহ করতে বলেন, যুদ্ধের জন্য অস্ত্র ধরতে বলেন, তখন তারা অবাক বিস্ময়ে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে থাকে: "—বিদ্রোহ ?

"আশ্চর্য হয়ে শুনেছে মানুষগুলো। বিদ্রোহ ? কিসের জন্যে ? কার বিরুদ্ধে ? গৌড়ের সিংহাসনে হিন্দু কিংবা পাঠান যেই-ই থাক, কী আসে যায় তাদের ? ডিহিদারের লোকের কাছে খাজনা দিয়েই তারা নিশ্চিন্ত। সুলতানের সঙ্গে তাদের চোখের দেখারও সম্বন্ধ নেই। বিদ্রোহ ?" [একুশ পরিঃ] জনৈক বৃদ্ধ সোমদেবকে বলেছেন : "কেন পাগলামি করছ ঠাকুর ? কে হিন্দু, কে পাঠান কিংবা কে বৌদ্ধ—তা নিয়ে কী আসে যায়! এক সঙ্গে আমরা থাকি, এক সঙ্গেই আমাদের মরা বাঁচা।..." [একুশ পরিঃ] বাঙলার সাধারণ মানুষের এই নিরুত্তাপ জীবনের ছবি 'পদসঞ্চারে' উজ্জ্বল রেখায় আঁকা আছে। ১৪৯৪ খ্রীস্টাব্দ থেকে ১৫৩৮ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত হুসেন শাহী বংশের রাজত্বকালে বাঙলার সাধারণ মানুষের জীবনচর্যা সম্পর্কে ঐতিহাসিকগণ এই মত পোষণ করেন। হুসেন শাহ—নসরৎ শাহের আমলে শাসকশ্রেণীর সাহিত্য শিল্প-কলার চর্চা, ধর্ম বিষয়ে নিরপেক্ষতা, বাঙলা ভাষার প্রতি শ্রদ্ধা, এবং সংস্কৃতিগত সমন্বয় মুসলমান শাসকগণের প্রতি ব্রাহ্মণ বাদে সাধারণ মানুষের একটি সম্প্রীতিই রচনা করে, এবং হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে একটি ঐক্যবোধ গড়ে তুলেছিল। "Thus the subjects were drawn closer to the ruling power with whom they had genuine reason to sympathize. Thus sympathy with a common ruling power seems to have generated a sense of unity among the people." ["Hussain Shahi Bengal", 1494–1538 A. D. – M. R. Tarafdar] তদানীন্তন কালে ব্রাহ্মণগণের গোঁড়ামি, মুসলমানদের প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষ এবং হিন্দুর রাজত্ব প্রতিষ্ঠা বিষয়ে আগ্রহ সম্পর্কেও ঐতিহাসিক শ্রীতরফদার বলেন : "The Brahmins seem to have constituted a small minority group in the general mass of the population, the majority of which must have been lower class Hindus. The conflicts between the Muslims and the Brahmins......were due to certain socio-political reasons which did not probably influence the social relationship between the Muslims and the lower class Hindus. 'পদসঞ্চার'-এর সোমদেব সেই মুষ্টিমেয় ব্রাহ্মণদের প্রতিনিধি। তাঁর হিন্দুর রাজত্ব প্রতিষ্ঠার কল্পনা ব্রাহ্মণদের মর্যাদা প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা 'socio-political reasons' থেকেই এসেছে। এবং 'which did not probably

influence the social relationship between the Muslims and the lower class Hindus'. একথার সত্যতাও ঔপন্যাসিক আমাদের সামনে রেখেছেন। আমরা শঙ্খ দত্ত এবং রাজশেখর উভয় বণিককেই গুরু সোমদেবের গোঁড়ামি, মুসলমান বিদ্বেষ, প্রভৃতির বিরুদ্ধে তর্ক করতে দেখি। গুরুর মুসলমান বিদ্বেষ সমর্থন করেন নি রাজশেখর। মনে মনে বলেছেন: "দেশে বিধর্মী না থাকলে হয়তো সবাই-ই খুশি হয়; কিন্তু থাকলেই বা ক্ষতি কি? প্রথম যারা অপরিচিত শত্রু হয়ে এসেছিল—আজ তারা ঘরের লোক হয়ে দাঁড়িয়েছে, আস্তে আস্তে আত্মীয় হয়ে উঠেছে। বিশেষ করে যে সব পাঠান এ দেশে এসে বাসা বেঁধেছে—এক ধর্ম ছাড়া তাদের সঙ্গে আর তো কোন ব্যবধানই নেই। এমন কি, নিজেদের ভাষা পর্যন্ত ভুলতে বসেছে তারা। সুখে-দুঃখে-বিপদে-সম্পদে ডাক পড়লেই এসে দাঁড়ায় পাশে।...... এই তো কিছুদিন আগে সুলতান হোসেন শাহ ছিলেন গৌড়ের সিংহাসনে। হিন্দু মুসলমান এক সঙ্গে মাথা নুইয়েছে তাঁর নামে। তাঁকে বলেছে "নৃপতি তিলক"। চট্টগ্রামের ছুটি খাঁ—পরাগল খাঁ-র মতো ক'জন মহাপ্রাণ হিন্দুর সন্ধান মিলবে আশে পাশে।" [ছয় পরিঃ]

ঙ. অর্থনৈতিক চিত্র: হুসেন শাহী আমলে, আরও সঠিকভাবে পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দীর মোঘল সম্রাটগণ, বা ইয়োরোপীয় বণিক ও আগন্তুকদের বিবরণ থেকে 'রত্ন প্রসবিনী বাঙলা', 'সোনার বাঙলা', 'ভারতের স্বর্গ', 'স্বপ্নের দেশ' প্রভৃতি বিশেষণ বাঙলার আগে নির্দ্বিধায় দেওয়া হোত। 'পদসঞ্চার'-এ বাঙলার এই সমৃদ্ধির চিত্র উজ্জ্বল রেখায় ফুটে উঠেছে।* অর্থনৈতিক অবস্থা ভাল ছিল বলেই সাধারণ মানুষের সামাজিক জীবনযাপনে অসন্তোষ, ক্ষোভ, মারামারি ইত্যাদির কোন পরিচয় ঐতিহাসিকদের বর্ণনায় আমরা পাই না। ঐতিহাসিকদের বিবরণ থেকে জানা যায়, রাজস্ব আদায় এবং শৃঙ্খলা রক্ষা করাই ছিল রাজা এবং রাজকর্মচারীদের একমাত্র কাজ: "Collection of revenue and maintenance of law and order were then the only functions of the government and its employees." ["Bengal under Akbar and Jahangir"—T. K. Roychowdhuri] 'পদসঞ্চার'-এ বাঙলার এই অর্থনৈতিক চিত্রই স্পষ্ট।

বাঙলার সমৃদ্ধির মূলে ছিল তার বাণিজ্য, আর এই বাণিজ্যের পশ্চাতে ছিল তার কৃষি ও শিল্প। একদিকে সোনার ফসল, নানা ধরনের অঢেল খাদ্যশস্য, ফল-মূল-

* The prosperity and population of Gaud did not escape the notice of foreign travellers and cartographers. Writing before 1540 A. D., Joao de Barros observes, 'The streets are broad and straight and the main streets have trees planted in rows along the walls to give shade to the passengers....... A great part of the city consists of stately and well wrought buildings." ["Husain Shahi Bengal"—M. R. Tarafdar]

পানীয়, অপর দিকে তার শিল্পসম্ভার বিশেষতঃ রেশম ও বস্ত্র শিল্প। বিপ্রদাস, বিজয় গুপ্ত প্রভৃতির মনসামঙ্গল কাব্যগুলিতে বাঙলার বাণিজ্যের স্বর্ণচিত্র ছড়িয়ে আছে। বাঙলার বণিক—শেঠ-সদাগরের দল দূর সমুদ্রে এই বাণিজ্য-সম্ভার নিয়ে ভেসে পড়তেন 'হুসেন শাহী বাঙলা' গ্রন্থে শ্রীতরফদার, ঐতিহাসিক বারথেমার এ বিষয়ে বিবরণের কিছু কিছু উদ্ধৃতি সহ লিখেছেন :"Varthema refers, to 'the richest merchants' of the city of 'Banghella' together with its cotton and silk stuffs which used to 'go through all Turkey, through Syria, through Persia, through Arabia Felix, through Ethiopia, and through all India……Thus the foreign travellers have referred to the glory of the maritime commerce which Bengal possessed in the fifteenth and sixteenth centuries……"

আর, এই সমস্ত বাণিজ্যিক পণ্য উৎপাদন করতেন বাঙলার নানা শ্রেণীর শিল্পী। "Among the manufacturing classes the weavers and the workers in metal e. g,, the blacksmiths, the goldsmiths (who were also dealers in gold) and the manufacturers of bell-metal utensils (kansari) were the more important. In the long list given by Mukundarama, jewellers, carpenters, and manufacturers of conch-shell articles (Sankha-vanika) also appear along with the potter, the paper manufacturer (kagaji) and the cloth dyer (rangrej)… Later Tavernier saw at Dacca and Patna more than 2,000 persons occupied in the manufacture of stone toys meant for export." [T. K. Roychowdhuri]

'পদসঞ্চার'-এর শঙ্খদত্ত, তাঁর পিতা ধনদত্ত, পিতৃবন্ধু, রাজশেখর—এঁরা সবাই বিদেশী বণিকদের কাছে বাঙলার শেঠ রূপে সম্মানিত—এঁরা তদানীন্তন কালের বাঙলার বণিকদেরই প্রতিনিধি শ্রেণীর চরিত্র; ইতিহাসের পাতায় শঙ্খ দত্ত—রাজশেখরের নাম খুঁজে পাওয়া যদি না যায়ও এঁরা একদিক থেকে ঐতিহাসিক চরিত্র। বাঙলার সেই স্বর্ণময় বাণিজ্যের যুগটি এঁরাই ফুটিয়ে তুলেছেন। এঁদের বাণিজ্য সম্ভারের বর্ণনা করতেও ঔপন্যাসিক ভোলেন নি :

"চট্টগ্রামের বন্দর পার হয়ে শঙ্খ দত্তের বাণিজ্যবহর এগিয়ে চলল দক্ষিণ পাটনে।

"চার চারখানা বোঝাই ডিঙা। শুকনো লঙ্কা, মোম, লাক্ষা, আদা, হলুদ, চট, কাজকরা তামা-পিতলের বাসন, ঢাকাই মসলিন। চড়া দামে বিক্রী হবে কালিকট, কোচিন' আর গোয়ার বন্দরে। মাঝখানে রয়েছে বিচিত্র দেশ সিংহল—সেখানে আদার বদলে পাওয়া যায় মুক্তো, চটের বদলে হাতীর দাঁত।

"……বাঙালি বণিকের বহর। নিয়ে চলেছে পাটের কাপড়, গৌড়ের গুড়, ঢাকার শঙ্খবলয়, কস্তুরী; নিয়ে চলেছে সীমন্তিনীর সৌভাগ্য সিঁদুর, প্রচুর পরিমাণে আফিং

আর নানা সুগন্ধি। জাহাজ ভরে পণ্য যাচ্ছে—জাহাজ ভরেই ফিরিয়ে আনবে ঐশ্বর্য।” (এক, পরি.)

‘পদসঞ্চার’-এ এরূপ বাণিজ্যিক চিত্র আরও আছে।

চ. সমাজ, ধর্ম ও সংস্কৃতি : ধর্ম বাঙলীর জীবনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ।* পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ এবং ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম দশক পর্যন্ত বাঙলায় শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব, সহজিয়া, নাথ, বাউল, বৌদ্ধ প্রভৃতি নানা ধর্ম-সম্প্রদায়েরই মঙ্গল শঙ্খ বাজত, সন্ধ্যারতিতে বাধা ছিল না, পূজা পার্বণ হোত। হিন্দুর মন্দির, মুসলমানদের মসজিদ, বৌদ্ধদের সঙ্ঘ-মঠ নির্বিরোধেই পাশাপাশি বিরাজিত ছিল। ‘পদসঞ্চার’-এ ঔপন্যাসিক বাঙলার শান্ত-মধুর ধর্মীয় ছবিটি সুন্দর ভাবে বর্ণনা করেছেন : “আটচালা শিবমন্দির থেকে গম্ভীর শঙ্খধ্বনি ওঠে ; সকাল-সন্ধ্যায় ভক্তের আহ্বান ওঠে শাহী মসজিদ থেকে। বৌদ্ধ পূর্ণিমার দিনে দীপে-ধূপে আরতি চলে ‘গৌতম-চন্দ্রিমার’। গ্রামের বিষহরী তলা থেকে নূপুর আর খঞ্জনীর তালে তালে ছড়িয়ে পড়ে মনসার গান—তার রেশ এসে মিলে যায় দূরের নদীতে মাটির ভাটিয়ালী গানের সঙ্গে। দীপকে-মল্লারে-বসন্ত পঞ্চমে সুর বাজে আকাশে-বাতাসে, পাহাড়-নদী-অরণ্য পাখি মেঘ এক একটি বাদ্য যন্ত্রের মতো ঐকতান তোলে তার সঙ্গে সঙ্গে।” (পনেরো, পরি.)

তবে, একথা সত্য যে, হিন্দুদের মধ্যে তখনও স্বল্প সংখ্যক হলেও ব্রাহ্মণের প্রতাপ ছিল প্রচণ্ড। তাঁদের প্রতি ভয় ও ভক্তি উভয়ই ছিল সাধারণ মানুষের মনে। এই ব্রাহ্মণদের ছিল, মুসলমান বিদ্বেষ। এঁরা অধিকাংশই ছিলেন তান্ত্রিক অথবা শৈব-যোগী। পদসঞ্চারের সোমদেব ছিলেন সেই ব্রাহ্মণ্য তেজ ও তান্ত্রিকের প্রতিনিধি। তান্ত্রিকদের সাধন পদ্ধতি সম্পর্কে সাধারণ মানুষের মনে বিশ্বাস ক্রমশঃ হীনবল হয়ে আসছিল, পরিবর্তে ভীতি সঞ্চারিত হচ্ছিল। তাই এই সময় শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবে এবং তাঁর প্রেম ধর্ম প্রচারে হিন্দুর ধর্মজগতে এক নতুন আলোড়ন সৃষ্টি হ'ল : “Within Hinduism, the most active and vital force perhaps was the Neo Vaishnava movement which was now functioning as a militant proselytising creed. Within it, the Vaishnava Sahajiya movement with its strong Yogic-Tantric bias was being reborn in a fresh and somewhat unsavoury form. The Sakta-Tantric cult also was anything but moribund. Then, as now, it surely claimed the bulk of Bengal's population among its followers.” [T. K. Roychoudhuri]

* Throughout the mediaeval period, culture in Bengal was closely interlinked with the religious life of the people. In fact these were so inextricably dove tailed with each other that one must view the two as integral parts of one organic whole.” [“Bengal under Akbar and Jahangir” T. K. Raychaudhuri]

খোল-কর্তাল সহযোগে হরিনাম সংকীর্তন, জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে আম্বিজ চন্ডালে কৃষ্ণপ্রেম বিতরণ এবং প্রেমভাবে আলিঙ্গন, ধীরে ধীরে মুসলমান শাসক ও কাজির এই নবোত্থিত বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের প্রতি বিরুদ্ধ মনোভাব ত্যাগ, এবং হিন্দুর নাড়া-খাওয়া ধর্মবোধ আবার কোন এক সঞ্জীবন মন্ত্রে জাগ্রত হয়ে উঠল। এ সবকিছুর কেন্দ্রে যে মহাপুরুষটি বিদ্যমান, তিনি স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, রাধাভাবদ্যুতি মণ্ডিত নবদ্বীপের মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব, ওরফে নিমাই। তাঁর আবির্ভাবও যেমন সহসা, তাঁর ধর্মোন্মাদনার প্রভাব-বিস্তারও তেমনি দ্রুত। ক্ষয়িষ্ণু শক্তি ও ব্রাহ্মণ্য সম্প্রদায় তাঁকে প্রবলভাবে বাধা দিতে গিয়ে নিজেরাই কোনঠাসা হয়ে গেছেন। মথুরা বৃন্দাবন থেকে আসাম-বঙ্গ-উড়িষ্যার গোদাবরী তীর পর্যন্ত প্রেমের ঠাকুর শ্রীচৈতন্যেরই জয়-জয়াকার। বাঙালীর এই চৈতন্য-সংস্কৃতি ঐতিহাসিক ঘটনা,—সত্য। "শ্রীচৈতন্যের জন্মকালে গৌড়ের মসনদে অধিষ্ঠিত ছিলেন জালাল-উদ্-দিন আবু মুজাঃফর ফতে শাহ (১৪৮১-৮৭ খ্রীস্টাব্দ)। কিন্তু মহাপ্রভুর প্রকটকালের অধিকাংশ ভাগেই গৌড়ের সিংহাসনে সমাসীন ছিলেন ইতিহাস বিশ্রুত সুলতান আলাউদ্দিন আবুল মুজাঃফর হুসেন শাহ (১৪৯৪-১৫২৫ খ্রীস্টাব্দ)। মহাপ্রভুর প্রকট জীবনের বাকি ক'টি বছর হুসেন শাহের পুত্র নাশিরা শাহ অর্থাৎ নাসির-উদ্-দিন আবুল মুজঃফর নসরৎ শাহ (১৫২৫-১৫৩৩) সিংহাসনে ছিলেন। এই সময়ের মধ্যেই ১৫২৬ খ্রীস্টাব্দে ভারতে মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা বাবর ও ইব্রাহিম লোদীর মধ্যে ইতিহাস-প্রসিদ্ধ পাণিপথের প্রথম যুদ্ধ সংঘটিত হয়।…এর অল্পদিন পরে বাবরের পুত্র হুমায়ুণ বাদশাহের সঙ্গে শের-শাহের সংগ্রাম আরম্ভ হয়। হুমায়ুণ ও শেরশাহের সংগ্রাম গৌড়রাজ্য ও গৌড়ের বাদশাহিকে বিপর্যস্ত করেছিল।" ['শ্রীরাধাতত্ত্ব ও শ্রীচৈতন্য সংস্কৃতি' : কমলা বক্তৃতামালা—শ্রীজনার্দন চক্রবর্তী) শ্রীচৈতন্যদেবকে শুধুমাত্র ধর্মপ্রচারক বললে ভুল বলা হবে, তিনি ঐতিহাসিক পুরুষ। তিনি একটি যুগকে ধরে রেখেছেন, একটি নতুন সংস্কৃতি রচনা করেছেন। শ্রীচক্রবর্তী বলেছেন : "রাজনৈতিক আকাশের এই ঝড়-তুফানের মধ্যে শ্রীরাধার ভাবকান্তিময় চৈতন্যজীবনের আওতায় নাম-প্রেমাশ্রয়ী বৈষ্ণবসাধনা ও চৈতন্য সংস্কৃতি গৌড়বঙ্গ, উৎকল-দ্রাবিড়, মথুরা বৃন্দাবন, বারাণসী-প্রয়াগ, রাজস্থান-দ্বারবতীর একটি সুবৃহৎ ভাব-পরিমণ্ডলে, একটি যথার্থ বৃহত্তর বঙ্গে দানা বেঁধেছিল। সাধনভজন, শাস্ত্রালোচনা ভক্তিগ্রন্থরচনা, শ্রীচৈতন্য ও ভক্তপরিকরবৃন্দের তীর্থপরিক্রমা ও আন্তঃপ্রাদেশিক ভাববিনিময়, পদাবলী ও চরিতাখ্যান-রচনা, কীর্তন সঙ্গীতের উদ্ভব ও বিস্তার,—চৈতন্য-সংস্কৃতির সমস্ত বৈভবই এই ঘোরতর রাষ্ট্রবিপ্লবের যুগে প্রকাশিত হয়েছিল।"

শুধু চৈতন্যদেবই নন, তাঁকে কেন্দ্র করে আরও যাঁরা সেদিন এই নবভাব পরিমণ্ডল রচনায় অংশ গ্রহণ করেছিলেন, সেই অদ্বৈতাচার্য, নিত্যানন্দ মহাপ্রভু, স্বরূপ-দামোদর, বৃন্দাবনের ষড়গোস্বামীগণ, গোদাবরী তীরে মহাপ্রভুর সঙ্গে বৈষ্ণব তত্ত্বালোচনায় নিমগ্নচিত্ত, প্রফুল্লিত রায় রামানন্দ, এঁরা আজ প্রত্যেকেই ইতিহাসের ব্যক্তি।

'পদসঞ্চার' উপন্যাসে, বিরুদ্ধ ব্রাহ্মণ্যতেজ ও শক্তির শৃঙ্খল বিগলিত করে কেমন

করে দিব্যোন্মাদ-ভাব-বিভোর শ্রীচৈতন্যদেব তাঁর প্রেমাশ্রু প্রবাহিত ধারায় ধীরে ধীরে বঙ্গের ঘরে ঘরে এবং নীলাচলে তাঁর বিশিষ্ট আসনখানি পেতে নিয়েছিলেন, ঔপন্যাসিক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় তাকে বঙ্গের ঐতিহাসিক কাহিনীরই অঙ্গীভূত করে শিল্পরূপ দিয়েছেন। শ্রীচৈতন্যদেব, তাঁর ভক্ত শিষ্যবৃন্দ, তাঁর পদাবলী কীর্তন, এবং ব্রাহ্মণদের তাঁর প্রতি বিদ্বেষ, সেই যুগের ইতিহাসেরই ভাব পরিমণ্ডল রচনা করেছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ দু'একটি স্থান থেকে কিছু কিছু উদ্ধৃতি দেওয়া গেল ঃ

১. [শম্পা] "বণিক, আপনি গৌড়ের মানুষ। মহাপ্রভু চৈতন্যের নাম শুনেছেন নিশ্চয় ?

"......শঙ্খ দত্তের চোখ ক্রোধে আর অপমানে দপ্ দপ্ করে উঠল। —কে চৈতন্য ? নবদ্বীপের ওই উন্মাদটা ? —সোমদেবের ভয়ংকর হিংস্র মুখ শঙ্খ দত্তের চোখের সামনে ভেসে উঠল : একটা ভণ্ড, একটা বিকৃত বুদ্ধি—

দীপ্ত কণ্ঠে শম্পা বললে, আর নয় শ্রেষ্ঠী, আর আপনাকে প্রশ্রয় দেওয়া যায় না। পুরীর রাজা স্বয়ং যাঁর পায়ে মাথা নীচু করেছেন, আমার গুরু রায় রামানন্দ যাঁর সেবক, তাঁর সম্পর্কে একটি নিন্দার কথাও আর শুনতে চাই না আপনার মুখ থেকে।···
[নয় পরিঃ]

২. "মহাকালীকেই জাগানো দরকার। বৈষ্ণবের বিষাক্ত প্রভাব মুছে দিতে হবে দেশ থেকে। সোমদেবই ঠিক বুঝেছিলেন।

"পহিলহি রাগ নয়নভঙ্গ ভেল,
অনুদিন বাঢ়ল অবধি না গেল—"

শঙ্খ দত্ত উৎকর্ণ হয়ে উঠল। একটা সঙ্কীর্তনের দল আসছে। খোল করতালের শব্দে মুখরিত হচ্ছে পথ। দলের মাঝখানে নাচতে নাচতে আসছেন একটি মানুষ। চাঁপা ফুলের মতো উজ্জ্বল স্বর্ণাভ তাঁর গায়ের রঙ, কোমরে একটি গৈরিক কটিবাস ছাড়া আর কোনো আবরণ নেই। অপূর্ব সুপুরুষ মানুষটি। মুহূর্তের জন্য মুগ্ধ হয়ে রইল শঙ্খ দত্তের দৃষ্টি।

"ন সো রমণ না হাম রমণী
দুঁহ মন মনোভাব পেষল জানি—"

একটা নিবিড় আবেগের উচ্ছ্বাসে চকিতে আকুল হয়ে উঠল মন। অদ্ভুত সঙ্গীতের সুর—অদ্ভুত এই নাচ! যেন বুকের শিরা ধরে আকর্ষণ করে। আগুনের প্রলোভনে চঞ্চল পতঙ্গের মতো ওর মধ্যে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে ইচ্ছে হয়।

"এ সখি! সো সব প্রেমকহানী,
কানুধামে কহবি বিছুরহ জানি—"

পথের দুপাশে মন্ত্রমুগ্ধের মতো দাঁড়িয়ে আছে মানুষ। দেখছে এই ভাবাবেগের লীলা।" (ঐ)

৩. "—কিন্তু গুরুদেব—মালিনী দ্বিধাজড়িত গলায় বললে—যাঁরা চৈতন্যকে দেখেছেন তাঁরাই বলেন তিনি সহজ মানুষ নন। তাঁর কাছে যে যায়, সে-ই তাঁর কাছে মাথা নত করে। আশ্চর্য শক্তি আছে তাঁর।

"সোমদেবের রক্ত চোখে এবার ক্রোধ ঝল্সে উঠল : ও শক্তির নাম সম্মোহন-বিদ্যা। ওটা অনার্য প্রক্রিয়া—ওকে অভিচার বলে।

"……কিন্তু তা হলে লোকে এমন করে তাঁর দিকে আকৃষ্ট হচ্ছে কেন? কেন বৈষ্ণবের সংখ্যা বেড়েই যাচ্ছে দিনের পর দিন?" (ষোল, পরিঃ)

৪. "সুবর্ণ বণিক উদ্ধারণ দত্ত—ঐশ্বর্যের অন্ত নেই তাঁর, ঘরে তাঁর সুবর্ণের অক্ষয় ভাণ্ডার। দেশ-জোড়া তাঁর খ্যাতি। সেই উদ্ধারণ দত্ত ভাবের আবেগে নাচছেন উন্মত্ত হয়ে!

"এসো হে গৌরাঙ্গ এসো
এসো এসো শচীর দুলাল
এসো নদীয়ার চাঁদ
এসো এসো দীন-দয়াল—"

"এসেছেন বইকি নদীয়ার দুলাল; ভক্তদের ওপরে আবির্ভূত হয়েছেন তিনি। নাচতে নাচতে প্রায়ই দু-একজন মাটিতে লুটিয়ে পড়েছেন দশাগ্রস্ত হয়ে। শঙ্খ দত্তের সেই ব্যঙ্গাত্মক সংস্কৃত শ্লোকটা মনে পড়ল : 'কীর্তনে পতনে মল্ল-শরীর।' কিন্তু এই মুহূর্তে—ভাবের এই বন্যার সামনে সে তো পরিহাস করবার শক্তি খুঁজে পাচ্ছে না। বরং তার নিজের বুকেই ছলছলিয়ে উঠছে।

"দাঁড়িয়ে রইল শঙ্খ দত্ত। নিথর!

"ঘরে-বাইরে দু দিক থেকেই পরিবর্তনের পালা। সরস্বতীর জলে ক্রীশ্চান বণিকদের জাহাজগুলোর বিশাল গম্ভীর ছায়া; সপ্তগ্রাম-ত্রিবেণীতে ভক্তের কণ্ঠে চৈতন্যদেবের বন্দনা। সোমদেব একটা অতীত ইতিহাস।

চৈতন্যেরই জয় হল শেষ পর্যন্ত। মুছে গেলেন সোমদেব।" (পরি : ২৩)

উদ্ধৃতিগুলির মধ্য থেকেই স্পষ্ট বোঝা যাবে শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাব থেকে তিরোধানের মধ্যেই বাঙলায় শ্রীচৈতন্য প্রচারিত প্রেমধর্ম একটু একটু করে সকলের হৃদয়ই প্রায় জয় করে নিয়েছে, এবং ব্রাহ্মণ ও শাক্তরা স্ব-মহিমা থেকে বিচ্যুত হয়ে সাধারণ মানুষের মন থেকে অনেক দূরে সরে গেছেন। সুতরাং 'পদসঞ্চার'-এর সোমদেব,—যিনি প্রথমে শৈব-যোগী, পরে শাক্ত-তান্ত্রিক, চরিত্রের যে পরিণতি এই উপন্যাসে দেখানো হয়েছে, তা ব্যক্তির পরিণাম নয়, তাকে ঐতিহাসিক পরিণতিই বলা উচিত।

শঙ্খ দত্ত, রাজশেখর প্রমুখ তদানীন্তন কালে বণিককুল প্রধানতঃ ব্রাহ্মণ শৈব-যোগী সোমদেবের মতো গুরুকেই ভক্তি করতেন, মান্য করতেন; এবং তাঁরা নিজেরাও প্রধানতঃ শৈবপন্থী ছিলেন। মনসামঙ্গল কাব্যের চাঁদসদাগরও শৈব ছিলেন। ব্রাহ্মণদের তখনও সমাজে প্রভাব কিছু ছিল, সাধারণের ভক্তি-শ্রদ্ধাও তাঁরা পেতেন। বৈষ্ণব প্রেম-

ধর্মের মূতে বিস্তারে তাঁদের মহিমা একেবারেই বিলুপ্ত প্রায় হয়ে যায়। এই ব্রাহ্মণদের মুসলমান বিদ্বেষ, হিন্দুর রাজত্ব প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা—এ সবই ইতিহাস সমর্থিত ঘটনাবলী। সোমদেবকে তাই ঐতিহাসিক চরিত্রের সঙ্গে মিশিয়ে নিলে কালানৌচিত্য দোষ হয় না, যা কাল্পনিকতার অতিরিক্ত প্রশ্রয় বলা যাবে না। কেশব পণ্ডিত এবং উদ্ধারণ দত্ত যথাক্রমে শাক্ত ও শৈব হয়েও পরবর্তীকালে যে শ্রীচৈতন্যের প্রেমধর্মে দীক্ষিত হয়েছিলেন, এ-ও ঘটনা।

শৈব-শাক্ত-বৈষ্ণব ধর্ম ছাড়াও ব্রাহ্মণ কর্তৃক নিপীড়িত, বিলুপ্ত প্রায় বৌদ্ধদের প্রসঙ্গও বাঙলার ধর্মীয় ইতিহাসের উল্লেখ্য বিষয়। ঔপন্যাসিক আলোচ্য উপন্যাসে বৌদ্ধদের প্রতি ব্রাহ্মণদের সেই নিপীড়ন ও অত্যাচারের প্রসঙ্গও এনেছেন এক, ছয়, ষোল প্রভৃতি পরিচ্ছেদে। "একবার চন্দ্রনাথের সমুচ্চশীর্ষ মন্দিরে, আর একবার অরণ্যময় পাহাড়গুলির ওপর দিয়ে সোমদেব দৃষ্টি বুলিয়ে আনলেন। তারপর নীচু গলায় বললেন, এই চন্দ্রনাথের মন্দির, এই দেব-বিগ্রহ, এ হিন্দুর ছিল না।

"—সে কী কথা! —শঙ্খ দত্ত চমকে উঠল।

"—সত্যি কথাই আমি বলছি, আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই—সোমদেব আবার মন্দিরের চূড়োর দিকে তাকালেন: একদিন এই মন্দির ছিল বুদ্ধের—বৌদ্ধরা এইখানে এসে 'সম্মা-সম্বোধি' লাভ করত। আজ এখান থেকে বুদ্ধের বিসর্জন হয়ে গেছে—হিন্দুর দেবতা এইখানে বিছিয়েছেন তাঁর আসন। বেদ-নিন্দুকের দল যেমন একদিন বাংলাদেশ থেকে নির্বাসিত হয়েছে, তেমনি করে এই পাঠান-মোগলও যাবে। আর তারপরে হিন্দুর হিন্দুত্ব আমরা ফিরিয়ে আনব—ফিরিয়ে আনব তার বেদোজ্জ্বলা সভ্যতা।" (এক পরিঃ)

"পদসঞ্চার" উপন্যাসে বাঙলার এই ধর্মীয় পটভূমিকা এবং পরিমণ্ডলকে পরিপূর্ণ করে তুলতে ঔপন্যাসিক দু'একটি ধর্মীয় প্রথা-সংস্কারের কাহিনীও সংযুক্ত করেছেন। যেমন, রাজশেখর-সুপর্ণা ও শঙ্খ দত্ত নৌকা করে তীর্থে তীর্থে ভ্রমণ করতে বেরিয়েছেন কৃতপাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্য। এই ভাবেই তাঁরা একদিন গঙ্গাসাগরে এসে উপনীত হন: "গঙ্গাসাগরে তীর্থস্নানে চলেছেন রাজশেখর শ্রেষ্ঠী।

"এই তিন বছর ধরে বহু তীর্থই পরিক্রমা করেছেন। বহু দেবতার মন্দিরে হত্যা দিয়েছেন—ফেলেছেন বহু চোখের জল। হাজার হাজার মোহর ব্যয় করেছেন পুজো দেওয়া পাপের স্খালনের জন্য। ধর্মভীরু হিন্দুর সুপ্রাচীন কালের সংস্কার। গঙ্গাসাগর তীর্থের সৃষ্টির পেছনে যে পৌরাণিক কাহিনী কপিলমুনিকে নিয়ে গড়ে উঠেছে তারও সংক্ষিপ্ত পরিচয় ঔপন্যাসিক দিতে ভোলেন নি। স্থানের ভৌগোলিক সীমা হারিয়ে গেছে। অতীত এসে বর্তমানের হাত ধরেছে; কালের গণ্ডীও তাই মুছে গেছে। এই স্থান ও কালের গর্ভ থেকে যে প্রথা একদিন জন্মলাভ করে, গণ্ডী যখন মুছে যায়, তখন সেই প্রথাই হারিয়ে যেতে দেয় না অতীতকে। মানত রক্ষার্থে সাগরে সন্তান দেওয়া, স্বামীর চিতায় প্রাণ দেওয়া—প্রভৃতি প্রথাগুলি ধর্মীয় ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়—মূলে আছে পুণ্যলাভ স্বর্গলাভ ইত্যাদি। আলোচ্য উপন্যাসেও শ্রীপুরের ছোট রানীর গঙ্গাসাগরে সন্তান দেওয়াকে

কেন্দ্র করে সেই যুগের প্রথাটির পূর্ণাবয়ব চিত্র ঔপন্যাসিক দিয়েছেন। এ প্রথা হয়তো বঙ্গেই প্রচলিত ; কিন্তু নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ইতিহাস চেতনায় যে সুবিস্তৃত দেশ ও অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ-এর সম্মিলনে যে মহাকাশ-এর ছবি আছে তারই প্রেরণায় প্রথার ক্ষেত্রেও তিনি বঙ্গের বাইরে ভারতের দক্ষিণাঞ্চলে যে দেবদাসী প্রথা আছে, অথবা উৎকলের বিবাহ প্রথা ইত্যাদির ছবিও এঁকেছেন "পদসঞ্চারে"।

এইভাবে ঐতিহাসিক এবং আধা-ঐতিহাসিক কাহিনী, ঘটনা, চরিত্র, যুদ্ধ-বিগ্রহ, ধর্মপ্রথা, সংস্কার, দেশের অর্থনৈতিক সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা, কৃষ্টি ও সংস্কৃতির পরিচয় সব মিলিয়ে মহাকাব্যোপম এক বিশাল ভাবপরিমণ্ডল সৃষ্টি করেছেন ঔপন্যাসিক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় "পদসঞ্চার" উপন্যাসে। একটি বিশেষ ভৌগোলিক সীমার ঘটনা কাহিনী হয়েও একটু একটু করে ভূগোলের সীমারেখা হারিয়ে গেছে মহাদেশে, যেখানে নানা দেশের, নানা ধর্মের, নানা বর্ণের মানুষ এসে এক মহামানবের মিলন ক্ষেত্র রচনা করেছে।

কিন্তু শুধুমাত্র ঐতিহাসিক এবং আধা-ঐতিহাসিক কাহিনী ও চরিত্র থাকার জন্যই "পদসঞ্চার" ঐতিহাসিক উপন্যাস নয়। এর একটা উপন্যাসেরও অংশ আছে। শিল্পীর কল্পনাই সেখানে বিধাতা পুরুষ। শঙ্খ দত্ত, শম্পা সুপর্ণাকে নিয়ে একটি কাল্পনিক জীবনবৃত্ত ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে। মানুষের জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা-স্বপ্ন, তার ব্যথা-বেদনা ব্যর্থতা-হতাশার কাহিনীধারা ইতিহাস-কাহিনীর পাশে পাশেই প্রবাহিত।

উপন্যাসের কাল্পনিক কাহিনী :

শঙ্খ দত্ত বাঙলার ধনী বণিক, উদার, খুবই রোমাণ্টিক। আর পাঁচজন বন্ধুর মতো বিবাহ-ঘরসংসার করেই নিজেকে জগৎ থেকে গুটিয়ে নেন নি তিনি। দুরন্ত সাগর পাড়ি দেওয়ার উৎসাহ তাই অফুরন্ত। অজানার সন্ধানে বেরিয়ে পড়ার রোমাণ্টিক নেশায় বিভোর। পথের বিপদ-আপদ তাঁর যৌবনধর্মী এ্যাডভেঞ্চারাস মনকে নিবারিত করতে পারে না। সুতরাং হার্মাদদের দস্যুতাকে তিনি তুচ্ছ করে দক্ষিণ পাটনে বেড়িয়ে পড়েন।

হার্মাদদের দস্যুতার কাহিনী, গুরু সোমদেবের আশীর্বাদ, হিন্দুর রাজত্ব প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা, মুসলমান শাসক ও আগন্তুক পর্তুগীজ বণিকদের সম্বন্ধে সাবধান-বাণী উচ্চারণ—প্রভৃতির মধ্য দিয়ে শঙ্খ দত্তের সঙ্গে ইতিহাস-কাহিনী ও ঘটনার যোগাযোগের পথ প্রস্তুত হয়।

অতঃপর দক্ষিণ পাটনে বাণিজ্যে যাওয়ার পথে জগন্নাথধাম পুরীতে এসে নামলেন শঙ্খ দত্ত। উদ্ধব পাণ্ডার আমন্ত্রণে ও ব্যবস্থায় মধ্যরাত্রে দারু ব্রহ্মের সামনে দেবদাসীর অনাবৃত তনুর নৃত্যছন্দ এবং মাদকতা শঙ্খ দত্তের সমস্ত শরীরে, মস্তিষ্কের স্নায়ুকোষে কামনার তীব্র আবেগ সৃষ্টি করল। তাকে দেখার, তার সঙ্গে কথা বলার এবং তাকে পাওয়ার চিন্তায় শঙ্খ দত্ত তাঁর আদর্শ, উদ্দেশ্য সবকিছু হারিয়ে নেশাগ্রস্তের মতো হয়ে উঠলেন। শেষ পর্যন্ত দুঃসাহসে ভর করে শঙ্খ শম্পার আবাসকক্ষে নিভৃতে কথা বলার সুযোগও করে নিলেন। রামানন্দজীর শিষ্যা, শ্রীচৈতন্যের ভক্তা, এবং শ্রীকৃষ্ণে

সমর্পিতপ্রাণা দেবদাসী শম্পা বণিক শঙ্খ দত্তকে সাবধান করে দিলেন, এবং তাঁকে পাওয়ার মিথ্যা আশা ত্যাগ করতে বললেন। অর্থ-আভিজাত্য এবং সর্বোপরি তীব্র কামনা বিষে জর্জরিত শঙ্খ দত্ত হিতাহিত জ্ঞানশূন্য এক আসুরিক শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তির সাহায্যে শম্পাকে হরণ করে নিজ মধুকর ডিঙ্গায় তুললেন।

কিন্তু হাতের মুঠোর মধ্যে পেয়েও শঙ্খ দত্তের মনুষ্যত্ব এবং বিবেক তাঁর পশুশক্তির প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াল—তাঁকে স্পর্শমাত্র করতে পারলেন না তিনি। ঈশ্বরের ধন ঈশ্বরই ফিরিয়ে নিলেন সম্ভবতঃ। হঠাৎ ভেসে এলেন সেখানে কোয়েলহো এবং ভ্যাসকনসেলস। তাঁদের কামানের গোলায় শঙ্খর বহর ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে সমুদ্রতলে হারিয়ে গেল। শঙ্খ দত্ত এবং শম্পা কে কোথায় ভেসে গেলেন!

এর পর চার বছর অতিক্রান্ত। ইতিহাসের কাহিনী পরিণতির পথে এগিয়ে এসেছে অনেকখানি। বাঙলার রাজনৈতিক আকাশে মেঘ জমছে ঝঞ্ঝার তাণ্ডব বুকে নিয়ে। শ্রেষ্ঠী রাজশেখর চিন্তাশক্তি রহিত এবং বাক্‌শক্তিহীন কন্যা সুপর্ণাকে নিয়ে তীর্থে তীর্থে ঘুরে বেড়াচ্ছেন পাপস্খালনের জন্য—কন্যার আরোগ্যের জন্য। গঙ্গাসাগরের পথে চলেছেন তিনি। দ্বিপ্রাহরিক স্নানাহারের জন্য একটি স্থানে নোঙর করতেই সাক্ষাৎ হল শঙ্খ দত্তের সঙ্গে। সেই ভয়ঙ্কর বিপর্যয়ের রাত্রির পর চার বছর পার হয়ে গেছে। চেহারায় বন্য ছাপ।

এখন থেকে নায়ক শঙ্খ দত্তের জীবন একটি নির্দিষ্ট গতির ছন্দে বাঁধা পড়ল। ছিন্নমুণ্ড গঞ্জালোর যে বীভৎস দৃশ্য দেখে সুপর্ণার স্মৃতিভ্রংশ হয়েছিল, বাকশক্তি রহিত হয়ে ছিলেন তিনি সেই সুপর্ণার মুখে কথা ফোটানোর দায়িত্ব নিলেন তিনি। অনাবৃতা শম্পার রূপাকর্ষণ একদিন যে শঙ্খের শরীরে কামের বিষ ছড়িয়ে দিয়েছিল, আজ তা স্নিগ্ধ প্রেম হয়ে ঝরে পড়তে চাইল সুপর্ণার মধ্যে। সুতরাং চলল একক প্রেমের সাধনা।

এক বিভীষিকাময় দৃশ্য সুপর্ণার চিন্তাশক্তি ও বাক্‌শক্তিকে বিকল করে দিয়েছিল: গঙ্গাসাগরে এসে হাঙ্গরে খাওয়া এক শিশুর অনুরূপ বীভৎস মুখের দৃশ্য প্রতিআঘাত করে সেই রুদ্ধবাক্‌ ও চিন্তার দুয়ার একটু ভেঙ্গে দিয়ে গেল। সুপর্ণাকে নিয়ে এলেন শঙ্খ দত্ত নিজ গৃহে।

বিবাহের মধ্য দিয়ে শঙ্খ-সুপর্ণার প্রত্যাশিত মিলন ঘটল। কিন্তু সুপর্ণার মনের জগৎটি তখনও প্রেমের আলোক শিখায় উদ্দীপিত হয়ে ওঠে নি। শঙ্খের সাধনায় অবশেষে একদিন দুটো প্রাণ একই সুরে ও ছন্দে বেজে উঠল। আমি-তুমির বাধা সরে গিয়ে আমাদের হয়ে উঠল, নবীন শিশুর পদসঞ্চারে।

শঙ্খ-শম্পা-সুপর্ণাকে নিয়ে প্রেমের এই কল্পিত রোমাণ্টিক কাহিনীটিই "পদসঞ্চার"-এর উপন্যাস অংশ। ডি-মেলো খোদাবক্স খাঁ—মামুদ শাহ, শের খাঁ-এর ইতিহাস কাহিনীর সঙ্গে আলোচ্য উপন্যাস কাহিনীটিকে শিল্পী অসাধারণ নৈপুণ্যের সঙ্গে এমন-ভাবে বুনেছেন যেন টানাপোড়েনের সুতোয় বোনা একটি বস্ত্র হয়ে উঠেছে। সুতরাং "পদসঞ্চার" যে সার্থক ঐতিহাসিক উপন্যাস এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

পাঁচ

পরিচ্ছেদ শিরোনাম প্রসঙ্গ

আরও একটি বিষয়ের সংক্ষিপ্ত আলোচনা করে "পদসঞ্চারে"র ঐতিহাসিক উপাদান প্রসঙ্গের সমাপ্তি টানবো। গ্রন্থের প্রারম্ভে 'লেখকের কথা'-য় নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় জানিয়েছেন, 'লুসিয়াদাসের' পর্তুগীজ উদ্ধৃতিগুলি পল্লবগ্রাহিতা। প্রায় অধ্যায়েরই পর্তুগীজ শীর্ষোক্তিগুলির বাচ্যার্থ অধ্যায়ের মধ্যেই বলে দেওয়া হয়েছে। গ্রন্থারম্ভেই যে 'কথামুখ' অংশটি কাহিনীর ভূমিকারূপে দেখা দিয়েছে, লেখক জানিয়েছেন, সেটি ভাস্কো-ডা-গামার সহযোদ্ধা কবি ক্যামোয়েন্‌স্‌-এর "লুসিয়াদাস" কাব্যগ্রন্থটির বিবরণীকে ভিত্তি করেই রচিত। তৎপরবর্তী 'এক' থেকে 'তেইশ' পরিচ্ছেদ পর্যন্ত প্রত্যেকটির শীর্ষে "লুসিয়াদাস" কাব্য থেকে একটি করে পঙ্‌ক্তি, বা কয়েকটি শব্দ উৎকলিত হয়েছে: কেন? লেখক বলেছেন, 'পল্লবগ্রাহিতা'। কথাটি অংশত সত্য মাত্র। নিছক পল্লবগ্রাহিতা বুঝেও এই উদ্ধৃতিগুলি তিনি দিলেন কেন? পাণ্ডিত্য প্রদর্শনের লোভে? তা তো নয়। এগুলির শিল্পগত একটা তাৎপর্য আছে। কী সেটা?

ক্যামোয়েন্স ভাস্কো-ডা-গামার সঙ্গে ভারতে এসেছিলেন; তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন। তাঁর আর এক পরিচয়—তিনি কবি, তিনি তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার বিবরণী তুলে ধরেছেন "লুসিয়াদাস"—এই মহাকাব্যোপম গ্রন্থে। অতএব তাঁর বর্ণনা ইতিহাসের নিছক তথ্য বা কাহিনী মাত্র নয়—সময়ের ক্রমানুসারে সাজানো; প্রত্যক্ষদর্শীর বর্ণনায় অভিজ্ঞতার ছাপ আছে, জীবনের উষ্ণতা আছে, আবেগ আছে। বর্ণনাগুলি সজীব। "পদসঞ্চার" ইতিহাসের সালতামামি নয়, শুষ্ক ইতিহাসের ঘটনাবলীর বিবরণ মাত্র নয়, তদতিরিক্ত জীবনের আবেগ-উষ্ণতা মণ্ডিত, আশা-আকাঙ্ক্ষা সম্বলিত এক বস্তুও এখানে আছে। "পদসঞ্চার" ঐতিহাসিক উপন্যাস। প্রত্যেকটি পরিচ্ছেদের শীর্ষে প্রত্যক্ষদর্শীর জীবন-অভিজ্ঞতার একটা টুকরো বসিয়ে দিয়ে ঔপন্যাসিক ইতিহাসের শুষ্ক বিবরণকে জীবন রসে সিঞ্চিত করতে চেয়েছেন মনে হয়।

পরিচ্ছেদ-শীর্ষের এই উদ্ধৃতিগুলির ভিন্নতর তাৎপর্যও থাকা সম্ভব। এই ধরনের উদ্ধৃতিকে ইংরাজীতে **'epigraph'** বলা হয়। 'এপিগ্রাফে'র ব্যবহার নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় যে প্রথম করলেন তা নয়—স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্রই তাঁর বহুপূর্বে বাঙলা

উপন্যাসের অধ্যায়-শীর্ষে বা পরিচ্ছেদ শীর্ষে বিভিন্ন কবি-শিল্পীর—স্বদেশী, বিদেশী—কাব্য নাটক প্রভৃতি থেকে উদ্ধৃতি গেঁথে দিয়েছেন। ইংরাজী সাহিত্যেও এ রীতির পরিচয় মিলবে। উদাহরণ স্বরূপ, স্যার ওয়াল্টার স্কট। অধ্যায় বা পরিচ্ছেদগুলি পাঠ করার শুরুতেই এমন একটি রচনাংশের চয়ন শিল্পী করেন, যার মধ্যে সমগ্র অধ্যায়টির নীতিবাক্য রূপে, কিংবা অধ্যায়টির সারাৎসার ব্যক্ত করে, তার প্রকৃত তাৎপর্য ঐ চয়নের মধ্যেই প্রকাশিত হয়। সাধারণভাবে একটি অধ্যায় বা পরিচ্ছেদে শিল্পীর মনোগত অভিপ্রায় তাঁর ভাব বা তত্ত্বটি প্রকাশ করা যেখানে কঠিন কিংবা পাঠকের পক্ষে নির্ধারণ করা দুরূহ, সে ক্ষেত্রে এই sub-titles বা উপ-শিরোনামগুলির কাজ হ'ল ঘটনা কাহিনীর ভাব ও অভিপ্রায় গুলির মধ্যে একটা অন্তর্গূঢ় যোগ রচনা করা, এবং শিল্পীর ভাবনা ও জীবনদর্শনটি একটি অবিচ্ছিন্ন গতিতে প্রবাহিত করে দেওয়া।

ঐতিহাসিক উপন্যাসে শুধু ইতিহাসের ঘটনা-কাহিনীর বিবরণটি থাকলেই চলে না, ঔপন্যাসিককে তাঁর শিল্পে-গৃহীত-ইতিহাস-যুগের একটি ভাবপরিমণ্ডলও সৃষ্টি করতে হয়। অনেক সময় এই **'epigraph'** সেই ভাব পরিমণ্ডলটি রচনা করতে সাহায্য করে। অবশ্যই তা নির্ভর করে শিল্পীর চয়ন ও গ্রন্থন নৈপুণ্যের ওপর।

সর্বোপরি অধ্যায় বা পরিচ্ছেদের শিরোনাম স্বরূপ উদ্ধৃতিগুলির দুটি সূক্ষ্ম কাজ মনস্ক পাঠকের দৃষ্টি এড়াবে না। প্রথমটি হ'ল—একটি কাব্যিক, বা কোথাও কোথাও 'লিরিক'-সুরমূর্চ্ছনা অলক্ষ্যে কাহিনীর ওপর এমন একটি কল্পনার রেশ ছড়ায়, যা লেখকের বক্তব্যকে বাস্তবের স্থূলতা, রূঢ়তা থেকে মুক্ত করে, কাব্য-সৌন্দর্যের মায়াঞ্জন পরিয়ে দেয়। দ্বিতীয়ত, লেখকের কবি-মনটি যেখানে শিল্পাঙ্গিকের খাতিরে বাস্তবের বস্তুভারে আবদ্ধ, সেখানে শিরোনামের উৎকলিত অংশে যে কাব্যিক মূর্চ্ছনা, বা মায়াময় সৌন্দর্যের অভিব্যঞ্জনা থাকে, সেটি লেখকের কবি-মনেরই পরোক্ষ কল্পনা ; ঐ সুরময়, মায়াময় সৌন্দর্যের প্রতি তাঁরও যে গভীর আকর্ষণ আছে সূক্ষ্মভাবে তার স্বাক্ষর এই উদ্ধৃতিগুলির মধ্যে থেকে যায়। অর্থাৎ লেখকের কবি-মনের একটি পরিচয় পাঠক এই চয়নগুলির মধ্য থেকেও অন্বেষণ করতে চাইলে পেতে পারেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের "কপালকুণ্ডলা" বা স্কটের "দি ব্রাইড অফ লামারমুর" কিংবা "আই-ভানহো" যে কোন একটি উপন্যাসের কয়েকটি উপ-শিরোনাম দৃষ্টান্ত রূপে গ্রহণ করা যেতে পারে। প্রত্যেকটি উপন্যাসের প্রত্যেক পরিচ্ছেদের শীর্ষে বিখ্যাত কবি-শিল্পীর রচনাংশ উদ্ধৃত করা হয়েছে **'epigraph'** রূপে। উদ্ধৃতিগুলি কোথাও পরিচ্ছেদটির **'gist'** বা 'সারাৎসার'-এর মতো, কোথাও শিল্পীর অভিপ্রায় ব্যক্ত করেছে, কোথাও বক্তব্যের ওপর কাব্যিক সুর-মূর্চ্ছনায় একটি অভিনব সৌন্দর্য সৃষ্টি করেছে। কোথাও বা বিশেষ যুগীয় ভাবপরিমণ্ডল রচনার চেষ্টা।

'দি ব্রাইড অফ ল্যামারমুর'-এর বেশ কয়েকটি পরিচ্ছেদের শীর্ষে স্কট **'Old Song'** বা **'Old Ballad'** থেকে কয়েক ছত্র উৎকলন করেছেন। এই উপন্যাসে ঔপন্যাসিক

স্কট সপ্তদশ শতাব্দীর শেষার্ধের ইংলণ্ড-স্কটল্যাণ্ডের গ্রাম ও শহর জীবনের চিত্র উপস্থাপিত করেছেন; তখনকার সম্ভ্রান্তবংশীয় ও রাজপুরুষদের আচার-আচরণ, রীতি-নীতি, রুচি প্রভৃতির মধ্য দিয়ে যুগমানসের ছবি ফুটিয়ে তুলেছেন। তার আবহাওয়া বা যুগাবস্থার চিত্র রচনা করতে মাঝে-মাঝেই তিনি তাঁর 'motif' বা উদ্দেশ্যের ও বক্তব্যের ওপর একটি প্রাচীনতার গন্ধ মাখিয়ে দিতে চেয়েছেন।

প্রথম পরিচ্ছেদের epigraph 'Old Song' থেকে গৃহীত ক'টি পঙ্‌ক্তি :

"By cauk and keel to win your bread,
Wi' Whigmaleeries for them wha need,
Whilk is a gentle trade indeed
To carry the gaber lunrie on".

প্রথম পরিচ্ছেদের বক্তব্য বিষয়টি হ'ল—লেখক পিটারের জনৈক চিত্রশিল্পী বন্ধু ডিক্ টিন্‌টো অনেক চেষ্টা করেও জীবনে প্রতিষ্ঠা পেলেন না, তাঁর চিত্র-শিল্পের মূল্য কেউ দিলেন না। ফলে একদিন তিনি যশ-প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্র থেকে হারিয়ে গেলেন। তাঁর সঙ্গে একবার লেখকের চিত্র ও রচনা বিষয়ে আলোচনা হয়। সেই আলোচনার প্রসঙ্গক্রমেই টিন্‌টো তাঁকে একটি চিত্রের বিষয়কে কথা-সাহিত্যে রূপ দিতে অনুরোধ করেন। চিত্রের বিষয়টি একটি প্রাচীন ঐতিহাসিক কাহিনী সম্বলিত স্থানের। তার সঙ্গে কিছু তথ্যও তিনি বন্ধুকে দিলেন। ল্যামারমুর পাহাড়ের এলিজাবেথ যুগের ঐতিহাসিক কাহিনীর তথ্য। বর্তমানে র‍্যাভেনসউড দুর্গের যে ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়, তারই ইতিহাস। বন্ধুর সেই পাণ্ডুলিপি থেকেই বর্তমান উপন্যাসের জন্ম। সুতরাং প্রথম পরিচ্ছেদে উপন্যাসটির উৎস যে প্রাচীন ইতিহাস কাহিনী তারই প্রসঙ্গ উত্থাপন করা হয়েছে। 'Old Song'-এর ছত্র ক'টির প্রাচীন কথ্য রীতি ভাষার সাহায্যে একদিকে যেমন অতীতের আমেজ আনার চেষ্টা, অপরদিকে ব্যর্থ শিল্পী টিন্‌টোর অর্থোপার্জনের কাহিনীটিব একটি 'gist' রূপে দেখা দিয়েছে।

আবার চতুর্থ পরিচ্ছেদের শীর্ষে উৎকলিত হয়েছে কবি Spencer-এর 'ফেয়ারী কুইন'-এর কয়েকটি ছত্র :

Through tops of the high trees she did descry
A little smoke, whose vapour, thin, and light,
Reeking aloft, uprolled to the sky,
Which cheerful sign, did send unto her sight,
That in the same did wonne living wight".

এই পরিচ্ছেদে র‍্যাভেনসউড দুর্গের বর্তমান রাজনীতিক, আইন-ব্যবসায়ী মালিক লর্ড কীপার অ্যাসটনকে নিয়ে তাঁর পরমা সুন্দরী কন্যা লুসী বনপ্রকৃতির সৌন্দর্যের মধ্য দিয়ে পাহাড়ের নিম্নে বৃদ্ধা এলিসের কুটীরে এলেন। পরিশেষে বৃদ্ধা এলিস,

লর্ড কীপারকে র‍্যাভেন্‌স্‌উড বংশীয়দের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে দু'একটি সাবধানতার কথা শোনালেন। সমগ্র পরিচ্ছেদটির বক্তব্যের ওপর ছড়িয়ে আছে কবি স্পেন্সারের চিত্রধর্মী রোমান্টিক সৌন্দর্যের এমন একটি রেশ যা কাহিনীতে বর্ণিত বনপ্রকৃতির মধুর সৌন্দর্যের ভাবটিকে মর্মরিত করে স্কটের কবি মনটিরও ইঙ্গিত দেয়।

পঞ্চম পরিচ্ছেদের sub-title শেক্‌সপীয়রের রচনাংশ :

Is she a Capulet ?
O dear account ! my life is my foe's debt".

আলোচ্য পরিচ্ছেদে বর্ণিত হয়েছে বৃদ্ধা এলিসের কুটীর থেকে ফেরার পথে কি ভাবে জঙ্গলের মধ্যে পিতা ও পুত্রী আরণ্য ষণ্ডের আক্রমণে নিশ্চিত মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে এলেন। যিনি জীবন রক্ষা করলেন, তিনি লর্ড কীপারের শত্রু—র‍্যাভেন্‌স্‌উড দুর্গের পূর্ব মালিক র‍্যাভেন্‌স্‌উডেরই পুত্র মাস্টার র‍্যাভেন্‌স্‌উড। কিন্তু শিরোদেশস্থ উক্তিটি এখানে শুধুমাত্র পরিচ্ছেদ-নির্যাসই ব্যক্ত করে না ; এতদ্‌-অতিরিক্ত শিল্পীর গভীর উদ্দেশ্য এবং কাহিনীর ভবিষ্যৎ গতি সম্পর্কেও এক ঝলক বিদ্যুতালোক ছড়িয়ে পাঠককে পরবর্তী ঘটনা সম্পর্কে কৌতূহলী করে তোলে। উক্তিটি উপন্যাসের বিবরণধর্মী কাহিনীতে একটি নাট্যিক গতি ও চমক এনেছে।

তদ্রূপ, বিংশতি পরিচ্ছেদের সূচনাতে পাই কবি ওয়ার্ডসওয়ার্থের কয়েকটি ছত্র :

"Lovelier in her own retired abode
—than Naiad by the side
Of Grecian brook—or Lady of the Mere
Lone sitting by the shores of old romance."

আলোচ্য পরিচ্ছেদে মাস্টার র‍্যাভেনসউড ও লুসীর হৃদয় বিনিময়ের মধ্যে রোমান্টিক প্রেমের সৌরভ কবি ওয়ার্ডসওয়ার্থের পঙ্‌ক্তি কয়টির গীতিসুর মূর্ছনারই যেন বাণীরূপ।

এইভাবে বঙ্কিমচন্দ্রের 'কপালকুণ্ডলা' এবং অন্য যে কোন উপন্যাসের পরিচ্ছেদগুলির শিরোনামের শিল্পগত তাৎপর্য বিশ্লেষণ করে দেখানো যায়। "পদসঞ্চার" উপন্যাসে শিল্পী নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় প্রত্যেকটি পরিচ্ছেদের শীর্ষে কবি ক্যামোয়েন্সের "লুসিয়াদাস" কাব্যগ্রন্থ থেকে এক-আধটি ছত্র গেঁথে দিয়েছেন। লক্ষণীয় বিষয় হ'ল, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় পূর্বসূরীদের প্রদর্শিত পথে বিভিন্ন কাব্য-নাটক-গল্প-প্রবন্ধের উক্তি চয়ন না করে, শুধুমাত্র 'লুসিয়াদাস' থেকেই উদ্ধৃতিগুলি গ্রহণ করেছেন। ফলে, একটি বিশেষ সময়ের প্রেক্ষাপটে লেখা ঐতিহাসিক কাব্যটির ছত্রগুলি উপন্যাসে গৃহীত যুগের ইতিহাসের ভাবমণ্ডল রচনায় যেমন সাহায্য করেছে, তেমনি কবি এই ইতিহাস-কাহিনীর একজন প্রত্যক্ষদর্শী হওয়ায়, ঘটনা বা বিবরণগুলির ওপর তাঁর ভাবাবেগ, কল্পনা, অনুভূতি, অভিজ্ঞতার উষ্ণতা স্পর্শে ইতিহাসের শুষ্ক কাহিনী ও ঘটনাকে জীবনরসে

জারিত করে। আলোচ্য উপন্যাসে epigraph-রূপী এই ছত্রগুলির কয়েকটি ব্যাখ্যা করলেই এগুলির শিল্পগত তাৎপর্য স্পষ্ট হয়ে উঠবে। তবে এই প্রসঙ্গেই উল্লেখ করতে হয় যে, ঔপন্যাসিক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় 'লুসিয়াদাস' থেকে ছত্র শুধুমাত্র পরিচ্ছেদ শীর্ষেই ব্যবহার করেন নি—পরিচ্ছেদের মধ্যে কাহিনী ও ঘটনার গতির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে প্রয়োজনবোধে যুক্ত করে দিয়েছেন, কোথাও যুগীয় ভাব বা যুগ-মানসটি ফুটিয়ে তুলতে, কোথাও বিদেশীর চোখে ভারত বা বঙ্গের চিত্র, সৌন্দর্য বৈশিষ্ট্যকে এমন একটি রেখায় অংকন করতে, যাতে ঐতিহাসিক ও শিল্পী হিসেবে তাঁর নিরপেক্ষতাটি পাঠকের চোখে পড়ে।

আরও একটি তথ্য অনুসন্ধিৎসু পাঠকের গোচরে আনতে চাই। প্রতিটি পরিচ্ছেদের শিরোদেশে যে পর্তুগীজ উদ্ধৃতিগুলি (ক্যামোয়েন্সের 'অস লুসিয়াদাস' কাব্যগ্রন্থ থেকে) মুদ্রিত আছে সেগুলি উদ্ধৃতি চিহ্নের মধ্যে বোধ হয় না থাকাই বিধেয়—কারণ original text-এর সঙ্গে তার যথাযথ মিল খুঁজে পাই নি। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই মনে হয়েছে, স্থান বিশেষে কবির মূল ভাব বা বক্তব্যটিরই নির্যাস পর্তুগীজ ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে। যদি কোন পাঠক বা গবেষক পর্তুগীজ উদ্ধৃতিগুলি নির্ণয় করে দেন তবে পাঠক হিসেবে আমি তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ থাকব। যথাযথ উদ্ধৃতির প্রশ্ন ছাড়াও মুদ্রিত উপন্যাস গ্রন্থে বেশ কিছু উদ্ধৃতির বানান ভুলও আছে—original text বইটির সঙ্গে মিলিয়ে দেখলেই বোঝা যাবে।

'কথামুখ' অংশের sub-title হিসাবে মুদ্রিত গ্রন্থে* পাই "Quim to trouxe aqua ?"—মূল গ্রন্থের** সঙ্গে মিলিয়ে দেখলে বানান ভুলও চোখে পড়বে এবং উদ্ধৃতিটিও যথাযথ মনে হবে না : "Quem te trouxe a est' outro mundo..." পঙ্‌ক্তিটির ইংরাজী অনুবাদ (অনুঃ J. J. Aubertin) : "What brings thee to this other world,..." উপন্যাসে কালিকটের জামোরিন (রাজা) তাঁর সভায় ভাস্কো-ডা-গামার নেতৃত্বে তেরজন সঙ্গীসহ উপস্থিত ক্রীশ্চানদের উদ্দেশ্য করে বললেন : 'কী চাও তোমরা ?' উপন্যাসস্থ 'aqua' শব্দটি মূলে পাওয়া যায় না। শব্দটি শুদ্ধ কিনা যথেস্ট সন্দেহ আছে। সম্ভবতঃ শব্দটি হবে 'aqui' (adv.) যার অর্থ 'here', 'in this place', 'to this place', 'Now, at present' ইত্যাদি ; এবং বলা বাহুল্য, এই অর্থটিই আলোচ্য পঙ্‌ক্তিতে প্রযোজ্য।

যা হোক, 'কথামুখ' পরিচ্ছেদের মূল বক্তব্য হ'ল : কালিকটের রাজার সভায় সেনাপতি ভাস্কো-ডা-গামার নেতৃত্বে কয়েকজন পর্তুগীজ এলেন বাণিজ্য করার অনুমতি লাভের আশায়। জামোরিন, মোপ্‌লা-মুর বণিক ও সভাসদদের নিষেধ অমান্য করেই সে অনুমতি তাঁদের দিলেন। কিন্তু পদে পদে শুরু হ'ল আরবীয় বণিকদের অসহযোগিতা,

---

* পদসঞ্চার প্রথম প্রকাশ—মাঘ, ১৩৬১, কলকাতা-৬

** OSLUSIADASDE LUIZ DE CAMOES—ইংরেজী translation সহ দুই খণ্ডে প্রকাশিত ; C. Kegan Paul & Co, LONDON, 1878

প্রতিবন্ধকতা, অত্যাচার-লাঞ্ছনা ; আদার বদলে মাটির ঢেলা মিশিয়ে প্রতারণা। শেষে একদিন শুল্ক বাকী থাকার অজুহাতে তাঁদের গুদাম আটক করা হ'ল। অন্ধ ক্রোধে-ক্ষোভে ফুলতে থাকেন পর্তুগীজগণ। প্রচার হয়, ক্রীশ্চানেরা একজন আরবকে হত্যা করেছেন। এরপর হিন্দের মাটিতে এক মুহূর্ত কালক্ষেপ করলে একজন ক্রীশ্চানকেও খুঁজে পাওয়া যেত না। অন্ধকারে দূর সমুদ্রে তাঁরা তিক্ত অভিজ্ঞতা নিয়ে পালিয়ে গেলেন। কিন্তু এই অভিযানই শেষ নয়। এর পর আরও একাধিক অভিযান হয়েছে। ভাস্কো-ডা-গামা অনেক ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার করে স্বজন হারিয়ে ফিরে গেছেন, এসেছেন পেড্রো কাব্রাল। দ্বিতীয়বার ভাস্কো-ডা-গামা ভারতে এসেছেন এবং অভিযানকারীদের প্রতিবারের তিক্ত অভিজ্ঞতা, অপমান, লাঞ্ছনা তাঁর প্রতিশোধের আগুনে ঝরে পড়েছে। কালিকটের বন্দরে আগুন জ্বালিয়েছেন, কামান গর্জন করে উঠেছে। বাড়ীঘর ধ্বংস হয়েছে। কালিকটের জামোরিন সন্ধি করতে চেয়েছেন। কানানুর কোচিন থেকে সন্ধির প্রস্তাব এসেছে। ভাস্কো-ডা-গামার পৈশাচিক অট্টহাসিতে 'কথামুখ' শেষ হয়েছে। যার ইঙ্গিত, এইভাবেই একদিন দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারতে পর্তুগীজরা শুধু বাণিজ্য কুঠী নয়, সামরিক দুর্গও স্থাপন করেছেন। গোয়ায় তাঁদের স্বাধীন সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

অতএব, পরিচ্ছেদের শীর্ষোক্ত : 'কী চাও তোমরা' খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। কী তাঁরা চান তা পরিচ্ছেদ (প্রকৃতপক্ষে এখান থেকেই কাহিনী আরম্ভ) শীর্ষোক্তিতে তার উত্তর দেওয়া হয়েছে, "Viemos buscar, Cristaose speciarias"-এর অর্থটি দিয়েই কাহিনী শুরু হয়েছে : 'চাই ক্রীশ্চান আর চাই মশলা।' এ ক্ষেত্রেও উদ্ধৃতিটি সম্ভবত যথাযথ নয় ; এবং বানানও ভুল আছে। মূলে আছে ঃ

"Vimos buscar do Indo a qrao corrente
Por onde a Lei divina se accrescente."

ইংরাজী অনুবাদ হ'ল ঃ "We come in quest of mighty Indus' flow,
That there the Faith Divine may spread and grow."

প্রথম পরিচ্ছেদের শীর্ষোক্তিটি 'কথামুখ'-এর ঘটনা ও কাহিনীরই অনুসারক। উপন্যাসের ঘটনা ও কাহিনী ভারতের দক্ষিণ ও পশ্চিম উপকূল থেকে (কথামুখ) বঙ্গদেশের উপকূলে আসার জন্য যে সংযোগ সেতুটির প্রয়োজন, প্রথম পরিচ্ছেদের sub-title সেই সংযোগ সেতু। কাহিনীর আঙ্গিক গঠনেও যেমন এই উদ্ধৃতির গুরুত্ব, তেমনি ভারতের মাটিতে পশ্চিমী শক্তি কোন্ সংকল্প নিয়ে, কেমন করে ধীরে ধীরে অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছিল—ক্ষমতা বিছিয়ে দিয়েছিল তার ব্যঞ্জনাটিও এই শীর্ষোক্তিতে নিহিত। উপন্যাস গ্রন্থের "Cristaos e speciarias" অংশটি মূল গ্রন্থে এভাবে না পাওয়া গেলেও, পর্তুগীজদের আগমন-উদ্দেশ্য যে তাই ছিল ইতিহাসে তার সমর্থন মিলবে এবং 'লুসিয়াদাসে'র বক্তব্য থেকেও তা প্রমাণ করা যাবে। 'পদসঞ্চার' উপন্যাসে ঔপন্যাসিক সংক্ষিপ্ত এই শব্দটির সাহায্যে বাঙলায়, তথা, ভারতে পর্তুগীজদের আগমন উদ্দেশ্যটি সুন্দর ও স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দিয়ে কাহিনীর বাঁধুনিকে দৃঢ় করেছেন,

এবং সঙ্কল্পবদ্ধ করে পর্তুগীজ চরিত্রের একটা কাঠামো নির্মাণ করেছেন।

আপাততঃ মূলের কথা না ভেবে, উপন্যাসস্থ শীর্ষোক্তিগুলির শিল্পগত প্রয়োজনীয়তা আলোচনায় মন দেওয়া যেতে পারে। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের শিরোদেশে শোভিত; **"Os mares sao azues-Quanto mais vivo, melhor"**—অস্যার্থ ঔপন্যাসিক কৃত, 'কত গভীর নীল সমুদ্র। আরো উজ্জ্বল, আরো সুন্দর।'—সুদূর ইয়োরোপ থেকে কত সমুদ্র এবং এবং কত নদী পার হয়ে অবশেষে মার্টিম অ্যাফোন্‌সো ডি মেলো বঙ্গোপসাগরে এসে পড়েছেন। বঙ্গে তাঁরা ব্যবসা-বাণিজ্য করবেন। তাঁর পূর্বে যাঁরা বঙ্গে আসার চেষ্টা করেছেন, তাঁদের প্রত্যেকেই এই বঙ্গের অফুরন্ত ঐশ্বর্য ও সৌন্দর্যের কথা বলেছেন। আর এখানকার পণ্যসামগ্রী ও শিল্পজাত দ্রব্য তো মুঠো মুঠো অর্থ উপার্জনের প্রশস্ত উপায়। সেই বঙ্গের কাছাকাছি কোথাও এসে পড়েছেন ডি মেলো। তাই, এর সুন্দর এবং বর্ণোজ্জ্বল সমুদ্র, তাঁর দু'চোখে আবেশ সৃষ্টি করেছে। আলোচ্য ছত্রটি বাঙলার সৌন্দর্য এবং ঐশ্বর্য সম্বন্ধে দীর্ঘকাল ধরে পর্তুগীজদের যে একটি আচ্ছন্ন ধারণা রয়ে গেছে—তা লেখকের কবি-মনেরই রূপান্তর। বঙ্কিমচন্দ্রের নায়কও সমুদ্রদর্শনে এরূপ বিমুগ্ধ চিত্তে আবৃত্তি করেন: দূরাদয়শ্চক্রনিভস্য তন্বী···" ইত্যাদি। তবে, এই পরিচ্ছেদের মধ্যে ডি মেলোর ভাবনারাজ্য থেকে যে ছত্রাংশটি ঔপন্যাসিক অর্থসহ উদ্ধার করেছেন: **'Vamos ester muito bem aqui'** —অর্থাৎ, 'এইখানে আমরা আরামে বসব হাত পা ছড়িয়ে'—তাতে কাব্যের মুগ্ধ জগৎ থেকে ডি মেলো আশা-স্বপ্নের জগতে এসেছেন, যার পিছনে রয়েছে লোভ, শক্তি, ঈর্ষা।

তিন পরিচ্ছেদের **sub-title** হ'ল: **'Que Cidade e esta ?'** লেখক ভাষান্তরে বলেছেন: 'এ কোন শহরে এলাম?' শিরোনামটি এখানে আগে-ভাগেই পাঠকের মনে ডি মেলোর সংশয়টা জাগিয়ে দেয়। খুন্দসান্ ডি মেলোকে প্রতারণা করে চট্টগ্রামের পরিবর্তে চাকারিয়ার নবাব খোদাবক্স খানের দরবারে নিয়ে আসেন। ডি মেলো চট্টগ্রাম বন্দর ও শহরের যে বর্ণনা শুনেছেন এবং 'লুসিয়াদাসে' পড়েছেন তার মতো মনে হচ্ছে না তাঁর। "লুসিয়াদাস"-এ আছে:

> **"Ve Cathigao, cidade das melhores**
> **De Bengala, provincia, que se preza**
> **De abundante ;···"**

J. J. Aubertin-এর ইংরাজী ভাষান্তর করেছেন:

> **"See Cathegan, a city of the best**
> **Of all Bengal, a province that doth vie**
> **With all, for its abundance······"**

ঔপন্যাসিক এর ভাবার্থটি জানিয়ে দিয়েছেন; "সোনার দেশ বাংলা, ভারতের স্বর্গ এই বেঙ্গালা—তার উচ্চতর চূড়োয় আসন এই চট্টাগ্রামের। **De abuudante!** মসলিন, মশলা আর মণি-মাণিক্যের কল্পলোক।"—বিদেশীর চোখে বঙ্গের এই রূপ বর্ণনা—

ঔপন্যাসিকের এবং সকল বঙ্গবাসীর পক্ষেই শ্লাঘার বিষয় সন্দেহ নেই। কেউ এ অপবাদ তাঁকে দিতে পারবেন না, মাতৃভূমির বর্ণনায় শিল্পী আবেগবিদ্ধ! যাই হোক, পরিচ্ছেদের শিরোনামে যে প্রশ্নটি তোলা হয়েছে—তার সঙ্গে এই পঙ্‌ক্তিগুলি আবৃত্তি করার যোগসূত্রটি ঘনিষ্ঠ। আরও একটি কাজ হয়েছে।—ডি মেলোর কবি-হৃদয়টিকে উন্মোচনের যে চেষ্টা দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে শিল্পী করেছেন, তৃতীয় পরিচ্ছেদে এসে তাকে আরও স্পষ্ট করলেন এই আবৃত্তি পাঠের মধ্য দিয়ে। আর **sub-title**-এর প্রশ্নে, বা সংশয়ে একটা সন্দেহের খোঁচা জেগে উঠল—যা এদেশীয় চরিত্র সম্পর্কে ধীরে ধীরে এক তিক্ত অভিজ্ঞতায় পরিণত হবে ডি মেলোর বা অন্যান্য পর্তুগীজ ঐতিহাসিকদেরও। অতএব শীর্ষনামটি এখানে নাটকীয় রীতিতে পাঠকের অন্তরকেও যেমন পরবর্তী ঘটনার জন্য কৌতূহলী করে, তেমনি এদেশের মাটিতে যে প্রতারণা, ও তিক্ত অভিজ্ঞতা ডি মেলোকে লাভ করতে হয়, প্রশ্নে তারও একটি নিগূঢ় ইঙ্গিত আছে।

চার-এর পরিচ্ছেদের **sub-title : "Mas nao posso. Tenho que voltar—"** ঔপন্যাসিকের ভাষায়: 'আমি পারব না। আমরা ফিরে যেতে চাই"—আর্তস্বরে ডি মেলো চাকারিয়ার নবাব-দোভাষী মুরকে এই উত্তরটি দেন। তৃতীয় পরিচ্ছেদের শীর্ষনামে যে সংশয় সূচক প্রশ্ন ছিল, চতুর্থ পরিচ্ছেদের উক্তিতে বোঝা গেল ডি মেলো বিপদে পড়েছেন। ত্রাণ পাওয়া মুস্কিল। নবাব খোদাবক্স খান সভাসদ, অভিজাত মুর দ্বিভাষীকে দিয়ে জানিয়ে দিলেন, প্রতিবেশী রাজ্যের সঙ্গে তাঁর এখন যুদ্ধ চলছে, সেই যুদ্ধে পর্তুগীজ ক্যাপিতান যদি তাঁকে সাহায্য করতে রাজী থাকেন, তা হলে এদেশে তাঁরা বাণিজ্যাধিকার লাভ করবেন, নচেৎ তাঁরা নবাবের বন্দী। কিন্তু মাননীয় রাজা ডি-কুনহার বর্তমান নীতি হ'ল, বন্ধুত্ব—এ দেশের কোন রাজার সঙ্গে শত্রুতা নয়। বিপদ বুঝতে পেরে ডি মেলো আর্তস্বরে জানিয়ে দেন তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়, তিনি ফিরে যেতে চান। চার-এর পরিচ্ছেদের বক্তব্য বিষয়টিকে পূর্ব পরিচ্ছেদের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে পরিস্ফুট করে ঔপন্যাসিক তাঁর ইতিহাস-কাহিনীটিকে পাঁচ-এর পরিচ্ছেদে এগিয়ে নিয়ে গেলেন।

"Estou cansado ; gostaria de descan, car." পাঁচ-এর পরিচ্ছেদের এই **sub-title**-টির অর্থ: "বড়ো ক্লান্ত; বিশ্রাম চাই, ঘুমোতে চাই।" এ কথাটি কিন্তু কোন পর্তুগীজের মুখের বা অন্তরের কথা হিসেবে লেখক এখানে ব্যবহার করেন নি। এটি শঙ্খ দত্তের উক্তি হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে। পুরীধামে উপনীত হয়েই বাঙলার বণিক শঙ্খ দত্ত আরবীয় বণিক গোলাম আলীর হাতে পড়েন। গোলাম আলী তাঁকে নির্জন সমুদ্রতটে বসিয়ে হার্মাদদের লুঠতরাজ ও ভারতের দক্ষিণ ও পশ্চিম উপকূলে রাজ্যপাট বিস্তারের কাহিনী বর্ণনা করে বার বার সাবধান করে দিতে চাইলেন এই বলে: এবার বাঙলার পালা। এখনও যদি বাঙলার বণিকরা তৎপর না হন, জেগে না ওঠেন, শেষে একদিন বাঙলাও তাদের কবলেই পড়বে। এরই মধ্যে তারা বাঙলায় হানাও দিয়েছে। কয়েকদিন যাবৎ সমুদ্রযাত্রায় শঙ্খ দত্ত তখন ক্লান্ত ছিলেন। তাঁর

বিশ্রামের খুবই প্রয়োজন ছিল। তিনি গোলাম আলীর উত্তেজনায় বিশেষ সাড়া দিতে পারছিলেন না। অবশেষে নিষ্কৃতি লাভ করে জানালেন, "আমিও বড় ক্লান্ত, আমার বিশ্রাম দরকার।" শঙ্খ দত্তের এই কথাটির সুর পূর্বে পরিচ্ছেদেই ধ্বনিত হয়েছে ডি মেলোর কণ্ঠে : 'আমি পারব না, আমরা ফিরে যেতে চাই।' ডি মেলোর সেই বিষণ্ণ কণ্ঠের সুরেরই রেশ ছড়িয়ে পড়েছে পঞ্চম পরিচ্ছেদে। অতএব বলা যেতে পারে, পর্তুগীজ sub-title-গুলি শুধুমাত্র পর্তুগীজ কাহিনীর, বা ইতিহাসের পূর্বাপর ঘটনার যোগসূত্র রচনা করার উদ্দেশ্যেই ঔপন্যাসিক ব্যবহার করেন নি, উপন্যাসের সমগ্র কাহিনীর ওপরই এই sub-title-গুলির ভাবার্থ, বা নিহিতার্থ বাঙময় হয়ে উঠেছে। উপন্যাসের কাল্পনিক কাহিনীটিও পৃথক হয়ে না থেকে ইতিহাসের আবহাওয়ায় একটি সূক্ষ্ম তন্ত্রীতে বাঁধা পড়েছে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা প্রয়োজন, প্রথম চারটি পরিচ্ছেদের কাহিনীর দুটি করে অংশ একটি পর্তুগীজদের সঙ্গে আগমন বৃত্তান্তের ধারা, অপরটি শঙ্খ দত্ত, সোমদেব, রাজশেখর প্রভৃতিকে নিয়ে উপন্যাসের কাহিনীধারা। পঞ্চম অধ্যায়টিতেই প্রথম দেখা গেল, পর্তুগীজ প্রসঙ্গ থাকলেও ইতিহাসের ধারাটিকে সরিয়ে রেখে উপন্যাসের ধারাটির বর্ণনা করেছেন লেখক। পূর্বের চারটি পরিচ্ছেদের পর্তুগীজ ইতিহাস-কাহিনীর সঙ্গে লুসিয়াদাসে'র উদ্ধৃতিগুলির শিল্পগত প্রয়োজনীয়তা বোঝা গেছে ; এবং একটু গভীরে দৃষ্টি দিলে দেখা যাবে, ঐ চারটি পরিচ্ছেদেও উপন্যাস-কাহিনীর সঙ্গে এই শিরোনাম-গুলির অন্তর্গূঢ় যোগ ঔপন্যাসিক আগাগোড়া রক্ষা করেছেন। উদাহরণস্বরূপ,—প্রথম পরিচ্ছেদের প্রথমাংশে কেমনভাবে পর্তুগীজ অভিযানকারীরা নানা দুঃখ-কষ্ট, ক্ষয়-ক্ষতি সহ্য করে অবশেষে আলবুকার্ক-এর কাল থেকে যুদ্ধ-বিদ্বেষ ত্যাগ করে বন্ধুত্বের মনোভাব নিয়ে পশ্চিমের বাণিজ্যলক্ষ্মীর ঘটটি প্রাচ্যের কূলে স্থাপন করতে প্রয়াসী হয়ে ওঠেন, সেই নীতি-আদর্শ নিয়েই মার্টিম অ্যাফেনসো ডি মেলো বঙ্গের উপকূলের দিকে ভেসে চললেন। মূল মন্ত্র হলো : 'চাই ক্রীশ্চান, চাই মশলা।' এই পরিচ্ছেদের দ্বিতীয় অংশে শঙ্খ দত্তের পণ্য বোঝাই চারখানি নৌকা সমুদ্রের জল কেটে চলেছে। যাত্রার আগে পিতা ধন দত্ত এবং গুরু সোমদেব উভয়েই তাঁকে সাবধান করেছেন এই হার্মাদদের সম্পর্কে। সকলেরই প্রশ্ন ওরা কী চায় ? ওদের চোখে লোভের ছায়া। ওরা একদিন সর্বনাশ করবে—খালি বা শূন্য হাতে ফিরে যাবে না। অতএব গভীরতর তাৎপর্যে পর্তুগীজ উক্তিটির সঙ্গে এই কাহিনীর মর্মার্থগত যোগটি আর অস্পষ্ট থাকে না।

এইভাবে প্রত্যেকটি পরিচ্ছেদ বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে শীর্ষোক্তিগুলি কখনও সমগ্র কাহিনীর মধ্যে একটি ভাব-ঐক্য রচনা করেছে, কখনও পরবর্তী পরিচ্ছেদের ঘটনার সংকেত বহন করে এনেছে ; কখনও বা ভবিষ্যৎ পরিণতির ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করে ভাব-গভীরতা এনেছে, কখনও ইতিহাসের ভাববলয়ে উপন্যাস-কাহিনীটিকে সূক্ষ্মভাবে জড়িয়ে রেখেছে, আবার কখনও বা একটি কবিত্বের ছোঁয়ায় শিল্পকাহিনীতে সৌন্দর্য ও মাধুর্যের রেশ ছড়িয়ে দিয়েছে। যেমন, শেষ পরিচ্ছেদটির শীর্ষে এবং অভ্যন্তরেও যোদ্ধা-কবি ক্যামোয়েন্সের "লুসিয়াদাস" থেকে যে দুটি পঙ্‌ক্তি উদ্ধৃত করা হয়েছে :

Aguas do Gange : e a terra de Bengala
Fertil de sorte, que outra nao the igual'a
[Canto VII. st xx]

J. J. Aubertin এর ইংরাজী অনুবাদ করেছেন :

"The Ganges' waters, and the land Bengal,
So fertile, none can equal it at all."

ঔপন্যাসিক বাঙলায় যে অনুবাদটি করেছেন, তা তাঁর কবিমনের পরিচয়ই বহন করে : 'পবিত্র গঙ্গার মোহানার মুখে এই তো বাঙলা দেশ, যেন স্বর্গের উদ্যান বিস্তীর্ণ হয়ে আছে দিকে দিকে। অনুবাদ নয়, কবির কল্পনা, ভাবানুবাদ বলা যাবে কি না জানি না। সে যাই হোক, তেইশ পরিচ্ছেদের শীর্ষোক্তিতে বাঙলার অতুলনীয় রূপের, সৌন্দর্যের বর্ণনা আছে—সেই সৌন্দর্যই আমাদের মনকে বিষণ্ণ করে ফেলে যখন ভাবি বাঙলার চরম পরিণামের কথা, ভারতের করুণ পরিণতির কথা, পরবর্তীকালের ইতিহাসের গর্ভে যে পরিণাম অপেক্ষা করে আছে। তার ইঙ্গিতও উপন্যাসে আছে দুরকম ভাবে। প্রথমটি পর্তুগীজের মুগ্ধ দৃষ্টিতে :

"ভাস্কো-ডা-গামার স্বপ্ন মিথ্যে হয় নি। আলবুকার্কের আশা মেলে দিয়েছে দুটি নবাঙ্কুরের পল্লব। সার্থক হয়েছে নুনো-ডি-কুনহা আর অ্যাফন্সো ডি মেলোর সাধনা। পর্তুগীজ নাবিকেরা মুগ্ধ চোখ মেলে তাকায় 'বেঙ্গালার' সোনা-ঝরানো আকাশের দিকে, তার শ্যাম শস্যের বিস্তারের দিকে, তার মসলিন, তার সোনারুপো, তার মশলার দিকে। তারা জানে, এই সোনার দেশ এবারে ধন্য হবে মা মেরীর পুণ্যনামে জেণ্টুদের মন্দির ছাড়িয়ে আকাশে উঠবে ইগ্রেঝার চুড়ো—ক্রীশ্চান ধর্মের আশ্রয়ে এসে তারা লাভ করবে মুক্তির পরমার্থ। খ্রীষ্টের করুণায় অভিষিক্ত হয়ে যাবে পৌত্তলিকতার দাবদাহ [পরিঃ তেইশ] পর্তুগীজের মুগ্ধতা বা আনন্দের কারণ ছত্র কয়টি থেকে স্পষ্ট। কিন্তু কোন বঙ্গবাসী বা ভারতবাসীর পক্ষে? হৃদয়ের তন্ত্রীতে একটি করুণ রাগিনী কি বাজতে থাকে না? অতএব শীর্ষের ছত্র দুটি দুই বিপরীত ভাবের দ্যোতনা এক সঙ্গে মনে আনে। আমরা বুঝতে পারি, পরবর্তীকালের ইতিহাস যাঁরা গড়বেন তাঁরা এই ঐশ্বর্য, এই রূপ দেখেই আকৃষ্ট হয়েছিলেন। আর হতভাগ্য আমরা, এই অতুলনীয়া দেশমাতৃকার অধিকার হারাতে বসলাম। আমাদের কাছে এ স্তুতি আনন্দের নয়, বেদনার। একে ব্যাজস্তুতি বলা যাবে কি?

শিরোদেশের এই প্রশস্তি যে, আমাদের কাছে কতই বেদনার, কতই ভয়াবহ, তার দ্বিতীয় বৈপরীত্যটি আছে লেখকের শেষ বর্ণনায় :

"একবার—দুবার—তিনবার! পর্তুগীজদের কুঠি থেকে কামানের শব্দ।

"আর বহুকাল আগে কালিকট বন্দরে ডা-গামার অট্টহাসির মতো সেই কামানের আওয়াজ ছড়িয়ে পড়ল পূর্ব থেকে পশ্চিমে, উত্তর থেকে দক্ষিণে। বাঙলার পথ-মাঠ-পাহাড়-নদী-বন-বনান্তর পার হয়ে সেই শব্দ ভেসে চলল ইতিহাসের দিগন্তে। আর তার

সঙ্গে সঙ্গে একটা ভয়াবহ জাগ্রত স্বপ্নে বুঝি চমকে উঠল বাঙলা দেশের তাঁতীরা! একটা অস্পষ্ট অস্ফুট যন্ত্রণার মতো বুঝি তাদের মনে হল—কারা যেন তীক্ষ্ণধার অস্ত্র দিয়ে নিষ্ঠুর হিংসায় এক একটি করে তাদের হাতের আঙুলগুলো কেটে চলেছে।"

[পরিঃ তেইশ]

শিরোধৃত পঙ্‌ক্তি দুটির সঙ্গে এই পরিণামের আপাত বিরোধ থাকে না, যদি এই বর্ণনার সূক্ষ্ম গভীরতর বহুব্রীহিক-ব্যঞ্জনাটি বুঝতে পারি। পর্তুগীজগণ বঙ্গের হৃদয়ে যে পদস্থাপনা করলেন, তা পশ্চিমী শক্তির সুদৃঢ় ভিত্তিরই সূচনা। সমগ্র উপন্যাসের নামকরণ 'পদসঞ্চার'-এর শিল্প ভাবনার সঙ্গে এই শীর্ষোধৃত পঙ্‌ক্তি দুটির অন্তর্গূঢ় যোগ আবিষ্কার করা কি খুবই কষ্টকল্পনা ?

পরিচ্ছেদগুলির sub-title সম্পর্কে উপসংহারে বলা যায়, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় উপন্যাসের প্রথম পরিচ্ছেদ শুরু করলেন 'Vimos buscar Cristaos e speciarias এই শীর্ষোক্তি দিয়ে, যার সংক্ষিপ্ত ভাবার্থ তিনি করেছেন : 'চাই ক্রীশ্চান,—চাই মশলা'। এই অঙ্গীকার নিয়ে যে পর্তুগীজরা বাঙলার উপকূলের উদ্দেশে যাত্রা করেছিলেন, উপন্যাসের শেষ পরিচ্ছেদে বাঙলার বর্ণনা ও প্রশস্তির মধ্য দিয়ে তাঁদের সেই অভিযান ও প্রচেষ্টা যে সফল হল, তারই উপসংহার রচনা করে ঔপন্যাসিক ইতিহাস-কাহিনীর ভাববৃত্তটিকে যেমন পূর্ণ করলেন, তেমনি কাল্পনিক কাহিনী অংশেরও সমাপ্তি হ'ল এইভাবে—শঙ্খ দত্ত দক্ষিণ পাটনে বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে জীবনে নানা অভিজ্ঞতা, দুঃখ যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে যে লক্ষ্মী লাভ করে (সুপর্ণাকে) ঘরে তুললেন, একদিন তাঁদের দুটি জীবনকে সার্থক করে যে নবাগতের শুভ সূচনা করে দিল, তারই আনন্দে শঙ্খ দত্তের ভুবন আবার সুন্দর, স্বর্গীয়, অতুলনীয় হয়ে উঠল। sub-title-গুলি এইভাবে উপন্যাসের শিল্প-কাহিনীর বৃত্তটিকে সুমণ্ডলায়িত করে দিল।

ছয়

নামকরণ প্রসঙ্গ

তাৎপর্যপূর্ণ, ব্যঞ্জনাধর্মী নামকরণ শিল্পরূপ বা কলাকৃতিটিকে (art form) আকর্ষণীয় এবং সুন্দর করে। শিল্পিত বস্তুটির নামকরণকালে শিল্পীরা মুখ্যতঃ তিনটি পথের একটিকে গ্রহণ করে থাকেন: (১) নায়ক-নায়িকা বা কেন্দ্রীয় চরিত্রের নামানুসারে কলাকৃতিটির নামকরণ হতে পারে; (২) মূল বক্তব্য বিষয়ের দিকে দৃষ্টি রেখে নামকরণ করতে পারেন; বা, (৩) শিল্পীর আদর্শ-উদ্দেশ্য বা নীতি-তত্ত্বের দিক থেকেও শিল্পরূপটির একটি নামকরণ করা যায়। কোন দিক থেকে নামকরণ করবেন, তা নির্ভর করে সম্পূর্ণভাবেই শিল্পীর কবি-মনের ওপর। অবশ্য শিল্পের বিষয়টি শিল্পিত হওয়ার পর কবিকে ভাবতে হয়—তাঁর সৃষ্টিকে কোন অভিধায় চিহ্নিত করবেন তিনি? কী নামে সে সুন্দর হবে, এবং তাঁর অন্তরের সত্যটি পাঠকের কাছে উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে? কুকুর-গরু প্রভৃতি গৃহপালিত প্রাণীর নামকরণ কালে আমরা এত তো ভাবি না! টম, জন, কালী, বুধী প্রভৃতি মনে-আসা একটা চলন-সই বা, জুৎসই নাম আমরা অনায়াসেই দিই—বিশেষ ভাবি না। কারণ, এই নামের সঙ্গে আমৃত্যু বা মৃত্যুর পরও নামদাতার কৃতিত্ব-গৌরব, যশ-মান, তার অমরতার কোন ছিটেফোঁটা সম্পর্কও যে নেই। নামটি নিরেটভাবেই সেই প্রাণীর;—যা তাকে সনাক্ত করতে সাহায্য করে মাত্র। মানুষের নামকরণ কালেও প্রায় একই রীতি লক্ষ্য করি। এ ক্ষেত্রে প্রায়শই নামটি শ্রুতি-মধুর, গভীর অর্থবাহী, বা যুগের ফ্যাশান অনুযায়ী হ'ল কিনা, সেদিকেই দৃষ্টি রাখা হয়। তাই যে অনর্গল মিথ্যা বলে চলে, তার নাম যুধিষ্ঠির রাখতে কোন অসুবিধা হয় না, কিংবা আইভি, আবীরা, মধুছন্দা প্রভৃতি নাম ফ্যাশান বা শ্রুতিমধুরতার দিকে লক্ষ্য রেখে করা হয়, এবং এরূপ নামকরণ অনেকের ক্ষেত্রেই যে, শরৎচন্দ্রের ভাষায় এদের জীবনকেই "আমরণ ভ্যাংচাইয়া চলিতে থাকে" সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু শিল্পের ক্ষেত্রে এরূপ অনবধানতা দেখা যায় না। শিল্পী তাঁর সৃষ্ট-শিল্পের মধ্যেই বেঁচে থাকার স্বপ্ন বুকে পুরে রাখেন। সেই শিল্প নাম-রূপহীন হলে চলে না; তাকে আর পাঁচটা শিল্পরূপ, নিজের বা অন্যের থেকে পৃথক করার জন্য বিশেষ নামে চিহ্নিত করতে হয়। কে জানে এই শিল্পমূর্তিটিই তাঁকে অমর করে রাখবে কিনা।

অতএব এ-হেন সৃষ্টির নামকরণ কালে, শিল্পীকে ভাবতে হয় যথেষ্টই ; মনোজ্ঞতার পরিচয় দিতে হয়। প্রদত্ত নামটি শিল্পরূপটির অন্তর্নিহিত পরিচয় তুলে ধরতে পারল কিনা পাঠকের কাছে, সেদিকে যত্নবান হতে হয়। নাহলে অসার্থকতার কণ্টক-যন্ত্রণায় সেই নামকরণ, শিল্পরূপটিকে 'আমরণ ভ্যাংচাইয়া চলিতে' থাকে।

ক্লাসিক স্বভাবের শিল্পীরা সাধারণত সৃষ্ট শিল্পমূর্তির নামকরণ কালে শিল্পের আন্তর সত্যটি যাতে সহজবোধ্য এবং স্পষ্ট হয়ে ওঠে, তার প্রতি বেশী সজাগ ;—শিল্পের বক্তব্য বা নীতি-আদর্শের দিকটিকে ব্যক্ত করতেই তাঁরা বেশী পছন্দ করেন। কিন্তু রোমান্টিক স্বভাবের কবি শিল্পী সাধারণতঃ শিল্পের বক্তব্য ও উদ্দেশ্যকে ব্যঞ্জনায় প্রকাশ করতে বেশী আগ্রহী। শিল্প মূর্তির স্থূল বক্তব্য বা নীতি-আদর্শকে উপেক্ষা করে, তার আন্তর সত্যটিকে ব্যঞ্জনায় অভিব্যক্ত করতে চান। অবশ্য শিল্পের নামকরণ বিচারে 'ক্লাসিক'-'রোমান্টিক' এরূপ ভাগ করা হয় না।

"পদসঞ্চার" নামকরণটি—নায়ক-নায়িকা, বা চরিত্র-ভিত্তিক নয়, ঔপন্যাসিকের কোন নীতি-তত্ত্বের বা আদর্শের ভিত্তিতেও নয়, নামকরণের মধ্য দিয়ে উপন্যাসটির বক্তব্য বিষয়কে নানা দৃষ্টিকোণ থেকে দেখানোর এবং ব্যঞ্জনার সাহায্যে সত্যটিকে ব্যক্ত করার শৈল্পিক চেষ্টায় সফল হয়েছেন নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়। "পদসঞ্চার" নামকরণে প্রাথমিকভাবে বিদেশী পর্তুগীজ বণিকদের ভারতের মাটিতে, আরও সীমিত গণ্ডীতে বাঙলার মাটিতে পদস্থাপনের ইতিহাসটি তুলে ধরা হয়েছে—এরূপ ধারণা সঙ্গত হলেও এই, নামকরণের পিছনে আরও গভীর তাৎপর্য নিহিত ; এবং তা উপলব্ধি করতে পাঠককে গ্রন্থের শেষ পাতা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়। প্রতীকধর্মী নাটকে যেমন পূর্ণসত্য উপলব্ধির জন্য শেষ অবধি দর্শক বা পাঠককে অভিনিবেশ সহকারে এগিয়ে যেতে হয়, অনেকটা সেইরকম। অর্থাৎ ঔপন্যাসিক আলোচ্য উপন্যাসের নামকরণটি এমনভাবে করেছেন যে কাহিনীর প্রকৃত ভাবগতি ও আন্তর সত্য প্রথম থেকেই উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে না। পাঠকের কৌতূহলটিকে প্রথম থেকে শেষ অবধি টেনে রাখা বা ধরে রাখার ক্ষমতা তাঁর আছে।

এরূপ ব্যঞ্জনাধর্মী নামকরণের শিল্পগত কৃতিত্বের আরও অন্যদিকও আছে। স্যার ওয়ালটার স্কটের "আইভানহো" উপন্যাসটির সম্পাদনাকালে ভূমিকায় সম্পাদক W. M. Parker গ্রন্থটির নামকরণ প্রসঙ্গে কিঞ্চিৎ আলোকপাত করেছেন : The word (Ivanhoe) suited the author's purpose in two material respects,—for, first, it had an ancient English sound ; and secondly, it conveyed no indication whatever of the nature of the story. He presumes to hold this last quality to be no small importance. What is called a taking title, serves the direct interest of the book-seller or publisher, who by this means sometimes sells an edition while it is yet passing the press. But if the author permits an

over degree of attention to be drawn to his work ere it has appeared, he places himself in the embarrassing condition of having excited a degree of expectation which, if he proves unable to satisfy, is an error fatal to his literary reputation. Besides, when we meet such a title as the Gunpowder plot, or any other connected with general history, each reader, before he has seen the book, has formed to himself some particular idea of the sort of manner in which the story is to be conducted, and the nature of the amusement which he is to derive from it. In this he is probably disappointed and in that case may be naturally disposed to visit upon the author or the work, the unpleasant feelings thus excited."

এ বক্তব্য থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়, দুটি আকর্ষণকারী শীর্ষনাম, যে নাম পাঠককে আগেভাগে কিছুই বুঝতে দেয় না, সেরূপ নামকরণবিশিষ্ট গ্রন্থের চাহিদা বুঝে অনেক সময় পুস্তক বিক্রেতা বা প্রকাশক মুদ্রিত হওয়ার কালেই সংস্করণটি বিক্রী করে দিতে পারেন ; যার তাৎপর্য হল—গ্রন্থের নামকরণ আকর্ষণীয় বা, চমকপ্রদ হ'লে অনেক সময় তা প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে নিঃশেষিত হয়ে যায়। আমাদের দেশে এরূপ ঘটনা বিরলদৃষ্ট। তবে, পাঠককে যে এরূপ নামকরণ বিশিষ্ট গ্রন্থ অধিকতর কৌতূহলী করে, আকৃষ্ট করে, একথা বলা যেতে পারে। সেইভাবেই দ্বিতীয় কথাটিও গুরুত্বপূর্ণ। লেখক অনেক সময় নামকরণ কালে গুরুগম্ভীর, অর্থে-ভারী, গালভরা নাম নির্বাচন করেন। কিন্তু গ্রন্থের আন্তর ধর্ম ও বক্তব্যের সঙ্গে তার যোগ হয়ত খুবই ক্ষীণ। সেরূপ ক্ষেত্রে পাঠক গ্রন্থ পাঠে শুধু নিরাশই হন না, শিল্পীর সুনামও নষ্ট করে এই ধরনের বই।

"পদসঞ্চার" নামকরণটি গভীর তাৎপর্যপূর্ণ এবং ব্যঞ্জনাধর্মী। ঔপন্যাসিকের শিল্প-কাহিনীর গঠননৈপুণ্যই প্রকাশ করে এরূপ নামকরণ। অসামান্য কৌশলে ও দক্ষতায় তিনি দুটি প্রধান কাহিনী—একটি ইতিহাসের এবং অপরটি উপন্যাসের—এবং আরও অনেকগুলি শাখা-কাহিনী বা গৌণ-কাহিনীকে একটি গভীর ভাবনাসূত্রে এমনভাবে বেঁধে ফেলেছেন যে, শিল্প-কাহিনী বা plot-টির প্রতিটি অঙ্গ সুসমন্বিত হয়ে, পূর্ণাঙ্গতা প্রাপ্ত হয়েছে ; তারা organic unity-তে পরিণত হয়েছে। ভাবনাসূত্র বলতে এখানে নামকরণকে বোঝানো হয়েছে। শিল্পী ইতিহাস ও কাল্পনিক কাহিনীকে চরিত্রের সমন্বয়ে স্থান ও কালের (space and time) প্রেক্ষাপটে স্থাপন করে তাঁর 'অপূর্ব' নির্মাণক্ষম প্রজ্ঞায়, এমন এক নামকরণে বেঁধেছেন যা সমগ্র শিল্প কাহিনীটিকে গভীর অর্থপূর্ণ করেছে, কবি-ভাবনাটির সার্থক রূপায়ণ হয়েছে। "পদসঞ্চার" এমন একটি শব্দ যার মধ্যে ঔপন্যাসিকের নানা দৃষ্টিকোণ থেকে আগত ভাবনা 'প্রিজিম'-এর মত সংহত হয়ে আছে। আলো পড়লে যেমন প্রিজিমের কাঁচ থেকে নানা রঙ বিচ্ছুরিত

হয়, এও তেমনি। পাঠকের জ্ঞানালোকে নানা অর্থ, নানা ভাবনার দ্যোতনা করে। সেই অর্থ বা, ভাবনাগুলি হল : (১) কাহিনীগত দিক থেকে—(ক) ঐতিহাসিক কাহিনীর পরিণতি ঘটেছে, বিদেশী বণিক পর্তুগীজদের বাঙলার মাটিতে, তথা, ভারতের মাটিতে আগমনে, পদসঞ্চারে। (খ) উপন্যাস-কাহিনীর পরিণাম রচিত হ'ল সুপর্ণার গর্ভে নবীন আগন্তুকের পদসঞ্চারে। (২) রাজনৈতিক দিক থেকে—বিদেশীশক্তির কুঠী ও দুর্গ নির্মাণের মধ্য দিয়ে বাঙলার তথা ভারতের শাসন ক্ষমতায় তার পদসঞ্চার ঘটল। (৩) অর্থনৈতিক দিক থেকে—পশ্চিমী বাণিজ্যলক্ষ্মীর যে ঘট স্থাপিত হয়েছিল প্রাচ্যের বাণিজ্যলক্ষ্মীকে অতল সাগরে ডুবিয়ে, তারই সূচনা পর্তুগীজ বণিকদের ভারতের উপকূলে পদসঞ্চারে। (৪) ধর্মীয় দিক থেকে—ব্রাহ্মণ্য ও শৈব-শাক্ত ধর্মের প্রাধান্যকে ক্ষুণ্ণ করে শ্রীচৈতন্য প্রবর্তিত বৈষ্ণব প্রেমধর্মের নব পদসঞ্চার ঘটল এবং বহিরাগত এক নব ধর্মের আবির্ভাব হল। উল্লিখিত বিষয়গুলি সামান্য ব্যাখ্যা করলেই "পদসঞ্চার" নামকরণের যৌক্তিকতা স্পষ্ট হবে।

১. **কাহিনীগত দিক ঃ**

"পদসঞ্চার" উপন্যাসের শিল্পবস্তু প্রধানতঃ দুটি কাহিনীর সমবায়ে গঠিত হয়েছে—(ক) ঐতিহাসিক কাহিনী, এবং (খ) উপন্যাসের কাল্পনিক কাহিনী। (ক) ঐতিহাসিক কাহিনীর দুটি ধারা—(i) একটি ধারা—গৌড় বঙ্গে হুসেনশাহী শাসনের সঙ্কটকাল, শের খাঁ-র উত্থান ও বঙ্গের সিংহাসনের ওপর তাঁর থাবা এবং মোঘল শাসক হুমায়ুনেরও বঙ্গের সিংহাসনের প্রতি লোভ। (ii) অপর ধারাটি—পাশ্চাত্ত্য জাতির প্রথম প্রতিনিধি হয়ে ভারতের উপকূলে বাণিজ্যের উদ্দেশে পর্তুগীজ বণিকদের আগমন।

ক. **ঐতিহাসিক কাহিনী ঃ** প্রথমে ভারতের দক্ষিণ ও পশ্চিম উপকূলে, তারপর বঙ্গে পর্তুগীজ বণিক দল বাণিজ্য করতে এল। কালিকটে যখন ভাস্কো-ডা-গামা পদার্পণ করেন, তখনও আরব বণিকদের ছিল ভারতের বাণিজ্যের ওপর একচ্ছত্র আধিপত্য। ভারতের শাসন-সংক্রান্ত বিষয়েও ছিল তাঁদের যথেষ্ট প্রভাব। পর্তুগীজ হিসপানিয়ারা আরবীয় মুসলমানদের (মুরদের) ইয়োরোপ থেকে বিতাড়িত করেছে, কিউটায় তাদের সংহত শক্তি দিয়ে রক্ষা-করা দুর্গেরও পতন ঘটিয়েছে, এবং প্রাচ্যের উপকূল থেকেও মুরদের ক্ষমতাকে গুঁড়িয়ে দেবার জন্য এসেছে। আরবীয় মুসলমান কালিকটের জামোরিন অর্থাৎ রাজা এবং রাজসভাসদদের সহায়তায় ভাস্কা-ডা-গামা ও তার সঙ্গীদের পদে পদে অপদস্থ ও লাঞ্ছনা করতে থাকে, তাদের ব্যবসায়ে বাধা দান ও প্রতারণা করতে থাকে ; কারুকে কারুকে প্রাণও দিতে হয়। এই ভাবে শুধু ডা-গামা নয়, আলবুকার্ক, কোয়েলহো প্রমুখেরা বৎসরের পর বৎসর এদেশে খ্রীশ্চান সংখ্যা বাড়াতে এবং বাণিজ্যে মুঠো মুঠো মুনাফা লোটার লোভে এসেছেন, ক্রোধে, ক্ষোভে বন্দরে আগুন লাগিয়েছেন, কামান দেগেছেন, বাড়ী ঘর ধ্বংস করেছেন, সমুদ্রে লুঠতরাজ করেছেন, জেণ্টুরদের জাহাজ ডুবিয়ে দিয়েছেন, হজ যাত্রী ও জেণ্টুরদের হত্যা করেছেন।

পর্তুগীজ অভিযান কারীদেরও ক্ষয়-ক্ষতি বড় কম হয় নি; ধন-প্রাণ, বন্ধু-আত্মীয় হারিয়েছেন, দিনের পর দিন অন্ধ কারাগারের নরক যন্ত্রণা ভোগ করেছেন।

'কথামুখ' এই উপন্যাসের 'Prelude' বা ভূমিকা। ভারতের দক্ষিণ ও পশ্চিম উপকূল থেকে কাহিনী গড়িয়ে বঙ্গের উপকূলে এসে নেমেছে। এখান থেকেই প্রকৃত কাহিনীর যাত্রারম্ভ; পর্তুগীজদের অভিযান বঙ্গের উদ্দেশ্যে—'চাই ক্রীশ্চান, চাই মশলা'। নেতা ডি মেলো। চাকারিয়া থেকে চট্টগ্রাম। গৌড় থেকে সপ্তগ্রাম। খোদাবক্স খাঁ, মামুদ শা, শের খাঁ, হুমায়ন। বঙ্গের রাজনৈতিক অবস্থা যেমন সংকটজনক, তেমনি জটিল হয়ে ওঠে। শের খাঁ-এর আক্রমণে মামুদ শা উড়ে যান। হোসেন শাহী বংশের রাজত্বের অবসান হয়। আফগান সর্দার শের খাঁ জয়লাভ করলেও, হুমায়ুন শেষ পর্যন্ত এসে পড়ায় শের খাঁকে সরে যেতে হয়। আর সম্পূর্ণ নতুন এক বিদেশী শক্তি, ইয়োরোপীয় জাতি সমূহের প্রতিনিধি হিসেবে পর্তুগীজগণ বাণিজ্যের কুঠী নির্মাণ ও দুর্গ নির্মাণ করার অধিকার পেলেন এই সুযোগে। চট্টগ্রামে ও সপ্তগ্রামে তাঁদের নতুন দুর্গ ও কুঠী নির্মিত হ'ল। বঙ্গের সঙ্গে বাণিজ্যের অধিকারও তাঁরা লাভ করেন। পলাশীর প্রান্তরে বাঙলার স্বাধীনতা-রবি যে একদিন অস্তমিত হয়ে ইংরাজ বণিকের নবরাজশক্তির সিংহাসন পাতা হয়, তার ভূমিকা, বা, পূর্ব প্রস্তুতি পর্তুগীজ বণিকগণই প্রথম করেন। "পদসঞ্চার"-এর ঐতিহাসিক কাহিনী পর্তুগীজদের পদসঞ্চারে পরিসমাপ্ত হয়েছে।

খ. **কাল্পনিক কাহিনী:** "পদসঞ্চার" ঐতিহাসিক কাহিনী নয়, ঐতিহাসিক উপন্যাস। অতএব এর একটি কল্পিত কাহিনীর অংশও আছে। এই অংশটির নায়ক সপ্তগ্রামের বণিক শঙ্খ দত্ত। শঙ্খ-শম্পা-সুপর্ণা-গঞ্জালোকে নিয়ে উপন্যাস কাহিনী। তবে প্রধানতঃ শঙ্খ-সুপর্ণা-শম্পারই কাহিনী। নানা অভিজ্ঞতা, দুঃখ-বেদনার মধ্য দিয়ে শঙ্খ দত্ত, সুপর্ণাকে জীবনে পেয়েছেন, এবং পেয়েও না পাওয়ার বেদনা বা অসার্থকতা শেষে আনন্দে রূপান্তরিত হয়েছে, যখন জানতে পারলেন, তাঁর বংশধর সুপর্ণার গর্ভে। একটি নব প্রাণের অংকুর, তথা পদসঞ্চারে দুটি ব্যর্থ-প্রায় জীবন সফল ও সার্থক হয়ে ওঠার আলো দেখতে পেল। এদিক থেকেও নামকরণটি অর্থবহ।

২. রাজনৈতিক দিক:

১৯৪৭ খ্রীস্টাব্দের ১৫ই আগস্ট ভারত স্বাধীনতা লাভ করল বিদেশী ইংরেজ শাসনের অবসান ঘটিয়ে। স্বাধীন ভারতের পটভূমিকায় বসে ঔপন্যাসিক ভারতে বিদেশী ইয়োরোপীয় শাসনের মূলানুসন্ধানে গেছেন। একদিন সাত সমুদ্র তের নদী পেরিয়ে ইয়োরোপীয় শক্তির প্রতিনিধি রূপে পর্তুগীজরা ভারতে বাণিজ্য করতে এসে যে রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং অবস্থা লক্ষ্য করলেন, তাতে ধীরে ধীরে এদেশে খ্রীষ্টধর্ম প্রচার ও মশলা ব্যতিরেকেও শাসন সংক্রান্ত বিষয়েও তারা অনুপ্রবেশ করতে থাকে। কালিকটে উপস্থিত হয়ে ভাস্কো-ডা-গামা বুঝতে পারলেন, জামোরিন (রাজা) আরবীয় বণিকদের হাতের পুতুল মাত্র। তাঁরাই রাজসভার বিশিষ্ট ব্যক্তি এবং

তাঁদের মনস্তুষ্টি করতে বা কথা মত চলতে জামোরিন তৎপর। দুঃসাহসী জাতি পর্তুগীজ। ভাস্কো-ডা-গামা জামোরিনের ক্ষমতা বুঝেছিলেন বলেই কোন্ সমুদ্র পারের দেশ থেকে মুষ্টিমেয় কয়েকজন সঙ্গী-সাথী নিয়েই সাহস করেছিলে চারশো মক্কা যাত্রীকে বধ করে তাদের হাত-পা ছিন্ন করে নৌকায় স্তুপ করে সাজিয়ে আগুন ধরিয়ে তাতে "মহামহিমান্বিত জামোরিনের নৈশ ভোজের জন্য যৎকিঞ্চিৎ মাংস উপহার—" কথাগুলি লিখে পাঠিয়ে দিলেন। সঙ্গী জুলিয়ো তাঁকে প্রশ্ন করেন—"এর ফলে এ দেশের সমস্ত রাজা যদি এক সঙ্গে আক্রমণ করে পর্তুগীজ বহর ?" প্রত্যুত্তরে ভাস্কো-ডা-গামা তাঁর অমূল্য অভিজ্ঞতা ও বিচার-বুদ্ধির পরিচয় দিয়ে বললেন : "না, তা করবে না।……কারণ এইটেই এদেশের বিশেষত্ব। এরা বিচ্ছিন্ন, পরস্পরের প্রতি ঈর্ষার শেষ নেই এদের। এই অস্ত্রে মুসলমান একদিন এ দেশ জয় করেছিল, আজ আবার ক্রীশ্চানের জয়ের পালা। কানানুর কোচিনের কাছ থেকে এর মধ্যেই আমি সন্ধির প্রস্তাব পেয়েছি জুলিয়ো।"

এরপর বঙ্গের সঙ্গে বাণিজ্যচুক্তি এবং কুঠী ও দুর্গ নির্মাণের জন্য চলে একের পর এক অভিযান। এর আগেই গোয়ায় তাদের কুঠী ও দুর্গই শুধু স্থাপিত হয়নি, শাসনও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। গোয়ার গভর্নর নিযুক্ত হয়েছেন নুনো ডি-কুনহা। ডি মেলোর নেতৃত্বে যে দলটি বঙ্গে এল, তাঁরা চট্টগ্রামে না এসে চাকারিয়ায় এসে উপনীত হন। কিন্তু এখানেও মুরদের চক্রান্তে পর্তুগীজ ক্যাপিতান ডি মেলো দলবলসহ কারাগারে নিক্ষিপ্ত হন। তারপর গঙ্গায় অনেক জল বয়ে গেছে। চট্টগ্রামে ও সপ্তগ্রামে বঙ্গের 'পোর্টো গ্রাণ্ডি', 'পোর্টো পেকানো'য় পর্তুগীজগণ বাণিজ্যের অধিকার পেয়েছেন। অনেক তিক্ত অভিজ্ঞতা, দুঃখ-যন্ত্রণা ভোগ করে, প্রাণ দিয়ে, রক্ত ঝরিয়ে, শক্তির পরিচয় দিয়ে তবে এই অধিকার লাভ করেছেন। বঙ্গের রাজনৈতিক ঘোর সঙ্কটের অবস্থাটা তাঁদের বুঝতে দেরি হয় নি। ভ্যাসনকনসেলস, কোয়েলহো, আল কোকোরাদো, দিয়েগো, রেবেলো, সাম্পায়ো—সকলেই বুঝে নিয়েছিলেন বঙ্গের ত্রিশঙ্কু অবস্থাটা। একদিকে শের খাঁ ও তাঁর সহযোগী রাজ্যগুলি, অপরদিকে মোঘল সম্রাট হুমায়ুণ—এই দুই বহিঃশত্রু গৌড়ের সিংহাসনের ওপর থাবা বসাতে উদ্যত। বঙ্গের রাজা দুর্বল—মদ্যপ ভোগ-বিলাসী। দেশের সাধারণ মানুষ বা প্রজা-সাধারণ উদাসীন—শাসন ক্ষমতা কে অধিকার করলো না-করলো তা নিয়ে তাদের বিন্দুমাত্র মাথা ব্যথা নেই। তারা শান্তিতে থাকতে পারলেই খুশি। এতদ্ব্যতীত দেশের অভ্যন্তরে ব্রাহ্মণদের মুসলমান শাসন সম্বন্ধে বিদ্বেষ ধুমায়িত হয়ে উঠেছিল—হিন্দু রাজ্য প্রতিষ্ঠার স্বপ্নে বঙ্গের মুসলমান শাসকদের প্রতি তাদের শত্রুতাই প্রকাশ পাচ্ছিল। এইরূপ জটিল ও সংকটাপন্ন রাজনৈতিক অবস্থার চিত্রটি বুঝে নিয়ে পর্তুগীজগণ বঙ্গের রাজনৈতিক পরিস্থিতির মধ্যে নাক গলান ; তাঁরা মামুদ শাকে শের-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধে সাহায্য করেন, আর সেই সঙ্গে চট্টগ্রামে ও সপ্তগ্রামে প্রতিষ্ঠা করেন তাদের বাণিজ্যকুঠী ও সামরিক শক্তির ঘাঁটি দুর্গ। ভারতের রাজনীতিতে ইংরেজরা একদিন অংশ গ্রহণ করে শাসন ক্ষমতা যে ছিনিয়ে নিয়েছিল তারই প্রাথমিক পথ-প্রস্তুতি করেছিলেন পর্তুগীজগণ। বঙ্গের তথা ভারতের

রাজনীতিতে পর্তুগীজদেরই প্রথম পদসঞ্চার হ'ল। এরপর ভিন্ন দেশ, ভিন্ন জাতির সভ্যতা, সংস্কৃতি, শক্তি ভারতের বুকে সম্পূর্ণ অভিনব পদ্ধতির শাসন ব্যবস্থার পত্তন করবে।

৩. অর্থনৈতিক দিক :

ভারতের দক্ষিণ ও পশ্চিমে প্রথমে, এবং অতঃপর বঙ্গদেশের সঙ্গে বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদন করে, এবং বাণিজ্যকুঠী নির্মাণের অনুমতি লাভ করে, পর্তুগীজগণ বঙ্গের, তথা ভারতের অর্থনৈতিক কাঠামো ভেঙে দিয়ে এক নতুন কাঠামো নির্মাণের পথ সৃষ্টি করেন। অতএব ভারতের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নতুন পদসঞ্চার হ'ল, পর্তুগীজ বণিককুলের কুঠী ও দুর্গ নির্মাণে। সুদীর্ঘকাল ধরে আরবীয় বণিকগণ বঙ্গের মসলিন, তাঁত শিল্প, পাটশিল্প, কাঁসা-পিতল, গুড়, হলুদ প্রভৃতি নানা শিল্পজাত ও অন্যান্য পণ্য সামগ্রী ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে, ও ভারতের বাইরে এশিয়া, ইয়োরোপ, প্রভৃতি অঞ্চলে ব্যবসা করে প্রভূত অর্থোপার্জন করতেন। ভারতের বিশেষতঃ বঙ্গের শেঠ-বণিকগণ ভারত ও ভারতের বাইরে দূর সমুদ্রে বাণিজ্য যাত্রায় বেরুতেন। বঙ্গের বা ভারতের শিল্পজাত ও অন্য নানাবিধ পণ্য-সামগ্রী বহুদূর দেশে, বাইরের জগতে যথেষ্ট খ্যাতি লাভ করেছিল, এদেশীয় পণ্য সামগ্রীর চাহিদাও ছিল প্রভূত। বঙ্গ এবং সাধারণ ভাবে ভারত, প্রসন্না বরদা বাণিজ্যলক্ষ্মীর আশীর্বাদ লাভ করেছে। এমতাবস্থায় পর্তুগীজ বণিকগণ এদেশের সঙ্গে বাণিজ্য করতে এলেন অনেক দুঃখ-বিপদ-ঝঞ্ঝা পার হয়ে। প্রথম প্রথম তাঁরা এদেশের শিল্পীদের আশায় অতিরিক্ত লাভ দিলেও, ক্রমশঃ তাঁদেব বিশালকায় জাহাজ এসে কর্ণফুলী-সরস্বতীর জলে কালো ছায়া ফেলল। তাদের বিদেশী পণ্য সামগ্রীকে শুল্কবিহীন করে সুলভ করার চেষ্টা এবং এদেশীয় শিল্প সামগ্রীর ওপর চড়াহারে শুল্ক বসিয়ে এদেশের শিল্পের বাজারকে তিল তিল করে গলা টিপে হত্যা করতে উদ্যত হ'ল। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর রাজত্বকালে এদেশীয় খ্যাতিমান-সমৃদ্ধ শিল্পগুলির এমন নাভিশ্বাস অবস্থা করা হয় যে, এদেশের বস্ত্র-শিল্পীরা বিদেশীয়দের হাতে প্রচণ্ড ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে শিল্পোৎপাদন বন্ধ করতে একদিন বাধ্য হওয়ায়, ক্ষোভে-দুঃখে তারা নাকি নিজ নিজ আঙ্গুলগুলি কেটে ফেলে—যাতে আর শিল্পোৎপাদন করতে না হয়। "বাঙলার পথ-মাঠ-পাহাড়-নদী-বন-বনান্তর পার হয়ে সেই শব্দ ভেসে চলল ইতিহাসের দিগন্তে। আর তার সঙ্গে সঙ্গে একটা ভয়াবহ জাগ্রত স্বপ্নে বুঝি চমকে উঠল বাঙলা দেশের তাঁতীরা! একটা অস্পষ্ট অস্ফুট যন্ত্রণার মতো বুঝি তাদের মনে হ'ল—কারা যেন তীক্ষ্নধার অস্ত্র দিয়ে নিষ্ঠুর হিংসায় এক একটি করে তাদের হাতের আঙুলগুলো কেটে চলেছে!" —এই ভাবে এদেশের শিল্প-গুলিকে ধীরে ধীরে বিধ্বস্ত করে এদেশের বাণিজ্যলক্ষ্মীকে সমুদ্রের অতলে ডুবিয়ে পাশ্চাত্ত্য বাণিজ্যলক্ষ্মী এদেশের স্বর্ণ সিংহাসনখানি অধিকার করে নিলেন। পর্তুগীজ বণিককুলেব পদসঞ্চারেই পাশ্চাত্ত্য লক্ষ্মীর স্বর্ণঘট স্থাপিত হওয়ার সুযোগটি এসেছিল। বলা বাহুল্য, এর ফলে বাঙলার, তথা, ভারতের এতাবৎ কালের যে উজ্জ্বল স্বাস্থ্যের

অর্থনৈতিক কাঠামো ছিল, পর্তুগীজদের পদসঞ্চারে সেই কাঠামোটি কঙ্কাল প্রায়, রুগ্ন-শীর্ণ কাঠামোয় পরে পরিবর্তিত হয়েছিল।

৪· **ধর্মীয় দিক ঃ**

পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকেই একরূপ ধর্মে-উদার, পরমত-সহিষ্ণু বঙ্গের ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় হিন্দুর রাজত্ব প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখতে থাকেন। তাঁদের মুসলমান বিদ্বেষ তীব্র হলেও বাঙলার বণিক সম্প্রদায় বা সাধারণ মানুষের মনে এই ইসলাম বিদ্বেষ বিশেষ দাগ কাটে না।

বিপরীত দিকে শাক্ত-তান্ত্রিক ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় ধর্মের মহিমা ও কঠোর সাধনা হারিয়ে সুরা ও নারীদেহভোগরূপী ক্রিয়া ব্যাভিচারিতা গুলিকেই তান্ত্রিক সাধনায় পথ হিসেবে গ্রহণ করে ধীরে ধীরে সাধারণ মানুষের মনে ভীতি সঞ্চার করে অধঃপতনের পথে নেমে যেতে থাকেন। এতদ্ব্যতীত বাঙলার দরিদ্র নীচবর্ণের মানুষের ওপর এই ব্রাহ্মণদের এবং সমাজের উচ্চবিত্ত ও শাসক শ্রেণীর অত্যাচারও কম ছিল না। নীচবর্ণের দরিদ্র মানুষের অনেকেই সমাজ থেকে বিতাড়িত বা অত্যাচারিত হয়ে হিন্দুধর্ম ত্যাগ করে যাচ্ছিল। এমতাবস্থায় বঙ্গের অসংখ্য মানুষের আকুলকরা ডাকেই, ধর্মকে হিংসা-বিদ্বেষ-অবিশ্বাসে ডুবিয়ে না দিয়ে প্রেম ও ভক্তিতে সকলকে মাতিয়ে তুলতেই আবির্ভূত হলেন নিমাই—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। প্রথম প্রথম কাজীর দলন, এবং প্রথমাবধি ব্রাহ্মণ ও শাক্ত-তান্ত্রিকদের অত্যাচার শ্রীচৈতন্যের প্রেমধর্মের জয়যাত্রাকে বাধিত করতে পারল না। সমগ্র বঙ্গদেশ এবং বঙ্গের বাইরে নীলাচলে, গোদাবরী তীরে, ও উত্তর ভারতে যে প্রেম ধর্মই একদিন জয়লাভ করল তার পদসঞ্চার ঘটেছিল ষোড়শ শতাব্দীতে শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবে। বাঙলার ধর্মজগতে শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব ধর্ম ব্যতিরেকে সাহিত্যে, সমাজে, সংস্কৃতিতে প্রভৃতি নানাদিকে নবজাগরণ এনেছিল।

বাঙলার তথা, ভারতের ধর্মচর্চা ও ধর্ম সাধনার ক্ষেত্রে আরও এক নবধর্মের পদসঞ্চার হ'ল। পাশ্চাত্ত্যজাতির প্রতিনিধি হয়ে পর্তুগীজরা ভারতে এসেছিল প্রধান দুটি উদ্দেশ্য সফল করতে—(১) বাণিজ্য, (২) খ্রীস্ট ধর্ম প্রচার ও খ্রীস্ট ধর্মে দীক্ষিত করা। "পদসঞ্চার" উপন্যাসের প্রথম পরিচ্ছেদের শীর্ষোক্তিতেই পর্তুগীজদের এই উদ্দেশ্যটি ঔপন্যাসিক স্পষ্টভাবেই ব্যক্ত করেছেন : 'চাই ক্রীশ্চান, চাই মশলা'। উপন্যাসের শেষ পরিচ্ছেদে (তেইশ) নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় পর্তুগীজদের সেই স্বপ্ন যে সার্থক হ'ল সেটি দেখাতে ভোলেন নি। বাণিজ্যাধিকার তাঁরা পেয়েছেন। এখন ধীরে ধীরে তাঁদের ইগ্রেঝার চূড়া উঠবে স্পর্ধিত ইঙ্গিতে আকাশকে বিদ্ধ করতে। "তারা জানে, এই সোনার দেশ এবারে ধন্য হবে মা মেরীর পুণ্য নামে—জেন্টুরদের মন্দির ছাড়িয়ে আকাশে উঠবে ইগ্রেঝার চূড়ো—ক্রীশ্চান ধর্মের আশ্রয়ে এসে তারা লাভ করবে মুক্তির পরমার্থ। খ্রীষ্টের করুণার অভিষিক্ত হয়ে যাবে পৌত্তলিকতার দাবদাহ।" [পরিঃ তেইশ]

পরিচ্ছেদের সমাপ্তিলগ্নে এসে ঔপন্যাসিক সহসা আবিষ্কার করেন দেবদাসী শম্পা যিনি একদিন সমুদ্রে ভেসে গিয়েছিলেন মনে হয়েছিল, তিনি এখন খ্রীষ্টের সেবিকা, সন্ন্যাসিনী। এদেশীয় কৃষ্ণকায়রা যে ধীরে ধীরে খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত হয়েছেন, অর্থাৎ বাইরের জগতের এক নতুন ধর্মেরও যে পদসঞ্চার ঘটল, তারই ইঙ্গিত দিয়েছেন ঔপন্যাসিক : "কুঠীর ঘাটে একখানা জাহাজ নোঙর করে আছে। আর সেই জাহাজ থেকে নামছে একদল ক্রীশ্চান সন্ন্যাসী আর সন্ন্যাসিনী।" [পরিঃ তেইশ] অতএব এদিক থেকেও 'পদসঞ্চার' নামটি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ।

সুতরাং, আলোচ্য উপন্যাসটির নাম "পদসঞ্চার" যে নানা দৃষ্টিকোণ থেকেই তাৎপর্যপূর্ণ, ব্যঞ্জনাধর্মী এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এই নামকরণ প্রসঙ্গে আরও একটি কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন। উপন্যাসটির প্রারম্ভে 'লেখকের কথা' অংশে ঔপন্যাসিক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছেন : "কয়েক বছর আগে শারদীয়া আনন্দ-বাজারে 'পদসঞ্চার' নামে একটি গল্প লিখেছিলাম।......এই উপন্যাসে কিঞ্চিৎ সংক্ষিপ্ত ও পরিবর্তিত রূপে সেটি 'কথামুখ' নামে চিহ্নিত হয়েছে।" —অতএব উপন্যাস রূপ নেওয়ার আগেই উপন্যাসের ভ্রূণরূপী গল্পটির নামকরণ করেছিলেন তিনি "পদসঞ্চার।" তখন "পদসঞ্চার" কথাটির প্রধান তাৎপর্য ছিল ভারতের বুকে পশ্চিমী শক্তির পদসাঞ্চর ঘটল যেদিন পর্তুগীজ বণিক এদেশে প্রথম বাণিজ্যকুঠী ও দুর্গ নির্মাণ করল। সংকল্প হল চাই মশলা, চাই ক্রীশ্চান। পর্তুগালের রাজা উপাধি নিয়েছেন : "ইথিওপিয়া আরব, পারস্য আর ভারতবর্ষের বাণিজ্য আর বিজয়ের অধিপতি!" পরবর্তীকালে ইংরেজ বণিকরা সত্যসত্যই ভারতবর্ষের অধিপতি হয়েছিলেন। সুতরাং যেদিন পর্তুগীজগণ প্রথম ভারতের বুকে বাণিজ্যকুঠী ও দুর্গ নির্মাণ করলেন, সেইদিন থেকেই ভারতের মাটিতে পশ্চিমী শক্তির পদসঞ্চার হল। গল্পের এই তাৎপর্য উপন্যাসে অনেক বিস্তৃত ও জটিল কাহিনীর মধ্যেও অক্ষত থেকেছে। অধিকন্তু আরও নানাদিক থেকে "পদসঞ্চার" শব্দটি ব্যাঞ্জনাময় হয়ে উঠে নামকরণটিকে নানাদিক থেকে শিল্প-সার্থক করে তুলেছে।

সাত

চরিত্র চিত্রণ

উপন্যাসের উপাদানগুলির মধ্যে একমাত্র চরিত্র সম্পর্কেই 'সৃষ্টি' কথাটি ব্যবহার করা হয়। গল্প—বলা, শিল্প-কাহিনী—গঠন করা, সংলাপ—রচনা, কিন্তু, চরিত্র—সৃষ্টি করা। বিশ্বজগতের স্রষ্টা হিসেবে যেমন প্রজাপতি ব্রহ্মাকে কল্পনা করা হয়, কাব্য-সাহিত্যের সংসারে তেমনি সেই স্রষ্টার আসনটি কবির। সাহিত্য জগতের চরিত্রগুলি কবি-শিল্পীরই মানস-সন্তান। ঔপন্যাসিক তাঁরই পরিচিত জগতের প্রত্যক্ষ, অথবা পরোক্ষ অভিজ্ঞতার মূলধন নিয়ে চরিত্রগুলি সৃষ্টি করেন ঠিকই, তবু সৃষ্ট চরিত্রগুলি শুধুমাত্র অভিজ্ঞতার বস্তু বা উপাদান দিয়েই গড়া নয়। অর্থাৎ, লেখক বাইরের জগতে যেমন দেখেন, শোনেন, বা পড়েন, ঠিক তেমনটি নয় তাঁর সৃষ্ট চরিত্র ; তার সঙ্গে যুক্ত হয়, তিনি কেমনভাবে দেখেন ; শুনে বা পড়ে কি ভাবে গ্রহণ করেন ? সংক্ষেপে, শিল্পীর বাইরের জগতের অভিজ্ঞতা, সাক্ষ্য—শিল্পীর কল্পনা, ধ্যান-ধারণা-দৃষ্টিভঙ্গী ; উপন্যাসের চরিত্রগুলিকে ঔপন্যাসিক শুধুমাত্র পাঠকের কৌতূহলের বিষয় করে সৃজন করেন না, পাঠকের কল্পনা ও বোধির কাছেও চরিত্রগুলির আবেদন। কারণ, ঔপন্যাসিক চরিত্র গুলির ওপর মূল্য (values) আরোপ করেন।

চরিত্রগুলিকে মনস্তত্ত্বের দিক থেকে ঔপন্যাসিক দু'রকম পদ্ধতিতে উপস্থিত করতে পারেন : (১) "......the novelist portrays his characters from the out side, dissects their passions, motives, thoughts and feelings, explains, comments, and often pronounces authoritative judgment upon them. অথবা (২) তিনি নিজে দূরে সরে থাকেন, এবং —"allows his characters to reveal themselves through speech and action, and reinforces their self-delineation by the comments and judgments of other characters in the story. প্রকারভেদে চরিত্রগুলি তিন প্রকারের হতে পারে—(i) সরল (simple or flat) (ii) বিশেষ এক শ্রেণীর বা ধরনের (type), এবং (iii) জটিল (round)। জটিল চরিত্রগুলিকে আবার দু'ভাগে ফেলা যায়—বহির্মুখী (extrovert), এবং অন্তর্মুখী (introvert)।

বলাবাহুল্য ঔপন্যাসিক এই সব তত্ত্বকথা মনে রেখে বা চরিত্রের শ্রেণীবিভাগ মাথায় রেখে, চরিত্র সৃষ্টি করতে বসেন না। তিনি সৃষ্টির আনন্দে নিজেকে সরাসরি হাজির করে ফেলেন ; কখনও চরিত্রের আড়ালে নিজেকে গোপন রাখেন ; কখনও নিজের আদর্শ-বিরোধী চরিত্রও সৃষ্টি করতে পারেন ; কখনও নিজের ধ্যান-স্বপ্ন-আদর্শের মানুষও নির্বাচন করতে পারেন। কিন্তু সমাজের কায়াটি গঠন করতে তাঁকে গুণ্পানুযায়ী কতকগুলি বিশেষ ধরনের বা ভাব প্রকৃতির (types) চরিত্র সৃষ্টি করতেই হয়। তবে ঔপন্যাসিক নিজেকে যতখানি দূরে সরিয়ে রেখে বা 'detach' রেখে বাইরের জগৎ থেকে চরিত্রগুলি গ্রহণ করতে পারেন তারা সেই পরিমাণে 'true to life' বা জীবননিষ্ঠ হয়ে উঠতে পারে। প্রতিভাসম্পন্ন, শক্তিমান লেখকই পারেন জীবনরসে সমুজ্জ্বল চরিত্রাঙ্কন করতে।

ঐতিহাসিক এবং ঔপন্যাসিক উভয়েরই কাহিনীর অবলম্বন, চরিত্র। আরও সুস্পষ্ট ভাবে, উভয়েই চরিত্রের কাহিনী রচনা করেন। ঐতিহাসিক সেইরূপ চরিত্র অবলম্বন করেন, যে-চরিত্র সেই ঘটনাগতির কারণ, বা স্রষ্টা। তিনি চরিত্র সৃষ্টি করেন না ; ঘটনা ধারা থেকে চরিত্রকে যেমন পান, তেমনি দেখান। কিন্তু ঔপন্যাসিকের কাজ হ'ল চরিত্রের গোপন উৎস, আবিষ্কার করা, লোকচক্ষুর অন্তরালে যে জীবন স্পন্দিত, তাকে উদ্ঘাটিত করা, উদ্ভাসিত করা। ইতিহাসের চরিত্র যদি তিনি গ্রহণ করেন, তাহলে ইতিহাসের ঘটনার আড়ালে যে ব্যক্তি-হৃদয়টি থাকে, তাকে আবিষ্কার করেন, তার অন্তরালশায়ী জীবনকে আলোকিত করেন—ঐতিহাসিক সে পরিচয়ের সন্ধান রাখেন না।

"পদসঞ্চার" ঐতিহাসিক উপন্যাস। এর দুটি অংশ—ঐতিহাসিক অংশ, এবং উপন্যাস অংশ। ঐতিহাসিক ঘটনা ও চরিত্র যেমন এর একটি দিক, তেমনি অপর একটি দিক হ'ল, কাল্পনিক ঘটনা ও চরিত্রাঙ্কন। "পদসঞ্চারের"-এর চরিত্রগুলিকে তাই প্রধানত দুটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়—ঐতিহাসিক চরিত্র, এবং কাল্পনিক, বা উপন্যাসের চরিত্র। এই দুই শ্রেণীর চরিত্রের মধ্যবর্তী আর এক শ্রেণীর চরিত্রও ঔপন্যাসিক তাঁর শিল্প-সাফল্যের জন্য "পদসঞ্চার"-এ অঙ্কন করেছেন,—যারা আধা-ঐতিহাসিক, ও আধা-কাল্পনিক। ভাস্কো-ডা-গামা, ডি মেলো, ডি-কুনহা, ভ্যাস্‌কন্‌সেলস, কোয়েলহো দিয়াগো রেবেলো, সাম্পায়া প্রভৃতি পর্তুগীজ চরিত্র এবং হুমায়ুন, শের খাঁ, খোদাবক্স খাঁ, মামুদ শা, অলিফা হাসানী, শিহাবুদ্দীন, শ্রীচৈতন্য, রায়রামানন্দ প্রভৃতি ভারতীয় ঐতিহাসিক চরিত্র। শঙ্খ দত্ত, সুপর্ণা, রাজশেখর, ধনদত্ত, রাঘব প্রভৃতি কাল্পনিক চরিত্র। আর, কেশব পণ্ডিত, শম্পা, উদ্ধারণ দত্ত, সোমদেব প্রভৃতি চরিত্রগুলিকে আধা-ঐতিহাসিক, এবং আধা-কাল্পনিক চরিত্র বলা যেতে পারে। অবশ্য এই তৃতীয় শ্রেণীর চরিত্রগুলিকে উপন্যাসের কাল্পনিক চরিত্রেরই শ্রেণীভুক্ত করলে অযৌক্তিক হবে না।

"পদসঞ্চার"-এ অবলম্বিত ইতিহাসের ঘটনা ও কাহিনীর সঙ্গে যুক্ত ছোট বড় অসংখ্য চরিত্র আছে। এর মধ্যে পর্তুগীজ ক্যাপিতান ডি মেলো এবং গৌড়েশ্বর মামুদ শাহ-ই প্রধান। 'কথামুখ' অংশে ভাস্কো-ডা-গামা এবং কালিকটের জামোরিন স্বল্পায়তনে

উজ্জ্বল হয়েছেন, যেমন উজ্জ্বল হয়েছেন চাকারিয়ার নবাব খোদাবক্স খান। এতদ্‌সত্ত্বেও প্রধান চরিত্র বলতে ডি মেলো, এবং মামুদ শা। বাহ্যতঃ ডি মেলোই ইতিহাস অংশের নায়ক। সমগ্র উপন্যাসের নায়ক তাঁকে বলা যায় কি?

॥ **ভাস্কো-ডা-গামা** ॥

ইতিহাসে উল্লিখিত বিদেশী পর্তুগীজ চরিত্রগুলি সম্পর্কে বিশেষ বলার আর কী আছে? ভাস্কো-ডা-গামা, রাজা মনোএল-এর প্রতিনিধি হয়ে ভারতে আসেন ১৪৯৮ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই-আগষ্ট মাসে। ভারতের সঙ্গে বাণিজ্য করার আশায় দীর্ঘদিন ধরেই ভারতে আগমনের জলপথ আবিষ্কারের চেষ্টা চলছিল। পর্তুগীজগণ এ বিষয়ে অগ্রণী। অবশেষে একদিন ভাস্কো-ডা-গামা দক্ষিণ ভারতের মালাবার উপকূলের কালিকট বন্দরে কয়েকজন অনুচর সহ এসে পৌঁছান। পথে তাঁদের অনেক ঝড়-ঝঞ্ঝা, দুঃখ-কষ্ট ভোগ করতে হয়। ভারতের মাটিতে পা দিয়ে তীব্র এক প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন তাঁকে হতে হয়। প্রতিবন্ধকতা আসে মুর ও মোপ্‌লা বণিকদের কাছ থেকে। এই মুরদেরই প্রচণ্ড মার-মেরে ইয়োরোপের কূল থেকে বিতাড়িত করেছেন পর্তুগীজরা। ভারতের সঙ্গে বাণিজ্য করতে এসে বুঝতে পারলেন—ভাস্কো-ডা-গামা, এখানের বাণিজ্য এবং রাজদরবারে মুর ও মোপ্‌লা বণিকদেরই একাধিপত্য। এমন কি দেশের শাসনব্যবস্থায়ও তাঁদের প্রভাব এতই যে, রাজকর্মচারীরা অনেকেই তাঁদের বশ, রাজাও অনেক সময় তাঁদের নির্দেশমত কর্তব্যাকর্তব্য স্থির করতেন। এমতাবস্থায় ইয়োরোপের ও অন্যত্র পরাজিত মুরেরা পর্তুগীজদের লাঞ্ছিত-অপদস্থ করতে বদ্ধপরিকর। এদেশে পর্তুগীজরা যাতে বাণিজ্যাধিকার না পায়, আরবেবের প্রভুত্বের অংশীদার না হতে পারেন, তারই প্রাণপণ চেষ্টা চলতে থাকে।

সুতরাং কালিকটে এসে ভাস্কো-ডা-গামাকে বেশ তিক্ত অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে হয়। তাঁদের বিরুদ্ধে দস্যুতার অভিযোগ; তাঁদের বাণিজ্যে বাধা দান, তাঁদের সঙ্গে নানারূপ প্রতারণা, এবং জামোরিনের অগোচরেই নানারূপ অত্যাচার ও নিষেধাজ্ঞা জারি প্রভৃতি তিক্ত ও যন্ত্রণাদায়ক অভিজ্ঞতা নিয়েই তাঁকে প্রথমবার ফিরতে হয়। ক্ষয়-ক্ষতিও কম হয় নি তাঁর। ব্যবসায়ে আর্থিক ক্ষতি ছাড়াও, আত্মীয়-বন্ধুও দু'চারজনকে হারাতে হয়।

১৫০২-০৩ সালে দ্বিতীয় বার ভাস্কো-ডা-গামা ভারতে আসেন। এর মধ্যে অবশ্য ভারত অভিযান বন্ধ ছিল না। পেড্রো কাব্রাল নামক জনৈক পর্তুগীজ পোতাধ্যক্ষকেও কালিকট বন্দরে একই রূপ তিক্ত অভিজ্ঞতা নিয়ে ফিরতে হয়। সঙ্গের চল্লিশ জন সঙ্গীকে মুরদের হাতে বলি দিয়ে ফিরে যান তিনি। অতএব দ্বিতীয়বার ভারতে এসে ভাস্কো-ডা-গামা আরবীয়দের ওপর এবং এদেশের ওপর চরম আঘাত হানতে দ্বিধা করেন নি। প্রতিশোধ স্পৃহাই তাঁর তীব্র হয়ে উঠেছিল। কালিকট বন্দরে তিনি কামান দাগেন, ধ্বংস করেন অনেক ঘর-বাড়ী প্রাণ ও জাহাজ ভর্তি হজ যাত্রীকে বন্দুকের

গুলিতে নৃশংসভাবে বধ করে, হাত-পা-কান-নাক কেটে নৌকায় বেঁধে আগুন ধরিয়ে কূলের দিকে পাঠিয়ে দেন, জামোরিনের নৈশ ভোজের উপহার হিসেবে। অসহায় কালিকটের জামোরিন সন্ধি প্রার্থনা করলে হেসে উড়িয়ে দেন তিনি ; কোচিন ও কানানোর থেকেও সন্ধির প্রস্তাব পাঠানো হয় ভাস্কো-ডা-গামার কাছে।

এই তো ভাস্কো-ডা-গামার চরিত্র এবং কৃতিত্ব। ইতিহাসকার এর বেশী কিছু বলেন নি। ভাস্কো-ডা-গামার সহযোদ্ধা এবং কবি ক্যামোয়েন্স তাঁর 'লুসিয়াদাস' কাব্য গ্রন্থে ভাস্কো-ডা-গামার শুধু উচ্ছ্বসিত প্রশংসাই নয়, তাঁকে প্রায় দেবতার পর্যায়ে উন্নীত করেছেন। খুবই স্বাভাবিক তাঁর পক্ষে। কিন্তু ইতিহাসের পক্ষে বা শিল্পের পক্ষে একে গ্রহণ করা যায় না।

ইতিহাসের সামান্য উপাদান নিয়েই অত্যন্ত স্বল্প পরিসরে ঔপন্যাসিক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ভাস্কো-ডা-গামার চরিত্রের একটি রেখা-চিত্র অঙ্কন করেছেন 'পদসঞ্চার'-এর 'কথামুখ' অংশে।

ভাস্কো-ডা-গামার চরিত্রে প্রকাশ পেয়েছে নিজ দেশের রাজার প্রতি আনুগত্য ও গভীর শ্রদ্ধা, তাঁর বীরত্ব ব্যঞ্জক চেহারার প্রত্যেক ভঙ্গিমায়, দৃষ্টির তেজে প্রকাশ পেয়েছে তাঁর বীর, দুঃসাহসী যোদ্ধার চরিত্র, প্রখর আত্মসম্মান জ্ঞান অথচ দলের সেনাপতি হিসেবে পরিস্থিতি অনুযায়ী বিবেচকও তিনি। এর সঙ্গে আছে এদেশের ঐশ্বর্য দেখে দু'চোখে লোভের আগুন। লেখক অল্প অল্প তুলির টানে ভাস্কোর চরিত্রটিকে একটি উজ্জ্বল কাঠামো দিয়েছেন।

"এরই একটি কক্ষে খাঁচায় বন্দী বাঘের মতো পায়চারী করেছেন ক্রীশ্চান সেনাপতি। কটিলগ্ন দীর্ঘ তরবারিটি চলার তালে তালে সাড়া দিয়ে উঠছে তাঁর।" "ঘরটি প্রায়ান্ধকার, তাব ভেতরে পদচারণা করতে করতে সেনাপতির চোখ, থেকে থেকে আগুনের পিণ্ডের মতো জ্বলে উঠেছিল।" —ঔপন্যাসিকের কয়েকটি কালির আঁচড়েই সেনাপতির দুর্ধর্ষ, প্রচণ্ড শক্তিশালী চেহারার মধ্যে ক্রোধ ও হিংসার আগুন জ্বলছে ধিকি ধিকি। জলদস্যু বলায় সেনাপতি 'আহত কেউটে সাপের মতো ফুঁসে উঠলেন'—'আহত কেউটের চিত্রকল্পে ভাস্কোর হিংস্র ভয়ঙ্কর স্বভাবটি ফুটে উঠেছে।

বিপদে পোড় খাওয়া তাঁর শরীরের ওপর প্রভুত্ব করছে অকুতোভয় নির্ভীক ব্যক্তিত্বটি : "ডেকের এখানে-ওখানে রক্ষীরা পর্যন্ত ঝিমুচ্ছে। কিন্তু সেনাপতির চোখে ঘুম নেই—নেই বিন্দুমাত্র তন্দ্রার আচ্ছন্নতা।......

"আতাম্র শ্মশ্রুগুচ্ছ মুঠোর মধ্যে আঁকড়ে তিনি ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন চিন্তামগ্ন পদক্ষেপে। সপ্ত-সমুদ্র পার হয়ে তাঁর এই সুদীর্ঘ যাত্রাপথের সে কি ভয়ঙ্কর ইতিহাস !... একদিকে যে কোন মুহূর্তে জাহাজ ডুবে যাওয়ার সম্ভাবনা, অন্যদিকে বিদ্রোহী নাবিকদের সমবেত দাবী আমরা দেশে ফিরে যাবো।

"ঝড়ের গর্জন ছাপিয়ে সেনাপতির চিৎকার ধ্বনিত হয়েছিল : না, হিন্দে না পৌঁছে আমাদের ফেরার পথ বন্ধ। রাজা মনোএলের জয় হোক—মা মেরী আমাদের রক্ষা করুন !"

ভাস্কো-ডা-গামার ব্যক্তিত্বটি বিরাট হয়ে উঠেছে তাঁর ধর্ম বিশ্বাসে এবং রাজা মনোএলের প্রতি শ্রদ্ধায় ও আনুগত্যে। বিদেশে অসহায় অবস্থায়, মুর শত্রু পরিবেষ্টিত বলে কী বীর যোদ্ধা ভাস্কো-ডা-গামা আত্মসম্মান বিসর্জন দিতে পারেন? তাঁর ধর্মকে কেউ গালিগালাজ করলেও কি আহত হওয়ার ভয়ে সেনাপতি ভাস্কো চুপ করে থাকতে পারেন? কখনই না; বীরের ধর্মই তা নয়। অতএব হিন্দের মাটিতে তাঁদের পণ্য-সামগ্রী যাতে কেউ না কেনে সে বিষয়ে আরবেরা যখন উঠে পড়ে লাগে এবং তাঁদের লক্ষ্য করে গালাগালি ও অসম্মান করে বলে: "একটা গুপ্তচর ক্রীশ্চান কুকুরের জন্যে বাঁ পায়ের নাগরাই যথেষ্ট—" প্রত্যুত্তরে সেনাপতি ভাস্কো গালি দিলেন না,—তাঁদের ওপর ঝাঁপিয়েই পড়লেন—"হাতের দীর্ঘ তলোয়ার লকলক করে উঠল।"

প্রথমবার ভাস্কো-ডা-গামা মুরদের সমবেত আক্রমণ থেকে বাঁচবার জন্য রাতের অন্ধকারে পালিয়ে যান। কিন্তু দ্বিতীয়বার যখন ফিরে আসেন তিনি হিন্দের মাটিতে, তখন দৃঢ় সংকল্প নিয়েই এসেছিলেন: প্রত্যেকটি অপমানের, ক্রীশ্চান হত্যার শোধ কড়ায়-গণ্ডায় তিনি মিটিয়ে দেবেন। দিয়েছিলেনও। মক্কা যাত্রী তীর্থকামী আরবদের জাহাজ, কামান দিয়ে ধ্বংস করেছেন, জলের অতলে ডুবিয়ে দিয়েছেন নারী-শিশু কারুকে রেহাই দেন নি—ক্রিশ্চান করতে হবে তাদের। কারণ রাজা মনোএলের আদেশ—'চাই ক্রীশ্চান, চাই মশলা।' কালিকট বন্দরে তিনি কামানের গোলায় আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছেন। স্থানীয় জেলে-মাঝি, মুর—যাকে পেয়েছেন হাত-পা-মাথা কেটে স্তূপীকৃত করে নৌকায় বেঁধে আগুন জ্বালিয়ে কূলের দিকে ঠেলে দিয়েছেন। জামোরিনের নৈশ ভোজ হবে! একদিনের অপমান, লাঞ্ছনা, চোখের জল এইভাবে প্রতিশোধের আগুন হয়ে ঝরছে ভাস্কোর চোখে আর অসামান্য দক্ষতায় পর্তুগীজ চরিত্রটিকে একটি টানে শিল্পী ভয়ঙ্কর, নিষ্ঠুর দানবীয় চরিত্রে রূপান্তরিত করেছেন, অবলীলাক্রমে।

ইতিহাসের সামান্য উপাদান নিয়ে ভাস্কো-ডা-গামার চরিত্রকে শিল্পরূপ দিতে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় চরিত্রটির অনুভূতিলোকে প্রবেশ করেছেন। ভাস্কোর ক্রোধ, বিদ্বেষ, প্রতিহিংসা, পর্তুগীজ জাতিসুলভ তেজস্বীতা ও বীরত্ব—সবই যেন যাঁর ব্যক্তিত্ব সঞ্জাত, প্রাণ স্পন্দনে স্পন্দিত। চরিত্রটি **simple** বা **flat** হওয়া ছাড়া কোনো উপায় ছিল না—কারণ 'কথামুখে'র স্বল্প পরিসরে শিল্পী ভাস্কোর নির্দিষ্ট ভূমিকাটুকু মাত্র নিষ্পন্ন করেই তাঁকে সরিয়ে দিয়েছেন। ভাস্কোর চরিত্র নির্মিতিতে সাফল্যের চাবিকাঠি হ'ল: শিল্পী নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় কখনও '**narrative**' এবং কখনও '**dramatic**' এই দুই রীতিকে টানা ও পোড়েনের মত ব্যবহার করে চরিত্রটিকে জীবন্ত ও উজ্জ্বল করে তুলেছেন।

॥ মার্টিম অ্যাফনসো ডি মেলো ॥

ভারতের দক্ষিণ ও পশ্চিম উপকূলে পর্তুগীজদের বেশ কয়েকটি ঘাঁটি এবং রাজ্যপাট স্থাপিত হওয়ার পর বঙ্গে বাণিজ্যাধিকার লাভের আশায় পর্তুগীজগণ অভিযান

শুরু করেন। বঙ্গে তাঁদের বাণিজ্যাধিকার লাভই "পদসঞ্চার" উপন্যাসের প্রধান ঐতিহাসিক কাহিনী; আর এই ঐতিহাসিক কাহিনীর বাহ্যত নায়ক মার্টিম অ্যাফনসো ডি মেলো। বঙ্গের উদ্দেশ্যেই তিনি আসছিলেন না অবশ্য; দৈবই যেন তাঁকে বঙ্গের কূলে নিয়ে এসে ফেললো; কিংবা একটু অন্যভাবে— ইতিহাসই নিজের প্রয়োজনে তাঁকে বঙ্গের ঘটনাবর্তের মধ্যে ফেলে, আপন করে নিল। ডি মেলো হয়ে উঠলেন ইতিহাসের পুরুষ; হয়ে উঠলেন নায়ক সদৃশ।

বঙ্গে পর্তুগীজ বণিকদের বাণিজ্য করার, কুঠী স্থাপনার, এবং দুর্গ প্রতিষ্ঠার ইতিহাস-কাহিনীতে ডি মেলো যেভাবে জড়িয়ে পড়েন, তার গল্পটি সংক্ষেপে এইরূপ: কালিকটের সেনাপতির আক্রমণের হাত থেকে পর্তুগীজরাজ-আশ্রিত সিংহলের রাজাকে রক্ষা করতে যুদ্ধ জাহাজ নিয়ে যাচ্ছিলেন ডি মেলো সিংহলের উদ্দেশ্যে। তাঁর আগমনের সংবাদ পেয়েই কালিকটের সেনাপতি পালিয়ে যান, কিন্তু ডি মেলোর আর সুন্দার দুর্গে পৌঁছানো হ'ল না। পথে প্রচণ্ড ঝড়-ঝঞ্ঝায় তাঁর তিনটি জাহাজ, কে কোন্ দিকে ভেসে চলে গেল। একটি ছোট জাহাজে করে কিশোর ভাইপো গঞ্জালো এবং আর কয়েকজন সঙ্গী নিয়ে ভাসতে ভাসতে ভাঙা জাহাজে একটি বালির চড়ায় এসে কোনক্রমে উঠলেন। অতঃপর ক্ষুধা-তৃষ্ণার তাড়না ও আরও নানা দুর্ভোগের পর হঠাৎ একদিন তিনজন আরাকানী জেলে একটি কাঠ ধরে ভাসতে ভাসতে সেই চড়ায় এসে উঠলো। তারা ভরসা দিল, ডি মেলো তাদের এখান থেকে উদ্ধার করলে তারা তাঁকে বঙ্গের চট্টগ্রাম বন্দরে—পোর্টো গ্রাণ্ডি পৌঁছিয়ে দেবে। ডি মেলো ভাবেন অভাবিত এ সুযোগ তাঁর কাছে। কারণ, তিনি ডি কুনহার প্রেরিত প্রতিনিধি নন যে, নবাব তাঁকে অভ্যর্থনা করবেন। যাই হোক, আরাকানী জেলে থুন্দসান তাঁকে চট্টগ্রামের নাম করে চাকারিয়ায় নিয়ে এল। এখানকার নবাব খুদাবক্স খাঁ, তখন প্রতিবেশী এক সামন্ত-রাজ্যের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন। তিনি ক্যাপিতান ডি মেলোকে জানান, ডি মেলো তাঁকে যদি যুদ্ধে সাহায্য করতে রাজী থাকেন, তাহলে বাঙলায় বাণিজ্য করার এবং কুঠী নির্মাণের অধিকার যাতে তাঁরা পান, সে ব্যবস্থা তিনি করে দেবেন। ডি মেলো এ প্রস্তাবে রাজী হতে পারেন না; কারণ গোয়ার রাজা নুনো ডি-কুনহার নির্দেশ, এখন কারুর সঙ্গে শত্রুতা বা মারামারি নয়—চাই শান্তি, বন্ধুত্ব। মুর সভাসদের সঙ্গে পরামর্শ করে খুদাবক্স ডি মেলোকে অনুচরসহ বন্দী করলেন। কারাগারে নিক্ষিপ্ত হওয়ার পর হারিয়ে যাওয়া আর দুটি জাহাজের ক্যাপিতান ভ্যাসকনসেলস্ এবং কোয়েলহো এসে হাজির। তাঁরা নবাবকে যে মুক্তিপণ দিয়ে ডি মেলোকে দলবলসহ মুক্ত করতে চাইলেন, তা ব্যর্থ হ'ল। শেষে কারাগার থেকে পালিয়ে যাবার একটা ষড়যন্ত্র করা হয়; কিন্তু সেটিও জানাজানি হয়ে ব্যর্থ হয়ে যায়। দুঃখের বিষয়, ডি মেলোর ভ্রাতুষ্পুত্র, কিশোর গঞ্জালো কারাপ্রাচীরের বাইরে এসে ব্রাহ্মণের হাতে প্রাণ দেয়।

খাজা শিহাবুদ্দিন নামে জনৈক ধনী পারস্য ব্যবসায়ীর তৎপরতায় অবশেষে মুক্তি লাভ করে ডি মেলো গোয়ায় প্রত্যাবর্তন করেন। পরে বন্ধু খাজা শিহাবুদ্দিনের

উপকারার্থে এবং তাঁর সাহায্যে বঙ্গে বাণিজ্যাধিকার লাভ করা যাবে এই আশ্বাসে গোয়ার মাননীয় রাজা ডি কুনহার প্রতিনিধি রূপে ডি মেলোকে আবার বঙ্গে আসতে হ'ল দলনেতা হয়ে। চট্টগ্রামে তিনি অভ্যর্থিত হলেন, কিন্তু গৌড়েশ্বরের অনুমতিলাভের জন্য কিছু উপঢৌকন দিয়ে তিনি কয়েকজনকে গৌড়ে পাঠিয়ে, চট্টগ্রামে নিজে বিশ্রাম করতে লাগলেন। কিন্তু কিছুদিন পরে সহসা বন্দরের গুয়াজিল এসে তাঁকে দলবলসহ এক নৈশ ভোজসভায় নিমন্ত্রণ করলেন, এবং জানালেন বঙ্গে বাণিজ্যের সম্মতিসূচক গৌড়েশ্বরের ফারমান রাজসভায় ডি মেলোর হাতে তুলে দেওয়া হবে। কিন্তু নিমন্ত্রণ সভায় ফল হ'ল বিপরীত। বুঝলেন নবাবের চক্রান্ত। দলবল সমেত কিছু হতাহত হয়ে ডি মেলো সৈনিকদের হাতে বন্দী হলেন, এবং গৌড়ে স্থানান্তরিত হলেন, যেখানে তাঁর প্রেরিত দূত আজেভেদো, আলকোকোরাদো প্রমুখেরা আগেই বন্দী হয়েছিলেন, গৌড়ের সুলতান মামুদশাহকে লুটের সামগ্রী উপঢৌকন স্বরূপ দেওয়ার কারণে। ডি কুনহা বারবার প্রতিনিধি পাঠিয়ে মামুদ শাহকে সাবধান করে দিলেন—ডি মেলোকে মুক্তি না দিলে, চট্টগ্রাম থেকে সপ্তগ্রাম পর্যন্ত আগুন জ্বলবে, রক্তের স্রোত বইবে। বঙ্গের রাজনৈতিক সংকট উত্তরোত্তর জটিল হওয়ায়, অবশেষে, মামুদ শা ডি মেলোকে মুক্তি দিলেন, এবং শের খাঁ-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধে পর্তুগীজ সাহায্য ভিক্ষা করলেন। ডি মেলো কম্পিত হস্তে ঐতিহাসিক চুক্তি পত্রে স্বাক্ষর করলেন। পর্তুগীজরা বঙ্গে বাণিজ্য করার আদেশ এবং কুঠী স্থাপনা ও দুর্গ নির্মাণের সম্মতি পেলেন। পর্তুগীজ ইতিহাসের এক স্মরণীয় পুরুষ হয়ে রইলেন ডি মেলো।

এ তো ডি মেলোর চরিত্র নয়—ডি মেলোর জীবন-ইতিহাসের একটি অংশ, জীবনের গল্পাংশ। এই উপাদান থেকে শিল্পী নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর উপন্যাসের চরিত্রটি নির্মাণ করেছেন, যেমনভাবে মৃৎশিল্পী প্রতিমা নির্মাণ করেন—খড়, মৃত্তিকা প্রভৃতি উপাদানে। প্রতিমা নির্মাণ করলেই হয় না, তাতে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করতে হয়। চরিত্র রচনায় ক্ষেত্রেও তাই। শিল্পীর স্বচ্ছ জীবনদর্শন, এবং কবি-কল্পনাই চরিত্রে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করতে পারে, তাকে জীবন্ত করে তুলতে পারে।

ডি মেলোর জীবনের এই গল্পাংশটিকে চরিত্রে রূপান্তরিত করতে ঔপন্যাসিক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় কখনও বর্ণনার বা বিবৃতির আশ্রয় নিয়েছেন, কখনও নাট্যরীতির আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। ফলে, ভাবনা চিন্তা সমৃদ্ধ একটি গতিশীল চরিত্র হয়ে উঠেছেন ডি মেলো।

ডি মেলো চরিত্রের সবচেয়ে লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হ'ল, চরিত্রের দৃঢ়তা, নির্ভীকতা এবং ধৈর্য ও সহনশীলতা। আর চরিত্রের নির্ভীক দৃঢ়তা যেন নিজদেশের রাজানুগত্যের আদর্শের মৃত্তিকায় শিকড় চালিয়েই রস আহরণ করেছে। চরিত্রের গল্পাংশটি 'flat', সরল জাতীয় হলেও, ঔপন্যাসিকের সৃজনকৌশলে গল্পের গতির সঙ্গে ধীরে ধীরে চরিত্রটি গড়ে ওঠে। বঙ্গের উদ্দেশ্যে ভেসে চলেছেন ডি মেলো। ভাইপো গঞ্জালো তাঁকে প্রশ্ন করে বঙ্গের সঙ্গে যুদ্ধের সম্ভাবনা হলে কী করবেন ডি মেলো? ডি মেলো

মনে করেন, যুদ্ধের যুগ শেষ হয়ে গেছে, "এখন আর রক্তপাত নয়—তলোয়ারে তলোয়ারে বিরোধকে জাগিয়ে রাখাও নয়। শান্তি চাই—চাই মিত্রতা। গোয়ার শাসনকর্তা নুনো ডি-কুন্হারও সেই নির্দেশ।" তাই নবাব খুদাবক্স খাঁ যখন ডি মেলোকে জানালেন যে, নবাবের প্রতিবেশী শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধে ডি মেলো যদি নবাবকে সাহায্য করতে প্রস্তুত থাকেন, তবেই তাঁর প্রার্থনা পূর্ণ হতে পারে। এতবড় সুযোগর টোপ সামনে থাকা সত্ত্বেও কিন্তু ডি মেলো রাজি হন নি। প্রস্তাব শুনে তাঁর 'মুখ কালো' হয়ে উঠেছে। তিনি জানিয়েছেন : "আমরা এদেশে ব্যবসা বাণিজ্য করতে এসেছি। এখানে সকলেই আমাদের বন্ধু,...নবাব আমাদের মার্জনা করবেন" [পরিঃ তিন]। এর ফল অত্যন্ত মারাত্মক হওয়া সত্ত্বেও, কোনরকম, ভয়, অত্যাচার, বা প্রলোভন কিছুই তাঁকে কর্তব্যচ্যুত করতে পারে নি, আদর্শচ্যুতি ঘটেনি তাঁর। অনুচর সহ কারাগারে নিক্ষিপ্ত হয়েছেন, কিন্তু মত বদলান নি ডি মেলো। ব্যক্তিগত লাভালাভ, দুঃখকষ্ট তুচ্ছ হয়ে গেছে তাঁর নিজ দেশ ও জাতির আদর্শের কাছে।

ডি মেলো ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখ তুচ্ছ করেছেন, অচেনা-অজানা দেশে কারাগারে নিক্ষিপ্ত হওয়ার মতো অনিশ্চিত এবং ভয়ঙ্কর ভাগ্যকে বরণ করে নিয়েছেন, কিন্তু কোথাও নিজের বা জাতির সম্মান বিসর্জন দেন নি। তাঁদের আটজনকে নবাবের ত্রিশজন সৈন্য যখন বন্দী করার জন্য ঘিরে ফেলেছে তাঁরা চকিতে বজ্রমুষ্টিতে নিজ নিজ তরবারি উন্মুক্ত করতে চেয়েছেন। শেষ পর্যন্ত অস্ত্রত্যাগ করতে বাধ্য হলেও, শান্ত সংযত কণ্ঠে নবাবকে একথা জানিয়ে দিতে ভোলেন নি ডি মেলো : "আমি চাকারিয়ার নবাব খান্ খানান খোদা-বক্স খাঁকে ভালো করে ভেবে দেখবার জন্যে অনুরোধ করছি। আমরা শুধু এই কজন মাত্রই নই। আমাদের প্রভু মহামান্য নুনো-ডি-কুন্হা যখন এ সংবাদ পাবেন, তখন নবাবের পরিত্রাণ নেই। এই খবর পাওয়া মাত্র তিনি সশস্ত্র সৈনিক পাঠাবেন, পাঠাবেন কামান—তারপরে যা ঘটবে, তার দায়িত্ব সম্পূর্ণ নবাবেরই।" [পরিঃ চার]

ডি মেলোর এই উক্তি তাঁর বা, পর্তুগীজ জাতির সম্মান-মর্যাদা-বীরত্ব সূচক মাত্র নয়, এই উক্তির মধ্য দিয়ে ঔপন্যাসিক ডি মেলোর চরিত্রের অন্যান্য কয়েকটি বৈশিষ্ট্যেরও ইঙ্গিত দিয়েছেন। এই উক্তি থেকে ডি মেলোর ধীর-স্থির-বিবেচক মনটি আলোকিত হয়। ডি মেলো, ভাস্কো-ডা-গামা নন। উভয়ের শরীরেই বীর ও জঙ্গীস্বভাবের পর্তুগীজ রক্ত প্রবাহিত ; উভয়েই প্রয়োজনে শত্রুর ওপর উন্মুক্ত তরবারি হস্তে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারেন ; কিন্তু, ডা-গামা চরিত্রে রাশ টান করার ব্যাপারটা খুবই কম,—ডি মেলো অবস্থা ও পরিস্থিতি অনুযায়ী নিজেকে সংযত করতে জানেন, বল্গা টেনে ধরতে জানেন। ভেতরে ভেতরে তাঁর বীরের রক্ত যখন টগবগ করে ফুটতে থাকে, মনে মনে বলেন, "রক্ত আর আগুন ছাড়া এখানে আর কোনো চুক্তিই অসংভব!" (পরিঃ চার), কিশোর গঞ্জালো পর্যন্ত বীরের মতো লড়াই করতে চায় যখন : "যুদ্ধ না করে আমরা কিছুতেই ওদের বন্দী হব না," তখনও ডি মেলো নিজেকে হারিয়ে ফেলেন নি, এত বড় তীব্র উত্তেজনায়। শান্ত মস্তিষ্কে তিনি উত্তেজিত স্নায়ুকে বুঝিয়েছেন : "এ-ভাবে অস্ত্র

হাতে থাকতেও কুকুরের মতো বশ্যতা স্বীকার—ভাবলেও মাথার ভেতরে আগুন জ্বলে ওঠে ; কিন্তু উত্তেজিত হয়ে সব কিছু পণ্ড করার সময় নয় এটা। চারিদিক ঘিরে দাঁড়িয়ে মুক্ত তরবারি নবাবের সৈনিকের দল—উদ্ধত হয়ে উঠলে হয়তো তাঁদের শব ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাবে কুকুরের দল। না এভাবে—ভুল করা চলবে না এখন" (চার পরিঃ)।

ডি মেলোর এ গুণ নায়কোচিত। অথবা, ঔপন্যাসিক তাঁর ইতিহাস অংশের নায়কটির ব্যক্তিত্বের এমন কতকগুলি 'traits' ফুটিয়ে তুলেছেন, যে শক্তি ও গুণাবলীর জন্যই তিনি অন্যান্য আর পাঁচটা চরিত্রদের মতো নন,—স্বতন্ত্র তিনি। ভাস্কো-ডা-গামা মুরেদের লাঞ্ছনা অপমানে দিশেহারা হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন : প্রহরী নায়ারেরা না এসে পড়লে তাঁর ভাগ্যে কী হোত কে জানে ; আরও দু' একবার সচিব পাউলো, তাঁকে সংযত রেখেছেন উত্তেজনার হাত থেকে, কিন্তু ডি মেলো, ভাস্কো নন। ইতিহাস তাঁকে অনেক দূরে নিয়ে যাবে। ইতিহাস যুগ প্রয়োজনে তাঁকে তিল তিল করে গড়েছেন। ডি মেলোও ধৈর্য-বুদ্ধি-সংযম-সাহস ও বীরত্ব গুণে পর্তুগীজ জাতির ইতিহাসের একটি বিশিষ্ট অধ্যায় গড়ে তুলেছেন। বলা বাহুল্য, এটি শিল্পী নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের বিশিষ্ট ইতিহাসচেতনা। তাঁর প্রথম ঐতিহাসিক উপন্যাস 'উপনিবেশে'-ই এ সত্য যাচাই করেছেন। সেখানে প্রশ্ন তুলেছেন তিনি : "মানুষই কি কেবল রচনা করে ইতিহাসকে ? ইতিহাস মানুষকে রচনা করে না কোনোদিন ?" [২য় পর্ব] ডি মেলো যেমন ইতিহাসের পুরুষ হয়ে উঠেছেন, ইতিহাসও তেমনি তাঁকে ধীরে ধীরে গড়ে নিয়েছে।

ভাস্কো-ডা-গামা, আলমিডার যুগ শেষ হয়েছে। সেই যুগের নায়করা, আগুন জ্বালিয়েছেন, কামান দেগেছেন, লুঠ করেছেন, নারী শিশু নির্বিচারে, যাকে পেয়েছেন হত্যা করেছেন এবং ত্রাসের সঞ্চার করেছেন। তাঁরা ইতিহাসের স্রষ্টা হলেও, ইতিহাসের প্রয়োজনে তাঁরা কেউ গড়ে ওঠেন নি বলেই, ইতিহাসের পাতায় তাঁদের একটি বিভীষিকা মূর্তি ছাড়া আর কিছুই স্পষ্ট নয়। ডি মেলো তা নন। তিনি যেমন বঙ্গের সংগে বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষর করে ইতিহাসের স্রষ্টা, ইতিহাসও তেমনি যুগ প্রয়োজনে তাঁর পর্তুগীজের হঠকারী, বীর যোদ্ধার রক্তে এনেছে ধৈর্য, বিবেচনা, সহনশীলতা, বিচার, ব্যক্তিত্ব। ঔপন্যাসিকের গভীর ইতিহাস-চেতনা, এবং জীবন দর্শনই ডি মেলোর চরিত্রকে নায়কোচিত মর্যাদা স্থাপনের যথাযোগ্য পাত্র করে তুলেছে। একদিকে ধীর স্থির বিবেচক বুদ্ধিমান, অপর দিকে নিজ দেশ ও জাতির প্রতি গভীর প্রীতি। ন্যায় হোক—অন্যায় হোক নিজ রাজার প্রতি শ্রদ্ধাবোধ ও আনুগত্য ; এবং সেই রাজার ও স্বজাতির গৌরব ও মর্যাদাকে যিনি উঁচু করে তুলে ধরতে জানেন, ও পারেন···তিনি নিজেও কম শ্রদ্ধার্হ নন। ডা-গামা—কাব্রাল—আলমিডা—আলবুকার্ক-এর ইতিহাস শিক্ষা দিয়েছে ডি মেলোকে। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় সেইভাবেই চিন্তা-ভাবনা, আদর্শ-কর্তব্য, সহনশীলতা-বিবেচনা প্রভৃতির মধ্য দিয়ে ডি মেলোর মহিমাময় ব্যক্তিত্ব গড়ে তুলেছেন। কারাগারের দুঃখ-যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে সহচর পেড্রোর মন বিদ্রোহী হয়ে ওঠে ক্যাপিতানের বিরুদ্ধে ; কিশোর ভাইপো গঞ্জালো

ভীতার্ত ও সংশয়াম্বিত : নবাবের শর্ত না মানা তাঁর উচিত হচ্ছে কি ? কিন্তু ইতিহাস যাঁকে নায়কের মর্যাদা দিতে চায় তাঁকে তো এত অল্পে ধৈর্যহারা হলে চলবে না। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ডি মেলোর সেই বিবেচক স্বজাতির গর্বে গরীয়ান মনটিকে তুলে ধরেন আমাদেব সামনে : "তাঁরা পর্তুগীজ—একমাত্র পর্তুগালের সিংহাসন ছাড়া আর কারো কাছে তাঁরা মাথা নত করতে জানেন না। সারা হিন্দে তারা মানতে পারেন একমাত্র নুনো ডি-কুনহার নির্দেশ। আজ যদি খোদাবক্স খাঁর শর্ত তাঁরা মেনে নেন, কী হবে তাহলে ? তাঁদের স্বাধীনতা থাকবে না, তাঁদের স্বাতন্ত্র্য থাকবে না—তাঁরা হবেন নিতান্তই এই মুরদের আজ্ঞাবহ সৈনিক। তারা যা হুকুম দেবে-তাই মানতে হবে, প্রতি কথায় বশ্যতা মেনে চলতে হবে তাঁদের।" [ছয় পরিঃ]

ডি মেলোর নায়কোচিত এই ভাবনা ঔপন্যাসিক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের বিশুদ্ধ ইতিহাস-জ্ঞান এবং তাঁর জীবনদর্শন-জাত। সাধারণভাবে ইতিহাসে এই ঘটনাটির বিবরণ ভিন্ন রূপে পরিবেশিত। আমাদের আলোচনার ইতিহাস অংশে এ বিষয়ে আলোচনা থাকায় পুনর্বার নিবেদন করা হলো না। ডি মেলোর চরিত্রে ইতিহাসের তথ্য-উপাদানকে যতখানি গ্রহণ করা উচিত, ঔপন্যাসিক ততখানিই গ্রহণ করেছেন। কিন্তু তিনি শিল্পীর দায়িত্ব কর্তব্য সম্বন্ধেও সচেতন। নিছক ইতিহাসের তথ্য-উপাদান-সমৃদ্ধ চরিত্র অপেক্ষা ডি মেলোকে রক্তমাংসের মানুষ করে তুলতেই তিনি বেশী আগ্রহী। ডি মেলোর চরিত্রের ব্যক্তিগত কয়েকটি 'traits' তিনি তাঁর ইতিহাস চরিত্রের সঙ্গে যুক্ত করে একটি গোটা মানুষকে আঁকতে চেয়েছেন। তাই হয়তো শিল্পীর অগোচরেই তাঁর কবিসত্তা ডি মেলোর ওপর আরোপিত হয়। ডি মেলো কবি। বঙ্গোপসাগরের গভীর উজ্জ্বল নীল তাঁকে মুগ্ধ করে। বাঙলার রূপ তাঁর চোখে স্বপ্ন আনে। আকাশে-বাতাসে তিনি বাঙলার মাটির ঘ্রাণও পান। দূর থেকে বাঙলার তটরেখা তাঁর চোখে পড়ে : "ওই তো দুধের মতো সাদা জল—ওই তো নারকেল বনের চঞ্চল রেখা ! ওই তো তাঁর সেই স্বপ্ন স্বর্গের হাতছানি !" [দুই পরিঃ] লেখকের প্রকৃতি-মুগ্ধতা এবং রোমাণ্টিক কবি-মনটি ডি মেলো অনায়াসে পেয়েছেন। মুগ্ধচিত্তে তিনি কখনও কখনও ক্যামোয়েন্সের 'লুসিয়াদাস' থেকে বাঙলার স্বর্গীয় সৌন্দর্যের বর্ণনার শ্লোকও আবৃত্তি করেন :

> "Ve Cathigao Cidade des melhores
> De Bengala......"

পর্তুগীজ রক্ত ডি মেলোর ধমনীতে প্রবাহিত হলেও, তিনি সাহসী বীর এবং বিবেচক-বুদ্ধিমান হলেও, তাঁর একটি স্পর্শকাতর মনও আছে। এটি বোধ হয় কবি মনেরই পরিপূরক। দ্বিতীয়বার যখন ডি-কুন্‌হা তাঁকে নেতৃত্বপদ দিয়ে বঙ্গে প্রেরণ করেন ব্যবসা-বাণিজ্যের চুক্তি সম্পাদন করে ঐতিহাসিক গৌরব অর্জনের জন্য, তখন যে ডি মেলোকে আমরা দেখি, তিনি সেই পূর্বের ডি মেলো নন। 'পোর্টো গ্রাণ্ডি !' 'সিডাডি বণিটা !'—যে চট্টগ্রাম সম্পর্কে তাঁর এরূপ প্রশস্তি, সেই চট্টগ্রামে তিনি যখন

এসে পৌঁছালেন, তখন পূর্বের তিক্ত অভিজ্ঞতা, বিশ্বাসঘাতকতা তাঁর দু'চোখ থেকে সেই স্বপ্নঘোর কে সরিয়ে নিয়েছে! দুঃখ-কষ্ট-নির্যাতন এবং সর্বোপরি ভ্রাতুষ্পুত্র কিশোর গঞ্জালোর করুণ মৃত্যু তাঁকে কেমন পাল্টে দিয়েছে। তিনি বলেন 'Estou Cansado " —আমি বড় ক্লান্ত!—বারবার প্রতারিত হয়ে, আঘাতে-আঘাতে তাঁর অন্তর বিমূঢ় হয়ে গেছে। বিশ্বাস করার, স্বপ্ন দেখার, মুগ্ধ হওয়ার সেই সারল্য আর নেই তাঁর। শেষ পর্যন্ত মামুদ শা যখন তাঁকে দ্বিতীয়বার মুক্তি দেন কারাগার থেকে তখন ভেতরের মানুষটার সঙ্গে সঙ্গে বাইরের মানুষটাও অনেকখানি বিধ্বস্ত হয়ে গেছে: "এর মধ্যে অনেক শীর্ণ হয়ে গেছে ডি মেলোর চেহারা। মাথায় বন্য বিশৃঙ্খল চুল—তামাটে দাড়িতে অস্বাভাবিক দ্রুততায় পাক ধরেছে, চোখের কোটরে কালো অন্ধকার তার মধ্য থেকে দুটো উজ্জ্বল অঙ্গারকে যেন দেখতে পাওয়া যাচ্ছে।..." [বাইশ পরিঃ] ঐতিহাসিক, ব্যক্তি-মানুষের এই পরিবর্তন, তার সুখ-দুঃখের খোঁজ, রাখেন না, তাঁর মনের গভীরে উঁকি মারার সময় নেই তাঁর। পার্বত্য নির্ঝরিণীর মতো যে ঘটনারাজি ফেনায়িত হয়ে ছুটে চলেছে সেই স্রোতটিকেই তিনি দেখেন। কিন্তু শিল্পীর কথা আলাদা। তিনি স্রোতও দেখেন, তার চেয়ে অনেক গভীর ভাবে লক্ষ্য করেন, সেই স্রোতে ভাসমান ফেনপুঞ্জের মতো চরিত্রগুলিকে। কোথায় তার ওপর আলো এসে পড়েছে, কোথায় তার অন্ধকার, কোথায় সে ঘূর্ণিতে পাক খাচ্ছে, কোথায় তরঙ্গ দোলায় তার নৃত্য। তিনি যে জীবনের চিত্রকর, জীবন রসের কারবারী। ঘটনার গতিতে ছুটে চলা অর্ধ-সত্য মানুষটা নয়, বিচিত্র, জটিল, অনুভূতি-সম্পন্ন, মন-বিশিষ্ট পূর্ণাঙ্গ মানুষটাকেই সেই স্রোতের সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে চান তিনি। ঔপন্যাসিক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের লেখনীতে ইতিহাসের ডি মেলো এইরূপ একটি মন-বিশিষ্ট গভীর অনুভূতি-সম্পন্ন এক রক্ত মাংসের মানুষ হয়ে উঠেছেন। তাঁর একটা মন নামক পদার্থ আছে—যার গায়ে আঘাত-অত্যাচার প্রভৃতি দাগ কেটে বসে—ফলে আসে পরিবর্তন আচারে-আচরণে-ব্যবহারে। গৌড়ের সুলতান যখন ডি মেলোকে মুক্তি দিয়ে পর্তুগীজদের বন্ধুত্ব ও সহযোগিতা প্রার্থনা করেন, তখন তাঁর অন্তর দীর্ঘদিনের অন্যায়-লাঞ্ছনা-যন্ত্রণার কথা ভেবে জ্বলে উঠলেও, তিনি সম্মতিসূচক যে উত্তরটি দেন, তা শুনে মনে হয় "যেন কয়েক শতাব্দী পরে কথা বললেন তিনি, তাঁর নিজের কণ্ঠস্বর নিজের কানেই যেন অপরিচিত ঠেকল।" [বাইশ পরিঃ] এই অবসাদ, এই মানসিক ও দৈহিক পরিবর্তন, কম্পিত হস্তে চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর দান—জীবনশিল্পী নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের লেখনীর প্রতিটি রেখায় ভাবনা-চিন্তা-অনুভূতি আবেগ সম্পন্ন প্রাণবিশিষ্ট একটি মানুষ আমাদের চোখের সামনে ফুটে ওঠে।

প্রেমেই হৃদয়ের দ্বারোদ্ঘাটন হয় সবচেয়ে বেশী। ইতিহাসের ডি মেলোর চরিত্রটিকে সবচেয়ে বেশী মানবিকতা দান করেছে, অথবা আরও সঠিকভাবে মানবীয় রসে স্নিগ্ধ-কোমল ও উজ্জ্বল করেছে কিশোর ভাইপো গঞ্জালোর প্রতি তাঁর গভীর ও অপার ভালবাসা। গঞ্জালোর প্রতি বাৎসল্য প্রেম ফুল হয়ে ফুটে উঠেছে ডি মেলোর অন্তরে, আর তার সৌরভ সব পাঠককেই আবিষ্ট করে। গঞ্জালোর দিকে ডি মেলো তাকালেই

সে দৃষ্টিতে গভীর স্নিগ্ধ স্নেহধারা বর্ষিত হয়: "...পর্তুগীজের সন্তান, তলোয়ার হাতে বীরের মৃত্যুই সবচেয়ে বড় কামনার জিনিস; কিন্তু কিশোর গঞ্জালোর মুখের দিকে তাকিয়ে সে কথা কিছুতেই ভাবতে পারেন না ডি মেলো। বড় বেশি সুন্দর সে —বড় বেশি সুকুমার।..." [দুই পরিঃ] এই কিশোর গঞ্জালোকে তিনি কিছুতেই ভুলতে পারেন না। তাঁর স্নেহশীল অন্তরটি বারেবারেই লেখক আমাদের সামনে উজ্জ্বলরেখায় তুলে ধরেছেন। তার মৃত্যু-শোকই যেন তার দেহ মন জুড়ে অবসাদের প্রধান কারণ।

ডি মেলো হয়ত জটিল চরিত্র নয়; তথাপি flat বা simple শ্রেণীর চরিত্র সৃজনের যে পদ্ধতি সচরাচর শিল্পীরা গ্রহণ করে থাকেন, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় সে পদ্ধতি অনুসরণ করেন নি। তিনি round শ্রেণীর চরিত্রের মতো করেই ডি মেলোর নানা মানবিক গুণসম্পন্ন সরল চরিত্রটিকে ধীরে ধীরে পাকে পাকে আমাদের সামনে উন্মোচিত করেছেন। উপন্যাসের চরিত্রাঙ্কণে তাঁর গভীর ও স্বচ্ছ জীবনদর্শনটি যেমন স্পষ্ট হয়ে ওঠে, তেমনি প্রকাশ পায় তাঁর নাট্যকারের মতো মুন্সিয়ানা।

॥ মামুদ শা ও খোদাবক্স খাঁ ॥

গৌড়ের সুলতান মামুদ শা এবং চাকারিয়ার নবাব খোদাবক্স খাঁ দুটি একই শ্রেণীর ঐতিহাসিক চরিত্র। ঐতিহাসিকের বিবরণ থেকে উভয়ের জীবন সম্পর্কে যে তথ্যটুকু পাওয়া যায় তা হ'ল: মামুদ শা, যাঁর সিংহাসনে আরোহণের আগে নাম ছিল আবদুল বদর, ফিরোজ শাকে হত্যা করে রক্তে হাত রাঙা করে শাসন দন্ড গ্রহণ করেন। তিনি হোসেন শাহী বংশের শেষ সুলতান। ভোগে-বিলাসিতায়—সুরা ও নিত্য-নতুন নর্তকী বাঈজীর নৃত্য ও রূপের ঝড়ে পাক খাওয়াতেই তাঁর নেশা। কাজেই রাজ্যের শাসনকার্য একরকম উজীর এবং আলফা হাসানীর হাতেই। ফিরোজ হত্যার প্রতিক্রিয়ায় প্রতিবেশী রাজ্যের সঙ্গে তাঁর বিরোধ ও যুদ্ধ আরম্ভ হয়। এদিকে সাসারামের শাসনকর্তা শের খাঁ তখন প্রচন্ড শক্তি নিয়ে অতি দ্রুত মাথা উঁচু করেন এবং বঙ্গের ওপর তাঁর থাবা উদ্যত হয়ে উঠে। দিল্লী থেকে হুমায়ুনও বঙ্গের ঐশ্বর্যে আকৃষ্ট হয়েছেন। অযোগ্য মামুদ মদ ও নারীর নেশায় যখন বিভোর, তখন একটু একটু করে সঙ্কটের ও সর্বনাশের কালো মেঘ বঙ্গের ভাগ্যাকাশে জমতে থাকে। এমতাবস্থায় পর্তুগীজগণের বঙ্গে পদার্পণ। তাঁরা গৌড়েশ্বরের বন্ধুত্ব এবং বঙ্গের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্বন্ধ স্থাপন প্রার্থনা করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় পর্তুগীজরা এসেই তাঁর কোপ দৃষ্টিতে পড়েন। ফলে, মামুদের রাজনৈতিক সঙ্কটও তীব্রতর হয়। কারণ, মামুদ ডি মেলোকে ও তাঁর সঙ্গীদের বন্দী করায় গোয়ার গভর্নর নুনো ডি-কুনহা সেনাবাহিনীর বহর পাঠিয়েছেন, বঙ্গে রক্ত ও আগুনের স্রোত বইয়ে দেবার জন্য। অবশেষে মামুদ নিরুপায় হয়ে ডি মেলোকে মুক্তি দেন এবং পর্তুগীজদের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করে শের খাঁর বিরুদ্ধে তেলিয়াগড়ির যুদ্ধে তাঁদের সাহায্য গ্রহণ করলেন। কিন্তু শেষ রক্ষা আর হল না।

শেরের হাতে মামুদের শোচনীয় পরাজয় ঘটে, এবং এরপর অধিকদিন তিনি জীবিতও ছিলেন না।

চাকারিয়ার নবাব খোদাবক্স খাঁ ইতিহাসের কোন উজ্জ্বল ব্যক্তি নন। পর্তুগীজগণ বঙ্গে যখন অভিযান চালাচ্ছিলেন, সেই সময় পর্তুগীজ ইতিহাসের উল্লেখ্য ব্যক্তি ডি মেলো জনৈক আরাকানী জেলের প্রতারণায় কয়েকজন অনুচর নিয়ে চাকারিয়ায় এসে উপনীত হন। এখানকার নবাব খোদাবক্স খাঁ; গৌড়েশ্বরের অধীন ও অনুগত। সুরা-নারী-ভোগ-বিলাসিতা জীবনের মন্ত্র। প্রতিবেশী রাজ্যের সঙ্গে চলছে তাঁর যুদ্ধ। এমতাবস্থায় ডি মেলোর আগমন তাঁর রাজসভায়। প্রভাবশালী মুর সভাসদের পরামর্শে তিনি ডি মেলোর কাছ থেকে তাঁর প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে সাহায্য চান, —বিনিময়ে তাঁকে বঙ্গে বাণিজ্যাধিকারের আশ্বাস দেন। অবশ্য, ইতিহাসের বিবরণ অনুযায়ী, খোদাবক্স খাঁ ডি মেলোর সাহায্যে যুদ্ধ জয় করেন, এবং আপন অঙ্গীকার পালন না করে অনুচরসহ ডি মেলোকে বন্দী করেন। কয়েকদিন পরে ডি মেলোর বহরের আরও দুটি জাহাজ চাকারিয়ায় উপনীত হয়। এই দুই জাহাজের ক্যাপিতান ভ্যাসকন্‌সেল স্‌এবং কোয়েলহো মুক্তিপণ দিয়ে ডি মেলোকে মুক্ত করার প্রয়াস পান, কিন্তু নবাব আশানুরূপ মুক্তিপণ না পাওয়ায় মুক্তি মেলে না। ব্যর্থ হয়ে শেষে একটি ষড়যন্ত্র করে পর্তুগীজ বন্দীরা কারা-প্রাচীরের বাইরে আসার চেষ্টা করেন। তাও ব্যর্থ হয়। সুতরাং ডি মেলোকে নবাবের কারান্তরালেই অতিবাহিত করতে হয়। কিন্তু অপ্রত্যাশিত ভাবে খাজা সাহাবুদ্দিন নামে জনৈক ধনী পারস্য বণিকের সহায়তায় ডি মেলো মুক্তি লাভ করেন এবং গোয়ায় ফিরে যান। খোদাবক্স খাঁনের ভূমিকাও উপন্যাসে এখানেই শেষ।

ইতিহাস পাঠে মনে হবে, মামুদ শা এবং খোদাবক্স খাঁ—স্বভাব ও প্রকৃতির দিক থেকে একই মুদ্রার এপিঠ আর ওপিঠ। উভয়েই অকর্মণ্য, অপদার্থ সুরাসক্ত লম্পট, আমোদ ও নৃত্যগীত প্রিয়। সিংহাসনে শাসকের আসনে বসলেও উভয়েই শাসনকার্যে অক্ষম বা শাসন দক্ষতাহীন। তফাৎ এই,—মামুদ শা গৌড়বঙ্গের অধিপতি বা সুলতান, খোদাবক্স খাঁ তাঁরই অধীনস্থ চাকারিয়া অঞ্চলের শাসক বা নবাব। জ্ঞাতিপুত্র ফিরোজের রক্তে রাঙা মামুদের হাত, হত্যাপাপে কলঙ্কিত এবং সকলের বিদ্বেষে ভরা তাঁর জীবন; খোদাবক্স খাঁ-র চরিত্রে এরূপ কোন পাপের ছায়া পড়ে নি।

॥ **খোদাবক্স খাঁ** ॥

তৃতীয় পরিচ্ছেদে চাকারিয়ার নবাব খান্‌খানান খোদাবক্স খাঁ-এর সঙ্গে আমাদের প্রথম পরিচয়। ঔপন্যাসিক ঐতিহাসিক নবাব-সুলতানদের পদমর্যাদা অনুযায়ী খোদাবক্স খাঁ-এর পরিচয় দিতে উপযুক্ত আবহাওয়া ও পরিবেশ তৈরি করে নিয়েছেন: বাইরে চারিপাশে অশ্বারোহী সেনার তৎপরতা; অপরিচিত, বিদেশী কেউ সহরে প্রবেশ করলে তার জন্য সজাগ দৃষ্টি; নবাব প্রাসাদের সিংহদ্বার; দরবারে নবাগত কাউকে

পরিচয় করিয়ে দিতে নকীবের চীৎকার ; এবং তৎসহ নবাব ও তাঁর ঐশ্বর্যের ঈষৎ পরিচয় : "বেদীর ওপরে জাফরিকাটা শ্বেতপাথরের সিংহাসন—মখমল দিয়ে মোড়া। সে আসনে যিনি বসে আছেন নিঃসন্দেহে তিনিই নবাব। পরনে জরির কাজকরা মস্‌লিনের পোষাক—মাথায় পাগড়িতে ঝলমল করছে একখণ্ড কমল হীরা। শাদা দাড়ি জাফ্‌রানের রঙে রাঙানো। স্ফটিকের তৈরী একটা প্রকাণ্ড আলবোলা থেকে সোনা-জড়ানো সুদীর্ঘ নল এসে নবাবের ওষ্ঠ স্পর্শ করেছে। দু-পাশে দুজন সমানে ময়ূরের পাখা দুলিয়ে চলেছে—" [তৃতীয় পরিঃ]

কিন্তু পদমর্যাদার এই গাম্ভীর্য খোদাবক্স খাঁ-এর চরিত্রে নেই। তিনি অপদার্থ, ভোগী-বিলাসী এবং ব্যক্তিত্বহীন। ডি মেলো যখন গভর্নর ডি-কুন্‌হার নাম করে নবাবের বন্ধুত্ব প্রার্থনা করলেন, এবং বঙ্গের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপন করতে চাইলেন, তখন নবাব তাঁর দরবারের জনৈক অভিজাত, প্রভাবশালী মুরের সঙ্গে পরামর্শ করে তবে উত্তর দিলেন। পর্তুগীজগণ মুরদের শত্রু। কাজেই মুরের দুরভিসন্ধিমূলক প্রস্তাবই তিনি গ্রহণ করে জানালেন : প্রতিবেশী রাজ্যের সঙ্গে বর্তমানে নবাবের যুদ্ধ চলছে, পর্তুগীজ ক্যাপিতান সেই যুদ্ধে তাঁকে সাহায্য করতে রাজি থাকলে, নবাব তাঁদের আশা পূর্ণ করবেন। কিন্তু ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ডি মেলো সে প্রস্তাবে রাজি হলেন না। খোদাবক্স খাঁ-এর চরিত্রে ঔপন্যাসিক তখন নবাব সুলভ ক্রোধের আগুনটি জেলে তাঁকে প্রাণবন্ত করে তুলেছেন : "নবাবের প্রখর চোখ হঠাৎ ক্রুদ্ধ জ্বালায় দপ্‌ করে উঠল। অনুচরসহ নবাব ডি মেলোকে বন্দীর আদেশ দিলেন।" —বিপরীতমুখী ডি মেলো চরিত্রে পর্তুগীজ জাতি-সুলভ ক্রোধ, উত্তেজনা, বীরত্ব থাকা সত্ত্বেও সংযত কণ্ঠে তিনি জানিয়ে দিয়েছেন তাঁর প্রভু ডি-কুন্‌হার আদেশ : যুদ্ধ তাঁরা করবেন না।

ডি মেলোর এই কথায় আত্মাভিমানী নবাবের ক্রোধ ও উত্তেজনা স্বাভাবিক কারণেই বৃদ্ধি পেয়েছে! তাঁর সেই ক্রোধ-দীপ্ত আচরণ খামখেয়ালি নবাবসুলভ চরিত্রকে উজ্জ্বল রেখায় ফুটিয়ে তুলেছে চতুর্থ পরিচ্ছেদে : "ক্রুদ্ধভাবে আসনের ওপর নড়ে উঠলেন খোদাবক্স খাঁ—একটা প্রকাণ্ড কিল মারলেন পাশে। তারপর স্বীয় উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করলেন।" —যার অর্থ হ'ল : "নবাব এই ভেবে আশ্চর্য হচ্ছেন যে, তাঁকে ভয় দেখাবার মতো সাহস পর্তুগীজ ক্যাপিতানের এল কোথা থেকে!"

—খোদাবক্স খাঁ-এর এরূপ আচরণের মধ্য দিয়ে নবাব বাদশাহের খামখেয়ালি মেজাজ, ক্রোধ, উত্তেজনা, আত্মাভিমান প্রভৃতি বৈশিষ্ট্যগুলি ঔপন্যাসিক, চরিত্রের নাটকীয় 'অ্যাকশনে'র সাহায্যে এমন সুন্দর করে প্রকাশ করেছেন যে, চরিত্রটি ইতিহাসের পাতা থেকে বেরিয়ে এসে আবার যেন নবাবী তখৎ-এ বসেছে।

এর পর ঔপন্যাসিক অপদার্থ খোদাবক্স খাঁ-এর লম্পট ভোগীর চিত্রটি এঁকেছেন বেশ গাঢ় রেখায় : "চোখের কোনায় তার ক্লান্তির কলঙ্করেখা—একটা উত্তাপহীন ঘুমন্ত দৃষ্টি। কাল সমস্ত রাত উদ্দাম আনন্দের মধ্যে কাটিয়েছেন তিনি—দুটি নতুন সুন্দরী নর্তকী এসেছে তাঁর রংমহলে।" ৩য়-৪র্থ পরিচ্ছেদে তাঁর ক্রোধদীপ্ত মূর্তি প্রকাশ

পেলেও, ঔপন্যাসিক ইতিহাসের খোদাবক্স চরিত্রটির বর্ণনা এই পরিচ্ছেদে দিয়েছেন : "বিলাসী শান্তিপ্রিয় মানুষ খোদাবক্স খাঁ—রাজনীতির চাইতে নারীতত্ত্বই তিনি বেশি পছন্দ করেন।" তিনি বিবাদ-অশান্তি যুদ্ধ ভয় করেন। পর্তুগীজদের অনাবশ্যক শত্রুতা তিনি কামনা করেন না। কিন্তু হলে কী হবে—ব্যক্তিত্বহীন নবাব, উজীর জামান খাঁ এবং প্রভাবশালী মুরদের ইচ্ছাকেই বাধ্য হয়ে মেনে নেন। ভ্যাসকনসেলস মুক্তিপণ সাধ্যানুসারে দিতে চাইলেও এবং নবাব তা গ্রহণে রাজি থাকলেও উজীরের ইচ্ছার বিরুদ্ধে যেতে পারেন না। এই অবস্থার চিত্রটি ঔপন্যাসিক নাটকীয় 'অ্যাকশানে'র সাহায্যে খোদাবক্স চরিত্রে প্রাণবন্ত করে ফুটিয়েছেন :

"—খোদাবন্দ, ওরা মুক্তিপণ দিতে চাইছে।

—কিসের মুক্তিপণ? —চটকা ভেঙে জানতে চাইলেন খোদাবক্স খাঁ।

—পর্তুগীজ সেনাপতির জন্যে।

মুক্তিপণ। মন্দ কী! খোদাবক্স খাঁ যেন স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন। কিছু অর্থাগম হয়—সে তো ভালোই। এ বিড়ম্বনা যত তাড়াতাড়ি মিটে যায়, ততই নিশ্চিন্ত হতে পারেন তিনি।"

কিন্তু জামান খাঁ তাঁকে নিশ্চিন্ত হতে দিলেন না। তিনি ভয়ে, অস্বস্তিতে ছটফট করতে লাগলেন। নারী সঙ্গপ্রিয় সুরাসক্ত, অলস-বিলাসী তিনি; সর্বোপরি ব্যক্তিত্বহীন। ঔপন্যাসিক নিজেই ইতিহাসের এই 'টাইপ' চরিত্রটির বর্ণনা দিয়েছেন : "ব্যক্তিত্বহীন খোদাবক্স খাঁ চুপ করে রইলেন। নিজের ওপর জোর নেই তাঁর, জোর করে কোনো কথা বলবার ক্ষমতাও নেই। নিরুপায়ভাবে আবার তলিয়ে যেতে চাইলেন দিবাস্বপ্নের মধ্যে। মনে আনতে চাইলেন জরিনার তপ্ত সুরভিত আলিঙ্গন।" (পরিঃ আট)

ইতিহাসের মামুদ শা, যাঁর পূর্ব নাম আবদুল বদর, ঔপন্যাসিকের ওই একই শিল্প কৌশলে—কখনও 'ন্যারেটিভ,' কখনও 'ড্রামাটিক'—রক্তমাংসের চরিত্রে রূপান্তরিত হয়েছেন। তবে শিল্পীর দক্ষতায় এবং মানব চরিত্রের মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ ক্ষমতায় খোদাবক্স ও মামুদ শা চরিত্র দুটি প্রায় একই উপাদানে গঠিত হলেও, উভয়ের শিল্পরূপ একে অন্যের চেয়ে সম্পূর্ণ পৃথক। পড়তে পড়তে কোথাও মনে হবে না, খোদাবক্স খাঁ-ই ভিন্ন নামে মামুদশা।

॥ মামুদ শাহ্ ॥

গৌড়াধিপ মামুদ শাকে পরিচয় করিয়ে দেবার জন্য সভার বর্ণনা, পোশাকের বর্ণনার আর প্রয়োজন হয় নি। সমগ্র বঙ্গের প্রাকৃতিক ঐশ্বর্য ও সৌন্দর্যই বুঝিয়ে দিচ্ছে কোথাকার সুলতান। তিনি প্রখর ব্যক্তিত্বশালী। তাঁর আদেশ যেন হুঙ্কার-তিরস্কার। উজীর বা পরামর্শদাতা আলফা হাসানী সে হুঙ্কারে মাথা নত করেন। নিজ সিদ্ধান্তে তিনি অটল। অতীব কষ্টে অনেক অনুনয়ে তাঁর সিদ্ধান্ত বদলাতে হয়। তিনি ভোগী, লম্পট—কিন্তু যুদ্ধ-বিবাদে ভীত নন; বরং পরাজয়ের সংবাদে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন, অসহায়

কান্নায় ভেঙে পড়েন না। চারিপাশের যুদ্ধ, শত্রুতা, বিরুদ্ধ পরিবেশ ও পরিস্থিতি তাঁকে সদা উত্তেজিত ও ক্ষিপ্ত করে তুলেছে। এ হেন ব্যক্তিত্বাভিমানী চরিত্রটিকে ঔপন্যাসিক অন্তর্দ্বন্দ্বে ক্ষত-বিক্ষত করে জটিল চরিত্রে রূপান্তরিত করেছেন; জ্ঞাতি ফিরোজ শাকে হত্যা করার পাপ, গোপনে অন্তরে বসে তাঁর সুখ-শান্তিকে জীর্ণ করে দিয়েছে। সুপ্ত অপরাধবোধ তাঁকে কুরে কুরে খাচ্ছে প্রতিদিন। তাই অন্তরে-বাহিরে সর্বশরীরে তাঁর বৃশ্চিক দংশন। মামুদ শা নিছক ইতিহাসের চরিত্র হয়ে থাকেন নি—শিল্পী তাঁকে জীবন্ত এমন এক চরিত্রে রূপান্তরিত করেছেন, যার মানবিক দিকটি পাঠকের অন্তরকে স্পর্শ করে, ভাবায়, এবং পাঠকের অন্তরে নানা অনুভূতির তরঙ্গ তোলে।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদে গৌড়েশ্বর মামুদ শাকে প্রথম পাঠকের সামনে উপস্থিত করা হয়। দরবারে বসে আছেন তিনি। ডি-কুন্হার রাজপ্রতিনিধি হিসাবে আজেভেদো তাঁকে উপঢৌকন দান করে অভিবাদন জানালেন। সেই সঙ্গে প্রার্থনা করলেন গৌড়েশ্বরের বন্ধুত্ব, এবং বঙ্গের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক ও কুঠী স্থাপনের। উচ্চ কণ্ঠের হাসিতেই সুলতান সকলকেই সচকিত এবং উদ্বিগ্ন করে দিলেন: "বাণিজ্য? কুঠী?" এ হাসি রহস্যময়। তাঁর মনের অভিপ্রায়টি বুঝতে দিলেন না তিনি। তাঁর হয়ে উজীর আজেভেদোকে শুধু জানিয়ে দিলেন আগামীকালের দরবারে সুলতানের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হবে।

মামুদ শা, খোদাবক্স নন যে, উজীরের সিদ্ধান্তই তাঁর সিদ্ধান্ত। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিসম্পন্ন এবং বুদ্ধিমান মামুদের সিদ্ধান্তে উপনীত হতে সময় লাগে নি। তিনি খোদাবক্স খাঁ-এর মতো নিপাট সরল নন, ঔরঙ্গজেবের মতো হাসি দিয়ে ক্রোধ গোপন রাখতে জানেন; জটিল এবং কুটিল চরিত্র। উপঢৌকনের মধ্যে যে গোলাপ জলের শিশিগুলি ছিল সেগুলি ইরানী গোলাপ জল; আরবীয় বণিকদের জাহাজ লুট করে পর্তুগীজ দস্যুরা কেড়ে নিয়েছিল। সেই লুটের মাল ভেট দেওয়া হয়েছে গৌড়েশ্বরকে! এতদূর স্পর্ধা! যিনি অফুরন্ত ঐশ্বর্যের মালিক, তাঁর সঙ্গে এই প্রতারণা। তাঁর সমুন্নত মর্যাদার পক্ষে অসহনীয়। কাজেই ক্রুদ্ধ মামুদ শা উজীর ও আলফা হাসনীকে বলেছেন: "ওদের আম-কোতল্ করাই হচ্ছে এর একমাত্র জবাব।"

উজীর এবং বিবেচক আলফা হাসানী চারিপাশের ঘটনা-পরিস্থিতির দোহাই দিয়েও সুলতানকে তাঁর কঠিন সিদ্ধান্ত থেকে একবিন্দু টলাতে পারলেন না: "উজীর সাহেব এখুনি হুকুম তামিল করুন। আমি ওদের শির দেখতে চাই!" এমন সময় সহসা জনৈক ফকির দরবেশ সকলকে চমকে দিয়ে সেখানে উপস্থিত হন, এবং মামুদকে নিষেধ করেন। তাঁকে তিনি স্মরণ করিয়ে দিয়ে গেলেন: কবি-শিল্পী ফিরোজকে তিনি হত্যা করেছেন; দেশ জুড়ে তাঁর শত্রু! অনেক ভুল তিনি করেছেন, এখন পর্তুগীজদের শত্রু করে আবার নতুন কোন ভুল করা সঙ্গত হবে না তাঁর পক্ষে।

দরবেশের উপদেশ অনুসারে খ্রীশ্চানদের কোতল না করলেও মামুদ তাঁদের সঙ্গে

বন্ধুত্ব করলেন না : "বন্ধুত্ব করব কতকগুলো ডাকাতের সঙ্গে ! সমুদ্রে যারা লুঠ-তরাজ করে বেড়ায়, তাদের দেব দেশকে লুটপাট করার সুযোগ ! অসম্ভব দরবেশ—ও আদেশ আমি মানতে পারব না।" [সতেরো পরিঃ] ঔপন্যাসিক গৌড়েশ্বরের উপযোগী মামুদের চারিত্রিক দৃঢ়তা, যেমন অঙ্কন করেছেন, সেই সঙ্গে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য একগুঁয়ে, ক্রোধী চরিত্রের দিকটিও ফুটিয়ে তুলেছেন।

বঙ্গের ইতিহাসে দুর্যোগের ঘন মেঘ, এবং আসন্ন ঝঞ্ঝা মাথার ওপর নিয়ে মামুদ শা সিংহাসনে বসেছিলেন। তাঁর এদিকে খ্রীশ্চান—ওদিকে হুমায়ুন, মাঝখানে ব্যাঘ্রের মতো উদ্যত থাবা নিয়ে বিচরণ করছেন পাঠান সর্দার শের খাঁ। প্রতিবেশী হাজিপুরের মখদুম-ই-আলম, শের খাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় বিষস্ফোটকের মত যন্ত্রণাদায়ক হয়ে উঠেছেন। শান্তি ছিল না গৌড়েশ্বরের মনে। অহরহ এই কথারই প্রতিধ্বনি তাঁকে শুনতে হচ্ছে ; ফিরোজ হত্যার পাপেরই ফল ফলতে শুরু করেছে। ঔপন্যাসিক মামুদ শার চরিত্রে এই অন্তর্জ্বালাকে প্রথম থেকেই অসাধারণ নৈপুণ্যে এমন ভাবে প্রকট করেছেন যে চরিত্রটি অন্তর্মুখী (introvert) হয়ে অসামান্য গভীরতা লাভ করেছে। এমন কি সুন্দরী নারী ও সুরার প্রতি তাঁর যে তীব্র আসক্তির কথা ইতিহাস-কারেরা উল্লেখ করেছেন, আলোচ্য উপন্যাসে শিল্পী তার উল্লেখ করলেও, সেটি নিতান্তই গৌণ হয়ে গেছে। যেন ভিতরে-বাইরে অহরহ যন্ত্রণা ও জ্বালাকে ভুলে থাকার জন্যই সুরা-নারী-নর্তকীর কোলে নিজেকে তিনি সমর্পণ করেছেন। "ইরানী সুরার পাত্র শূন্য হয়ে চলেছে একটির পর একটি। সামনে বাঈজীর উন্মত্ত নাচের ঘূর্ণি চলেছে—সে নাচে মানুষের আদিম-আকাঙ্ক্ষা গর্জন করে ওঠে। দিলরুবা, সারেঙ্গী, বাঁশীর সুরে সুরেও যেন আগুন ঝরছে। নেশায় জর্জরিত চোখ মেলে তাকিয়ে আছেন মামুদ শা। নিশি রাত্রের নিঃসঙ্গ আবদুল বদর যেন মামুদ শা হয়ে ভুলতে চাইছেন নিজেকে।" [বাইশ পরিঃ]

সপ্তদশ পরিচ্ছেদেও মামুদশার চরিত্রে ইতিহাসখ্যাত গৌড়ের সুলতান পদে বসার মতো কিছু কিছু চারিত্রিক গুণ ঔপন্যাসিক অল্প-স্বল্প কালির টানেই ফুটিয়ে তুলতে ভোলেন নি। অযোগ্য হলেও তিনি যে নৃপতিতিলক হোসেন শাহ-নসরৎ শাহেরই সিংহাসনে বসেছেন, তার কিঞ্চিৎ পরিচয় আছে তাঁর বীরত্বে, সুলতানী মেজাজে, ব্যক্তিত্বে এবং প্রজাদের প্রতি কর্তব্য চিন্তায়। দরবেশ বিদায় নিলে, তিনি উজীরকে বলেছেন : "ওই খ্রীশ্চান দূতদের এখনি বন্দী করুন—তারপরে ঠাণ্ডী গারদে পাঠিয়ে দিন। আর চট্টগ্রামে খবর পাঠান ওদের দলবল শুদ্ধু সকলকেই যেন আটক করা হয়। দরবেশ বারণ করেছেন, আলফু খাঁও বারণ করেছেন। তাঁদের কথা আমি রাখব—বিনা বিচারে আমি রক্তপাত ঘটাব না। কিন্তু আমার দেশের সমুদ্রে যারা হামলা করে বেড়ায়, গৌড়-বাঙলার প্রজাদের সম্পত্তি আর জীবন যাদের হাতে বিপন্ন, শাস্তি তাদের আমি দেবোই।" [সতেরো পরিঃ]

গৌড়ের সুলতানের মতই এ কথা। পর্তুগীজরা সুদক্ষ সৈনিক—এ কথাটা আলফু

খাঁ স্মরণ করিয়ে দিতে গেলে ক্রুদ্ধ মামুদ বলে উঠেছেন : "একটা জিনিস ক্রীশ্চানদের এখনো বুঝতে বাকী আছে আলফু খাঁ। আমিও আবার বলছি, গৌড় কালিকট এক নয়। গৌড়ের সঙ্গে যদি ওরা শক্তি পরীক্ষা করতে চায় তো করুক। কিন্তু সে পরীক্ষা খুব সুখের হবে না ওদের কাছে।" [পরিঃ সতেরো]

দুর্ভাগ্য মামুদের, যে তিনি এই পর্তুগীজদেরই সঙ্গে শেষ পর্যন্ত আলফু খাঁ ও উজীরের পরামর্শে বন্ধুত্ব করেছিলেন। কারণ, তখন তাঁর ত্রিশঙ্কুর মতো অবস্থা। তিনি ভীরু বা কাপুরুষ ছিলেন না। মখদুম-ই-আলমের হাতে তাঁর সৈন্য একবার পরাজিত হয়েছে শুনে, তাঁর সুলতানের সম্মানে যে প্রচণ্ড আঘাত লাগে, পরবর্তী যুদ্ধে মখদুমের রক্তে সে সম্মান পুনরুদ্ধার করেন। কিন্তু বারে বারে শেরের হাতে পরাজয়ের দুঃখ ও গ্লানি তিনি মুছে ফেলতে পারেন নি। নিজেকে ধিক্কার দিয়েছেন, আর অসহায় ক্রোধে জ্বলে উঠে ঘরময় পায়চারি করেছেন : "এত সহজেই তো কুতুবের পরাজয়ের গ্লানি ভুলতে পারা যায় না। যতদিন শের খাঁকে পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন করা না যায়, যতদিন ভেঙে না দেওয়া যায় বিদ্রোহী বিহারের বিষদাঁত—ততদিন গৌড়-বঙ্গের শান্তি নেই কিছুতেই। ততদিন একটা হিংস্র জন্তুর মতো সারাদিন পায়চারী করবেন মামুদ শা······" [উনিশ পরিঃ]

কিন্তু এ সমস্তই হ'ল সুলতান মামুদ শার বাইরের জগতের পরিচয়। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় মামুদ শার চরিত্রের এই বাহ্যিক দিকটি আদৌ আমল দেন নি। তিনি মনস্তাত্ত্বিক-শিল্পীর মতো তাঁর অন্তরের জগৎটি আমাদের কাছে বারে বারে উদ্ঘাটিত করেছেন। হতাশা, ব্যর্থতা কিংবা যুদ্ধ-অশান্তির আগুনই তাঁকে শুধুমাত্র দগ্ধ করে নি, কৃত পাপের চোরা গ্লানি, ভয়, তাঁর অন্তরকে কুরে কুরে খাচ্ছে প্রতিমুহূর্তে। এই প্রতিক্রিয়ার হাত থেকে তিনি নিজেকে কিছুতেই মুক্ত করতে পারছেন না। ফিরোজের প্রেতচ্ছায়া তাঁকে তাড়া করে নিয়ে চলেছে, রাত্রের নিদ্রা হরণ করেছে, সর্ব-সময়ের শান্তি শুষে নিয়েছে ভ্যাম্পায়ারের মতো। "মামুদ শা ক্লান্ত দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। শান্তি নেই কোথাও। যেদিন আমীর-ওমরাহ্‌দের চক্রান্তের ফলে নসরৎ শার সিংহাসনের ন্যায্য দাবী থেকে তিনি বঞ্চিত হয়েছিলেন—সেদিনও শান্তি ছিল না, আজো নেই। গলার জোরে তিনি অস্বীকার করেন, কিন্তু মনের কাছে আত্ম-বঞ্চনার উপায় কোথায়! চোখ বুজলেই দেখতে পান—আলাউদ্দীন ফিরোজের রক্তমাখা দেহ দাঁড়িয়ে আছে তাঁর সামনে—দুচোখে ক্রোধ আর ঘৃণার আগুন জেলে যেন তাকে দগ্ধ করে ফেলতে চাইছে!" [সতেরো পরিঃ]—বলা বাহুল্য, এ হলো মানসিক প্রতিক্রিয়া। ঐতিহাসিক চরিত্রের যে অন্তর্লোকে পেঁছাতে পারেন না, শিল্পী, সেই দুষ্প্রবেশ্য লোকেও অনায়াসে বিচরণ করতে পারেন। লোকচক্ষুর অন্ত-রালে হৃদয়ের যে রহস্য সংগুপ্ত থেকে মানুষটার প্রকৃত পরিচয় বাইরের মানুষকে জানতে দেয় না, বুঝতে দেয় না, একমাত্র সেই মানুষটাই নিজের মনের মধ্যে মন ডুবিয়ে অন্তরের সেই রহস্যের অভিজ্ঞতায় উচ্ছলিত, অথবা শিহরিত হতে থাকে—তার সাক্ষী,

স্রষ্টা ছাড়া দ্বিতীয় কেউ নন। সাহিত্যের চরিত্র ও তার স্রষ্টা সম্পর্কেও এ সত্য অস্বীকার করার উপায় নেই।

পূর্বোদ্ধৃত অংশটি কি নিছক প্রতিক্রিয়া? না, অনুশোচনা? শুধু অনুশোচনাও নয়! বুঝি, এর সঙ্গে শিল্পীর নৈতিকতা, বা আদর্শের একটি ক্ষীণ আলো এসে পড়েছে! "শান্তি নেই—কোথাও শান্তি নেই!"

সিংহাসন এখনো ফিরোজের রক্তমাখা—আবদুল বদর মামুদ শার চোখের সামনে এখনো তার প্রেতচ্ছায়া ভেসে বেড়ায়। নিথর রাত্রে কখনো কখনো ঘুম ভেঙে যায় মামুদ শার—খোলা জানালা দিয়ে পড়া এক ঝলক চাঁদের আলো যেন ফিরোজের মূর্তিতে পরিণত হয়। একটা তীক্ষ্নধার ছোরা হাতে নিয়ে সে যেন এগোতে থাকে মামুদ শার দিকে—তার দুটো চোখ নিষ্ঠুর হিংসায় দুখানা হীরের মতো ঝকঝক করে ওঠে। একটা আর্ত চিৎকার বেরিয়ে আসে মামুদ শার গলা থেকে: আল্লা—রহমান!" [ঊনিশ পরিঃ] শুধু এইটুকুই নয়;—শুধু দীর্ঘশ্বাস নয়, একেবারে হাঁটু গেড়ে বসে প্রার্থনা; "মাটিতে হাঁটু গেড়ে বসে একা প্রার্থনা করেন মামুদ শা। কয়েক মুহূর্তের দুর্বলতায় আল্লার কাছে মিনতি জানান তিনি; 'ফিরিয়ে দাও—ফিরিয়ে দাও আবদুল বদরকে! আমি মামুদ শা হতে চাই না!" [ঐ]

রাতের অন্ধকারে নিঃসীম শূন্যতা ও একাকীত্বের দুর্বল মুহূর্তে অনুতাপানলে দগ্ধ এবং অসহায় কাতর এ কণ্ঠস্বর কার? এ কি ইতিহাসের মামুদ শা? না কি ব্যক্তি আবদুল বদরের কণ্ঠে আদর্শবাদী ঔপন্যাসিকেরই কণ্ঠস্বর? পাপ-অন্যায়-দম্ভ চিরদিন মাথা উঁচু করে থাকে না! তার প্রায়শ্চিত্ত একদিন করতেই হয়। বিবেকের দংশন, অনুশোচনার আগুন নিষ্ঠুর যন্ত্রণায় শাস্তি রূপে সে পাপ ও দম্ভকে দগ্ধ করতে থাকে! কবি-শিল্পী নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের মর্মমূলে প্রতিষ্ঠিত, এই জীবন-সত্য। শিল্পীর এই জীবনাদর্শেই মুক্তোকে (উপনিবেশ) আবার ফিরে আসতে হয় কবিরাজের কাছে। কবি-বিপ্লবী নীলকণ্ঠকে গলা টিপে হত্যা করে করুণাদির স্বামী আইন ব্যবসায়ী বিপ্লবী নেতা অমিয় ঘটককে ('শিলালিপি') চিরকাল উন্মাদ অবস্থায় প্রায়শ্চিত্ত করতে হয় এই বলে: "ক্ষমা করো, আমায় ক্ষমা করো নীলকণ্ঠ। আমার রক্ত খেয়ো না, আমাকে বাঁচাও, বাঁচাও নীলকণ্ঠ—" রেহাই পায় নি শঙ্খ দত্ত-ও। পর্তুগীজ কামানের তোপানলে শঙ্খের মুঠোর মধ্য থেকে শম্পাকে ছিনিয়ে নিয়ে গেছেন কৃষ্ণ চৈতন্যাম্বরম।

মামুদ শার প্রায়শ্চিত্ত-জ্বালা, দিনের বেলায় আর এক রকম। দিনের আলোয় তাঁর সর্বশরীরে জ্বালা ধরায় মখদুম-ই-আলম এবং শের খাঁ। এ জ্বালা পরাজয়ের, অপমানের, ক্ষুদ্রের ঔদ্ধত্যের। "ওই শয়তান শেরের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে মখদুম-ই-আলম। সেই মখদুম—যার চক্রান্তে নসরৎ শাহের ছেলে ফিরোজকে বসানো হয়েছিল গৌড়ের সিংহাসনে—সেই মখদুম যার জন্যে মামুদের হাত আজ রক্ত কলঙ্কিত। গৌড়ের বুকে বিহারের ওই কাঁটাগুলো খচ খচ করে বিঁধছে সব সময়ে। যেমন করে হোক—উপড়ে ফেলতেই হবে এদের।" [ঊনিশ পরিঃ]

ঔপন্যাসিকের অন্তরে যে জীবন-দার্শনিক বসে আছেন, তিনি নিজেই অবশেষে বেরিয়ে এসেছেন :

"সিংহাসন! প্রতাপ! সুখ!

"প্রতাপ থাকলে সিংহাসন পাওয়া যায় বই কি—তখ্‌তে বসে নির্ধারণ করা যায় কোটি কোটি মানুষের জীবন-মৃত্যু। বিলাস? তারও ত্রুটি থাকে না। আসে রাশি রাশি আশ্চর্য সূক্ষ্ম মসলিন—যেন চাঁদের আলোর সুতো দিয়ে গড়া; হীরা-মানিক-মোতি সবই আসে, ইরানের সেরা সুন্দরীরা এসে জড়ো হয় রংমহলে—কত উন্মত্ত রাত কাটে উদ্দাম সম্ভোগের বন্যতায়! কিন্তু তারপর? কোনো নিঃসঙ্গতায়—নিজের কোনো একান্ত অবসরে—বুকের ভেতরে তাকিয়ে দেখো একবার। কেউ নেই—কিছুই নেই!" [উনিশ পরিঃ]

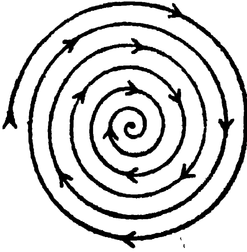
মামুদ শা মৃত ইতিহাসের পাতা থেকে উঠে এসেছে চিরন্তন জীবনের দীর্ঘশ্বাসে-ভরা বিষাদ-গম্ভীর ট্রাজেডীর ধ্রুবলোকে। যে উচ্চ ভূমিতে দাঁড়িয়ে জীবনের একটা অর্থ অন্বেষণ করা যায়! জীবনের দম্ভ-প্রতাপ-ভোগ-সুখ নয়,—জীবনের শান্তির সন্ধান পাওয়া যায়। মামুদকে অবশেষে যেন সর্বনাশের ভগ্নস্তূপের ওপর দাঁড় করিয়ে শিল্পী-দার্শনিক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় তীক্ষ্ন প্রশ্নে জীবনের সার্থকতা লাভের বা শান্তি লাভের পথের ইঙ্গিত দিয়েছেন :

"......ফিরোজের রক্তমাখা সিংহাসন। হোসেন শাহের সমাধির পাশে লুটিয়ে পড়ে আছে নসরৎ শার মৃতদেহ। রক্ত আর মৃত্যুর অভিশাপ চারদিকে। একটা বায়বীয় শূন্যতার মধ্যে তিনি দাঁড়িয়ে আছেন—তাঁর সম্মুখে যেন প্রেতলোকের হাতছানি। আবদুল বদর হয়ে সহজে নিশ্বাস ফেলতে পারো না, খোলা আকাশের নিচে দাঁড়িয়ে নিঃসংশয় চোখে দেখতে পারো না খোদাতালার পৃথিবীকে?" [বাইশ পরিঃ]

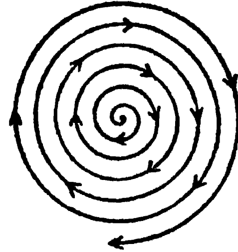
'পদসঞ্চার'-এর মামুদ শার চরিত্র সৃষ্টিতে স্রষ্টা নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ইতিহাসের চরিত্র অপেক্ষা নিজের সৃষ্টি ক্ষমতাকেই একটু বেশী প্রাধান্য দিয়েছেন! কৃতপাপের জন্য অনুশোচনা ঠিক বলা না গেলেও, তীব্র প্রতিক্রিয়ায় মামুদ শা অন্তর্জ্বালায় অনুক্ষণ যে ভাবে দগ্ধ হয়েছেন, তাতে চরিত্র অন্তর্মুখী এবং শিল্পোজ্বল হয়েছে ঠিকই, কিন্তু ইতিহাসের মামুদ শাকে বিশেষ পাওয়া যায় না। মোঘল বা সুলতানী শাসনকালে সিংহাসন লাভের পথ অনেক ক্ষেত্রেই রক্তাক্ত ও পঙ্কিল। সুতরাং মামুদ শা ইতিহাসে অনন্য এবং একক নন। কিন্তু ঔপন্যাসিক এই চরিত্রটিকে মানসিক প্রতিক্রিয়ায় যে ভাবে ক্ষত-বিক্ষত এবং হতাশা-পীড়িত করেছেন, তাতে মনে হয়, ফিরোজ হত্যারূপ গর্হিত কার্য হঠাৎ-ই তিনি করে ফেলেছেন—যেন তাঁর এরূপ কোন অভিপ্রায় ছিল না। পনেরো সতেরো, উনিশ, একুশ এবং বাইশ—প্রধানত এই পাঁচ পরিচ্ছেদে মামুদ চরিত্রটি অঙ্কন করা হয়েছে। এর মধ্যে প্রথমটিকে বাদ দিলে, বাকি চারটি পরিচ্ছেদ জুড়ে শিল্পী তাঁকে যন্ত্রণা-দগ্ধ, ক্লান্ত ও হতাশাগ্রস্ত করেই অঙ্কন করেছেন।

মামুদ শা এবং ডি মেলো—দুটিই ঐতিহাসিক চরিত্র; কিন্তু দুটি চরিত্রের শিল্প

পদ্ধতি সম্পূর্ণ বিপরীত। মামুদ শা অন্তর্মুখী, এবং ডি মেলো বহির্মুখী চরিত্র। বাইরের জগৎ থেকে মামুদ নিজেকে গুটিয়ে এনে পাকে পাকে অন্তরের অন্তঃস্থলে একটি কেন্দ্রবিন্দুর দিকে নামিয়ে আনেন, ডি মেলো, বা খোদাবক্স খাঁ-এর বাইরের জগতের দিকেই টান। একজন কেন্দ্রানুগ, অন্যজন কেন্দ্রাতিগ। চিত্রের সাহায্যে দুই প্রকার চরিত্রের শিল্প পদ্ধতি বুঝিয়ে দেওয়া যেতে পারে।



চিত্র নং—১
[মামুদ শার চরিত্রে কেন্দ্রাভিমুখী পাক]



চিত্র নং—২
[ডি মেলো বা খোদবক্স খাঁ-র চরিত্রে পরিধিমুখী পাক]

১নং চিত্রের তীরের ফলামুখ লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে, মামুদ শার বৃত্তায়ত জীবনে কেমন ভাবে পাকে পাকে প্রায়শ্চিত্তের আগুন দগ্ধ করতে করতে তাঁকে পাপ ও রহস্যের কেন্দ্রমূল মর্মের দিকে টেনে নিয়ে গেছে। ২নং চিত্রটি এরই বিপরীতমুখী টান। এখানেও চরিত্র বৃত্তায়ত। তবে পরিস্থিতি উদ্দেশ্য, আদর্শ এবং ঘটনার আকর্ষণে চরিত্র বাইরের জীবনের সঙ্গেই প্রধানত আবর্তিত হয়েছে।

ফিরোজ হত্যা জনিত পাপ, নরশোণিতে কলঙ্কিত মামুদ শার অন্তর্মুখী চরিত্রকে প্রায়শ্চিত্তের আগুনে তিলে তিলে দগ্ধ করে ইতিহাসের ট্রাজিক পরিণতির সঙ্গে মিলিয়ে দিয়ে ঔপন্যাসিক তাঁর শৈল্পিক ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন।

॥ সোমদেব ॥

বঙ্গের ইতিহাসের পাতায় সোমদেবের নাম আছে কিনা জানি না, তবে পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষাশেষি থেকে ষোড়শ শতাব্দীর তৃতীয় দশক পর্যন্ত অর্থাৎ, শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব থেকে তিরোধান কাল পর্যন্ত যে সময়ের ইতিহাস 'পদসঞ্চার' উপন্যাসের কায়া গঠন করেছে, সেই সময়ে সোমদেবের মতো ক্ষয়িষ্ণুমূল ব্রাহ্মণ-শাক্ত-তান্ত্রিক চরিত্র ছিল। শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের কিছুকাল আগে থেকেই ব্রাহ্মণ-শাক্ত-তান্ত্রিক ধর্মের সাধন-ভজন ক্রমশঃ বীরাচারী ক্রিয়া-প্রক্রিয়া-সর্বস্ব হয়ে উঠছিল। নারীর দেহকে সাধনচক্র করে কুলকুণ্ডলিনী শক্তিকে জাগ্রত করার কঠিন-সাধনা ক্রমশঃ সুরাপান ও নারীদেহ ভোগ লোলুপতায় পর্যবসিত হচ্ছিল। ফলে, শাক্ততান্ত্রিকদের প্রতি জন-মানসে

একটা ভয় ও ঘৃণার ভাব জেগে উঠছিল। ধর্মভীরু সাধারণ মানুষ যে ঈশ্বরের শরণাগতি লাভ করে জীবনে শান্তি পেতে পারে, করুণা ও প্রেম লাভ করতে পারে, যাঁর কল্পনায় হৃদয়ে প্রেম ও ভক্তিভাব উচ্ছলিত হয়ে উঠতে পারে, সেই ঈশ্বরের জন্য আকুল-করা ডাকে সাড়া দিলেন মধুর প্রেমের ভগবান—বংশীধারী, রাধাবিনোদিনী শ্রীকৃষ্ণ। ভক্ত হৃদয়ের আহ্বান উপেক্ষা করতে না পেরে অবতার রূপে আবির্ভূত হলেন নিমাই—"কৃষ্ণচৈতন্যমীশ্বরম"। শ্রীচৈতন্যের ভক্তি-প্রেমধর্ম হরি সংকীর্তনের সাহায্যে জনে জনে যতই আবেশ ও আকর্ষণ সৃষ্টি করতে থাকল, ততই ব্রাহ্মণ শাক্ততান্ত্রিকগণ প্রথমে চৈতন্য ও তাঁর ভক্তবৃন্দ, এবং পরে সমগ্র বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের ওপর খড়্গহস্ত হয়ে উঠলেন। যত্রতত্র বৈষ্ণবদের প্রতি ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ অত্যাচার করতে তাঁরা দ্বিধা করলেন না। এঁদের মধ্যে আবার কেউ কেউ মনে করলেন, বিধর্মী মুসলমানদের হাত থেকে শাসনক্ষমতা কেড়ে নিয়ে হিন্দুর রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করতে না পারলে ব্রাহ্মণ তার সম্মান ও সামাজিক অধিকার ফিরে পাবে না। অতএব ধর্মচর্চা আর রাজনীতি উভয়ই এই ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের জীবনের ব্রত হয়ে উঠল। সোমদেব হলেন তৎকালের এই ব্রাহ্মণ শাক্ত সম্প্রদায়েরই একজন প্রতিনিধি। এইদিক থেকে, সোমদেব চরিত্রকে ঐতিহাসিক চরিত্র বলা অযৌক্তিক নয়। কিন্তু ঔপন্যাসিকের কল্পনা অংশও কম নেই এই চরিত্র সৃজনে; তাই পুরোপুরি ঐতিহাসিক চরিত্রের তালিকায় সোমদেবকে না রেখে তাঁকে আধা-ঐতিহাসিক চরিত্ররূপে উল্লেখ করা হ'ল।

ঐতিহাসিক উপন্যাসের ঐতিহাসিক উপাদানগুলির অন্যতম হ'ল ধর্ম ও সংস্কৃতি। সোমদেব চরিত্রাঙ্কনের সাহায্যে ঔপন্যাসিক সেই ধর্ম-সংস্কৃতির একটি প্রধান অংশ গঠন করে নিয়েছেন। শুধু ধর্ম-সংস্কৃতি নয়, একটি দেশের অর্থনৈতিক সামাজিক ও রাজনৈতিক উপাদানগুলিও সেই দেশের ইতিহাসের পক্ষে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। সোমদেব তাঁর দুই শিষ্য সপ্তগ্রামের বণিক শঙ্খ দত্ত, ও চাকারিয়ার বণিক রাজশেখরকে নিয়ে বঙ্গের রাজনৈতিক পরিবর্তনের একটি চক্রও গঠন করতে চেয়েছিলেন। ফলে দুই ভিন্ন দিক থেকে সোমদেব চরিত্র ঐতিহাসিক উপন্যাস 'পদসঞ্চার'-এ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে পর্তুগীজ ক্যাপিতান ডি মেলোর বঙ্গদেশাভিমুখে আগমন সূচনা। ঐশ্বর্যের দেশ, সৌন্দর্যের দেশ, মায়াময় স্বপ্নের দেশ বঙ্গ—এইরূপ স্বাপ্নিল কল্পনার আবেশ ডি মেলোর দুচোখে। অতঃপর এই পরিচ্ছেদেরই শেষভাগে ডি মেলোর রোমান্টিক কল্পনার বিপরীত কোটির চিত্র হিসাবে দেখি, শৈব-সাধক সোমদেবের বঙ্গের 'রাজনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে 'অ্যান্টি-রোমান্টিক' ভাবনা-চিন্তাকে। সুনিপুণ পরিকল্পনায় এই চিত্র উপস্থাপিত করেছেন শিল্পী। সোমদেব চরিত্রের যাত্রা শুরু হয়েছে ধর্মীয় কোন সাধন-ভজন-তত্ত্ব নিয়ে নয়, তাঁর যাত্রা শুরু রাজনৈতিক চিন্তার একটি মশাল হাতে। নির্বিরোধী, শান্ত, আত্মতৃপ্ত সাধারণ মানুষগুলিকে তিনি অবজ্ঞা করেন, ঘৃণা করেন। কারণ, তাদের কোন অভিযোগ নেই, প্রতিবাদ নেই!' সোমদেব ভাবতে থাকেন: "এই দেশ

একদিন হিন্দুরই ছিল—শক্তি থাকলে, সাধনা থাকলে আবার তা হিন্দুর হবে। আজকের বিধর্মী শাসন থেকে আবার মুক্তি হবে তার, জ্বলবে হোমের অগ্নি, উঠবে বেদমন্ত্রের সুর, আবার আর্যধর্ম ফিরে আসবে তার সগৌরব মর্যাদায়।" [২য় পরিঃ]—বিধর্মীর হাত থেকে রাজ্য ছিনিয়ে নিয়ে সোমদেব নিজে রাজ্যভোগ করতে চান না। ভারতবর্ষের ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের সে-ইচ্ছা বলবতী ছিল না কোনদিনই, তাঁদের কাম্য ছিল সামাজিক মান, মর্যাদা ; সমাজের মাথায় থাকবে তাঁদের স্থান। চাণক্য সিংহাসন চান নি ; সিংহাসন থাকবে তাঁর পদচ্ছায়ায় ! সোমদেব হলেন ক্ষেমংকর ['মালিনী' : রবীন্দ্রনাথ], রঘুপতি ['বিসর্জন' : রবীন্দ্রনাথ] গোত্রের। সিংহাসন, ভোগ ও ঐশ্বর্যে তিনি পদাঘাত করেন। তিনি চান ব্রাহ্মণের হৃত সম্মান ফিরে পাক ব্রাহ্মণ। বিধর্মী মুসলমান শাসনে, ব্রাহ্মণের সেই প্রবল প্রতাপ, সেই ক্ষাত্র-বলকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা লুপ্ত।

হিন্দু রাজ্য-প্রতিষ্ঠা—সোমদেবের নিছক আবেগ-কল্পনা, বা, ধ্যান নয়—তাকে বাস্তবায়িত করতেই তিনি চান ; তারই জন্য "একটা তীক্ষ্ম মর্মজ্বালা সোমদেবের দুটো রক্তবর্ণ ভয়ঙ্কর চোখের মধ্য দিয়ে যেন ফুটে বেরুতে থাকে।" তিনি বোঝেন এর জন্য সাধারণ মানুষকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে ; দেশের বিত্তশালী, ক্ষমতাবান, প্রতিষ্ঠাবান শ্রেষ্ঠী-সদাগর-জমিদার শ্রেণীর সহযোগিতা একান্ত প্রয়োজন। তাঁর ভক্ত শিষ্যদের অনেকেই প্রতিষ্ঠিত, বিত্তশালী বণিক। তাঁদের এ বিষয়ে জাগ্রত করতে হবে, আগ্রহী করে তুলতে হবে! তৃতীয় পরিচ্ছেদে তার আয়োজন করেছেন ঔপন্যাসিক ; এবং প্রথম পরিচ্ছেদেই অত্যন্ত কৌশলে বণিক শঙ্খ দত্তের চিন্তার মধ্য দিয়ে সোমদেবের এই প্রচেষ্টার নিদর্শন মিলবে।

কিন্তু তার আগে ভয়ঙ্করদর্শন কাপালিক সদৃশ, রক্তচক্ষু ব্রাহ্মণ সোমদেবের পাহাড়ের মতো কঠিন-গম্ভীর চেহারাটাও "শালগাছের মতো ঋজু দীর্ঘদেহ। গভীর কালো গায়ের রঙ্—দুটি আরক্ত চোখ যেন সব সময় ঘুরছে। ললাটে ত্রিপুণ্ড্রকের রক্ত রেখা।" [১ম পরিঃ]—তাঁর অটল ব্যক্তিত্বেরই পরিচায়ক এ রূপ। 'মানুষ তাকে সভয়ে পথ ছেড়ে দাঁড়ায়, তাঁর সামনে পড়লে প্রাণপণে ছুটে পালায় ছেলেমেয়েরা।' জঙ্গলের কাঁটায় হাত পা ছড়ে-ছিঁড়ে গেলে ভ্রূক্ষেপও করেন না। অত কী,—শ্বাপদ-সঙ্কুল অরণ্যের মধ্য দিয়ে অন্ধকারে নির্ভয়ে তিনি চলেন, কারণ, 'তারাও তাঁকে চেনে। সসম্মানে পথ ছেড়ে দেবে।' জোরে কথা বললে হুঙ্কারের মতো শোনায়, পর্বতগুহা গমগম করে, আর শ্রোতাদের পিলে চমকে ওঠে। শিবকে বিসর্জন দিয়ে তিনি যে চামুণ্ডা রূপিণী মহাকালীর প্রতিষ্ঠা করতে চাইছেন, তারই উপযোগী তাঁর ভয়ঙ্করদর্শন মূর্তিটি। এরূপ মানুষের দিকে তাকাবার সাহস কোথায় কিশোরী সুপর্ণার।

নির্জনগুহায় জঙ্গলের মধ্যে বাস করলেও ত্রিকালজ্ঞের মতো ছিল সোমদেবের দৃষ্টি ; রাজনীতিজ্ঞের মতোই কুটিল চিন্তাশক্তি। তিনি ঠিকই বুঝেছিলেন, পর্তুগীজ-হার্মাদরা শুধু দুঃসাহসী নয়, তারা দুরাকাঙ্ক্ষীও বটে। শঙ্খ দত্ত মনে করেন, ব্যবসা করতে, মশলা কিনতেই তারা এত দূর এসেছে। কিন্তু বিশ্বাস করেন না সোমদেব।

ভ্রূকুটি করে বলেন : "ওরা যা কিছু দেখে তাতেই ওদের চোখ লোভে চক্ চক্ করে ওঠে। ওরা শুধু মসলা নেবে না—আরো কিছু নেবে। যদি চেয়ে না পায় ছিনিয়ে নেবে।" [এক পরিঃ] কুটিল ও তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তিনি পর্তুগীজদের অন্তঃপ্রকৃতি পর্যন্ত বুঝে নিয়েছেন : "দয়া নেই, বিবেক নেই। বিশ্বাসঘাতকতা ওদের মজ্জায় মজ্জায়। দুর্বলের ওপর কথায় কথায় তলোয়ার নিয়ে তাড়া করে আসে, সবলের পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়ে পোষা কুকুরের মতো। একটা কিছু করে তবে ওরা যাবে।" [এক পরিঃ] দেশের সুদূর ভবিষ্যৎ তাঁর অন্তর্ভেদী দৃষ্টিতে অনেক আগেই প্রতিভাত হয়েছিল : "খ্রীষ্টানেরা দেশ জয় করবে—মানুষের তাজা রক্তের ওপর দিয়ে পদসঞ্চার করবে গৌড়ের সিংহাসনের দিকে, তারপর সেখান থেকে গিয়ে পৌঁছুবে দিল্লীর শাহী-তখ্ত পর্যন্ত।" [পাঁচ পরিঃ]

রাজনীতিবিদদের মতোই তাঁর চর্তুর্দিকে সজাগ দৃষ্টি ছিল ভারতবর্ষের ইতিহাসে, বিশেষতঃ বঙ্গে কোথায় কী ঘটছে সবই তাঁর জানা : "ওদিকে বাংলা আর বিহারের পাঠানেরা জোট বাঁধছে দিল্লীর বিরুদ্ধে। ভয়ঙ্কর গোলমাল দানা বেঁধে উঠছে চারিদিকে। এই সুযোগ।"—সুযোগ নির্বাচনে তাঁর কোনো ভুল হয় নি ; ভুল হয়েছিল শুধু বাঙলার মানুষগুলো সম্বন্ধে। শঙ্খ দত্তের মনে সংশয়াচ্ছন্ন প্রশ্ন দেখা দিয়েছিল—সোমদেবকে সম্পূর্ণ মেনে নিতে পারেন নি তিনি। বোধ হয় সোমদেবের মতো দূরদৃষ্টি শঙ্খের ছিল না বলেই। কিন্তু বঙ্গের বিধর্মী মুসলমান শাসক সম্বন্ধে সোমনাথের মতো মুষ্টিমেয় ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের যে বিদ্বেষ, বা ঘৃণাই থাকুক, বঙ্গের অন্যান্য শ্রেণীর মানুষের মনে শাসক সম্প্রদায় সম্পর্কে সে বিদ্বেষ ছিল না। "আজ প্রায় চার বছর ধরে সোমদেব এই যে বাংলা দেশের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত ঘুরে বেড়াচ্ছেন—কতটুকু সাড়া তিনি পেয়েছেন ? দেশের যারা ভূস্বামী, তাদের অধিকাংশই বিধর্মী শাসকের পায়ে মাথা বিকিয়ে বসে আছে।" [ষোল পরিঃ] শ্রেষ্ঠী রাজশেখর এ বিষয়ে সোমদেবের সঙ্গে যুক্তির তর্কেও অবতীর্ণ হয়েছেন। তিনি সোমদেবকে সরাসরি প্রশ্ন করেছেন : মুসলমানদের প্রতি তাঁর এমন বিদ্বেষের কারণ কি ? প্রত্যুত্তরে সোমদেব মুসলমান শাসকদের যে যে অপরাধের—মন্দির ভেঙ্গে মসজিদ নির্মাণ, জোর করে ধর্মান্তরিত করা, হত্যা, লুণ্ঠন ইত্যাদি—কথা উল্লেখ করেছেন কারণ হিসাবে, তার সব কটিই খণ্ডন করেছেন রাজশেখর : "আমাদের পূর্বপুরুষরাও তো অনার্য-শবর-কিরাতদের পরাজিত করে তাদের মধ্যে নিজের ধর্মপ্রচার করেছে।" [ছয় পরিঃ] কত বৌদ্ধকে হত্যা করা হয়েছে ব্রাহ্মণের নেতৃত্বে। 'শঙ্খ দত্তও মুসলমান শাসকদের প্রতি গুরুদেবের অন্ধ রাগ ও বিদ্বেষকে সমর্থন করেন নি। আর দেশের সাধারণ মানুষের তো—এ সব বড় বড় চিন্তা অলীক কল্পনা ছাড়া কিছুই নয়। বরং, সুখে-দুঃখে, আপদে বিপাদে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে সামাজিকতার বন্ধনে, বাঁধা পড়ে গেছে হিন্দু-মুসলমান বঙ্গের জীবন যাত্রায়। তাই ব্রাহ্মণ সোমদেব তাঁর সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণ চিন্তার জগতে একাকী বিচরণ করেছেন। কাউকে তাঁর চিন্তার অংশীদার তো দূরের কথা, সমর্থক পর্যন্ত করতে পারেন নি।

বিরাট একটা শক্তির পিণ্ড তিনি, একা একাই জ্বলে শেষ হয়ে গেলেন—ক্লাসিক্যাল ট্রাজেডির নায়কের মতো। একবিংশ পরিচ্ছেদে পর্তুগীজ সেনানায়ক মেঞ্জেস ও আলকোকোরাদো যখন চট্টগ্রামের বন্দরে আগুন জ্বালিয়েছেন, বাড়ীঘর ধ্বংস করছিলেন, তখন সোমদেবের অন্তর এই ভীরু ক্লীব মানুষগুলোর প্রতি ঘৃণিত কুণ্ঠিত হয়েছে, এবং একাকীই তিনি কালান্তক যমের মতো তরোয়াল নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লেন পর্তুগীজ সৈন্যের ওপর এবং বীরের মৃত্যু বরণ করলেন। আপাতত দৃষ্টিতে যতই হাস্যকর মনে হোক, সোমদেবের এই আচরণ, সম্পূর্ণ তার চরিত্রোপযোগী ; এবং ঔপন্যাসিকের গভীর জীবনবোধেরই পরিচায়ক। নিজ বিশ্বাসে সোমদেব অটুট এবং অটল থেকেছেন শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের আগের মুহূর্ত পর্যন্ত। তাঁর বিধর্মী-বিদ্বেষ মজ্জাগত, তাঁর হিন্দু-প্রীতির আড়ালে ব্রাহ্মণ-প্রীতি শরীরের নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের মতোই ; ব্রাহ্মণের তেজ-দর্প-অহঙ্কার, কর্ণের সহজাত কবচ কুণ্ডলের মতোই তাঁর মধ্যে জ্বলছে। ভীরুতা, ভণ্ডামী ছিল না বলেই তিনি কাঙালের মতোই জীবনকে আঁকড়ে ধরে থাকতে পারেন নি। বিপরীত পক্ষে, চারিপাশের হিংসা-হানাহানি, কাপুরুষতা ও আত্মপ্রীতি, প্রবলের অত্যাচার এবং ভীরু-দুর্বলের শব-বৃত্তি তাঁকে ঘৃণায় জ্বালিয়ে তুলেছে। কাদের মধ্যে বাস করবেন তিনি? মানুষ বলেই যাদের গণ্য করতে পারেন না, নিজেদের অসম্মান-লাঞ্ছনা-অত্যাচার দেখেও যারা হা-হা করে হাসে, মজা দেখে,—সেই দেশ ও জাতির মধ্যে বেঁচে থাকাটাই সোমদেবের মতো মর্যাদাভিলাষী লোকের পক্ষে, কলঙ্ক, অসম্মানকর। এর চেয়ে মৃত্যু—মহাগৌরবের। সোমদেব সেই বীরের মৃত্যু, সেই মহাগৌরবের মৃত্যুই বরণ করে নিয়েছেন। এ মৃত্যু মহাকালীর পদতলে নয়, মহাকালের চরণে। তান্ত্রিক ব্রাহ্মণের জ্বলন্ত শিখাটি মহাকালের বুকে নির্বাপিত হয়ে গেল, জ্বলে উঠল বৈষ্ণবের প্রেম-দীপ। খ্রীশ্চান ধর্মের কলোচ্ছ্বাস তখনও ক্ষীণ।

রাজনৈতিক ভাবনা ছাড়া সোমদেব চরিত্রের আরও একটি দিক উদ্ঘাটিত করেছেন শিল্পী। বৈষ্ণবের ভাবতরঙ্গ, প্রেম ও ভক্তিরসের প্রবাহ মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যকে কেন্দ্র করে বঙ্গের জনজীবনকে ক্রমশঃ আলোড়িত ও আপ্লুত করেছিল তখন ; ক্ষয়মূল শাক্ত তান্ত্রিক ধর্ম তখন মৃতপ্রায় ; মানুষের মন থেকে তার প্রভাব বিলীয়মান। ফলে নবাগত বৈষ্ণব প্রেমধর্মের জোয়ারে এক ঘরে হয়ে যাওয়া শক্তিসাধকের প্রচণ্ড বিদ্বেষ জেগে ওঠে বৈষ্ণবদের প্রতি। এই বিদ্বেষ-হিংসা, হিংসাত্মক ক্রিয়াকলাপে রূপান্তরিত হয়। সোমদেব চরিত্রে ঔপন্যাসিক শক্তিসাধকের সেই অনুদার, হিংসা-বিদ্বেষের ভাবটিও জীবন্ত করে তুলেছেন।

বৈষ্ণবের নাম শুনলেই ক্ষেপে ওঠেন সোমদেব। তিনি মনে করেন, "ক্লীবের দেশকে আরো ক্লীব করে দিচ্ছে ওরা। যেটুকু পৌরুষ অবশিষ্ট ছিল, ওরাই তা শেষ করবে। এই পাষণ্ড বৈষ্ণবগুলোকে ধরে একটার পর একটা মহাকালীর পায়ে বলি দেওয়া উচিত।" [সাত পরিঃ] শিষ্য শঙ্খ দত্ত ভেবেছেন : "মহাকালীকেই জাগানো দরকার। বৈষ্ণবের বিষাক্ত প্রভাব মুছে দিতে হবে দেশ থেকে। সোমদেব ঠিকই বুঝে-

ছিলেন।" [নয় পরিঃ] মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য: "চৈতন্য? সেই পাগলটা ?......সে আবার মহাপ্রভু হল কেমন করে ?" [ষোল পরিঃ]

সোমদেবের এই বৈষ্ণব বিদ্বেষের অন্যতম কারণ হ'ল—বিধর্মীর শাসনে দেশে এসেছে ক্লীবতা, জড়তা ও দুর্বলতা। শক্তির জাগরণ ঘটলে তবেই হিন্দুর শাসন সম্ভব। নৈয়ায়িক কেশব পণ্ডিতের পত্নী ভক্ত-শিষ্যা মালিনীকে তিনি বুঝিয়েছেন: "যখনি এই দুর্বলের অহিংসা ধর্ম দেশকে ছেয়ে ফেলেছে, তখনি তার পরিণামে এসেছে সর্বনাশ। একদিন বুদ্ধ এনেছিল এই ক্লীবতার বন্যা—মেরুদণ্ডে ঘুণ ধরিয়েছিল জাতির—সেই পথ দিয়ে দেশে পাঠান এল। আজ আবার যখন উপযুক্ত সময় এসেছে,—তখন দুষ্টগ্রহের মতো দেখা দিয়েছে এই বৈষ্ণবের দল। যাদের হাতে তলোয়ার দেওয়া উচিত ছিল, তাদের হাতে দিয়েছে খোল করতাল। দেশশুদ্ধ এই বীর্যহীনদের দল যখন গলা ফাটিয়ে অহিংসার জয়গান গাইবে, তখন সেই অবসরে ক্রীশ্চান এসে রাজা হয়ে বসবে! তাই দেশের মঙ্গলের জন্যেই এই ফোঁটা-তিলকওয়ালাদের ধরে প্রহার করা উচিত—নিপাত করলেও পাপ নেই।" [ষোল পরিঃ]

একদিক থেকে সোমদেবকে 'টাইপ' চরিত্র বলা যেতে পারে। মধ্য যুগের হৃত-সম্মান, হৃত-গৌরব, ব্রাহ্মণ শাক্তদের তেজ-দম্ভ, শক্তি সম্মান ফিরে পেতে ক্রোধে জ্বলে ওঠা, বৈষ্ণবদের প্রতি বিদ্বেষ, তাদের বীরাচারী সাধন পদ্ধতির ব্যাভিচারিতা—(অবশ্য সোমদেবের মতো মুষ্টিমেয় স্ব-ধর্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ ব্যতিক্রম)—এইগুলি সবই সোমদেব চরিত্রে জাজ্বল্যমান। 'টাইপ' শ্রেণীর চরিত্র সাধারণত 'ফ্ল্যাট'—জাতীয় হয়। কিন্তু সোমদেব চরিত্রে চিন্তার পাকে পাকে তাঁর অন্তরের গভীরে প্রবেশ করে অন্তর রহস্য উন্মোচন করেছেন শিল্পী; চারিদিকের ক্লীবতা, ভীরুতা, মেরুদণ্ডহীন জাতির বিধর্মী শাসকের পদতলে মস্তক স্থাপন, অহিংস, প্রেমোন্মাদ বৈষ্ণবদের নির্বীর্যতা সোমদেবকে দারুণ মর্মজ্বালায় প্রতি মুহূর্তে দহন করেছে। চরিত্রটি টাইপ হয়েও অনেকটা অন্তর্মুখী চরিত্রের মতোই জটিল বা 'রাউণ্ড' চরিত্রের রূপ নিয়েছে। চরিত্রাঙ্কনে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের এটি একটি বৈশিষ্ট্য। এ কৃতিত্ব তাঁর শক্তিমত্তারই পরিচায়ক।

॥ শম্পা ॥

নারী চরিত্রাঙ্কনেও নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের গভীর জীবনবোধ, স্বচ্ছ দৃষ্টি এবং প্রখর কল্পনাশক্তি বিস্মিত করে। মুক্তো, মা-ফুন, মল্লিকা, অলকা, করুণাদি, উত্তমা, কল্যাণী, মনীষা, তৃপ্তিরাণী, সুবর্ণা (সুনু),—এরূপ অসংখ্য চরিত্র ছড়িয়ে আছে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের সৃজনী শক্তির স্বাক্ষর হিসেবে। 'পদসঞ্চার'-এর দেবদাসী শম্পা এবং সুপর্ণা দুই ভিন্নধর্মী চরিত্রাঙ্কনেও শিল্পীর দক্ষতা বিস্মিত করে।

শম্পা দেবদাসী—দেববধূ। পুরীর জগন্নাথদেবের চরণে সমর্পিতা। দেবদাসীদের চমকপ্রদ ইতিবৃত্ত আছে। কেউ দত্তা, কেউ বিক্রেতা, কেউ ভক্তা, কেউ অলঙ্কৃতা, কেউ গোপিকা, কেউ বা হৃতা, ইত্যাদি। শম্পা—হৃতা। শোনা যায় উজ্জয়িনীর কোন এক

গ্রাম থেকে একদল তীর্থযাত্রী নাকি শৈশবে তাঁকে হরণ করে আনে, এবং পুণ্যের লোভে জগন্নাথ মন্দিরে তাঁকে সঁপে দেয়। তারপর মন্দিরের একজন প্রধান পুরোহিত তাঁকে লালন-পালন করেন। 'সর্বশ্রেষ্ঠ সঙ্গীত আর নৃত্য-গুরু রায় রামানন্দ ওকে শিক্ষা দিয়েছেন ললিতকলা।' শম্পার এই সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। কিন্তু উপন্যাস-কাহিনীতে শিল্পী তাঁকে অসামান্যা করে তুলেছেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদে যাঁকে প্রথম দেখা গেল পরিচিত মন্দির-কক্ষে, ফুলে ফুলে সজ্জিত দেবতার ত্রিমূর্তির সামনে, পুষ্প-চন্দন-ধূপে সুরভিত সে স্থান দীপালোকে স্বর্গীয় মায়ালোক সৃষ্টি করেছে, তাঁকেই আবার শেষ পরিচ্ছেদে (তেইশ) দেখা গেল খ্রীস্টের দেবদাসী রূপে। প্রথম আবির্ভাবে শম্পা দেববধূ। তাঁর নিরাবরণ সৌন্দর্য নিরাভরণ নয়; বরং আনন্দঘনের মধুরারতিরই উপযোগী:

"বাঁশী আর বীণার তালে তালে পুজোর অর্ঘ্য নিয়ে প্রবেশ করল দেবদাসী।

গলায় ফুলের মালা, বাহুতে ফুলের কঙ্কন, পায়ে নূপুর। নির্মল শ্বেতপদ্মের মতো সুঠাম শুভ্র দেহে কোথাও কোনো আবরণ নেই। সংসারের সমস্ত লৌকিক লাজ-লজ্জাকে বিসর্জন দিয়ে দেবতার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে অনাবৃতাঙ্গী দেবদাসী। উজ্জ্বল আলোয় সুকুমার শরীরের প্রতিটি অংশ মায়ালোকের মতো একটা অবিশ্বাস্য সৌন্দর্যে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে।" [পাঁচ পরিঃ]

লৌকিক লাজ-লজ্জা শম্পার অপার্থিব রূপ ও সৌন্দর্যের নির্মোক জলবুদ্বুদের মতোই মিলিয়ে গেছে। অতঃপর সেই অরূপ পদ্মের দলগুলি একটি একটি করে মেলে দিয়েছে নৃত্যে ও সঙ্গীতে, রূপের আড়ালে অরূপ-বীণা বেজে উঠেছে। "দূরের সমুদ্র যেন সঙ্গীতের তরল তরঙ্গ হয়ে সব কিছু ভাসিয়ে নিয়ে গেছে; আর সেই সমুদ্রের শীর্ষে ধ্বনি-গন্ধের একটি সহস্রদল শুভ্র পদ্মের ওপর দেবদাসীর দেহ লীলায়িত হচ্ছে বিষ্ণু-মানসী উর্বশীর মতো।" [সাত পরিঃ]

এই শম্পা—দেবদাসী, দেববধূ। পার্থিব হয়েও অপার্থিব! রোমান্টিক সৌন্দর্যের মায়ায় ঘেরা। শম্পার চরিত্রটিও তাঁর রূপের রহস্যের মতোই। 'ধরি ধরি ধরিতে না পারি।' "রাজার হাতীর সামনে ধাক্কা খেয়ে ছিটকে পড়েছিল সে—অনুভব করেছিল দেবদাসী শম্পা কত দূরের তারা—কোন অ-ধরা দিগন্তের ইন্দ্রধনু। কাছে এসে মনে হ'ল—সামনে এক ছায়ামূর্তিকে দেখতে পাচ্ছে। ইন্দ্রধনু নয়—ইন্দ্রজাল।" [নয় পরিঃ] শঙ্খ দত্ত চাইলেন সেই অপ্রাপণীয়াকে। দেখতে চাইলেন দেববধূর আড়ালে মানবী-শম্পা বেঁচে আছে কিনা; দেবচরণে সমর্পিতা হয়েও, মর্ত্যের কামনা, বাসনা, জীবন-পিপাসা তাঁকে আকুল করে কিনা; পার্থিব জগতের মোহের কোন আকর্ষণ তাঁকে হাতছানি দেয় কিনা!

অবশেষে কিছুটা দুঃসাহসিকতায়, এবং কিছুটা বা, অদৃশ্য-শক্তির চালনায়, শঙ্খ মুখোমুখি হলেন শম্পার। দুই বিপরীত মেরু; দুজনের রুচি-শিক্ষা-প্রকৃতি ভিন্ন, ঘটনা ও পরিবেশ উভয়ের আচার ও আচরণকে ভিন্ন ভিন্নভাবে নিয়ন্ত্রিত করেছে। এ

সাক্ষাৎকার শঙ্খের তীব্র কামনা ও ইচ্ছাপ্রসূত হলেও, অভাবিত এবং অপ্রত্যাশিত। এতদ্‌ব্যতীত দেবদাসী হওয়ায় শম্পা অপ্রাপণীয়া। তাই শম্পার কক্ষে একাকী তাঁর সম্মুখে উপস্থিত হয়ে শঙ্খের মাথা ঘুরেছে, পা টলেছে, বুক কেঁপেছে। বিপরীত দিকে শম্পার কাছে এ সাক্ষাৎকার নিতান্তই বুঝি কৌতুককর; কিংবা দুরাকাঙ্ক্ষীকে সাবধান করে দেবার একটা অভিপ্রায়। দুর্বলতা যদি মনের কোণায় থেকেও থাকে, তবে তা বোঝার উপায় নেই। তাই শঙ্খের বিপরীতে শম্পার ব্যক্তিত্বটি হীরক-দীপ্তি লাভ করেছে। শঙ্খের জবানীতে এ ব্যক্তিত্বটিকে বিষধরের সঙ্গেও তুলনা করেছেন: "পাহাড়ের চূড়োর একটি ঘন কালো বেণী ফণা তুলল কাল অজগরের মতো।" [নয় পরিঃ] রূপের মায়ার আড়ালে এই অজগর-ব্যক্তিত্ব, বা হীরক-দীপ্তির সামনে অনেক বারই শ্রেষ্ঠী শঙ্খ দত্তের মাথা নত হয়ে গেছে: "কিন্তু লাল শাড়ী, নীল কাঁচুলী, আর দুটি কালো বেণীর দিকে শঙ্খ দত্ত আর চোখ তুলে চাইতে পারল না।" [নয় পরিঃ]

শম্পা জানিয়ে দিয়েছেন শঙ্খকে যে, তিনি মৃত্যুর ফাঁদে পা দিতে চলেছেন। অজ্ঞকে সাবধান করে দেওয়ার কর্তব্য বোধেই শঙ্খকে তিনি গোপনে ডেকে এনেছেন। ধীরে ধীরে সাহস সঞ্চয় করেছেন শঙ্খ দত্ত;—প্রয়োজন হলে তিনি দেবতার মুঠোর মধ্য থেকে তাঁকে ছিনিয়ে নিয়ে যাওয়ার দম্ভও করেছেন শঙ্খ। আর, শম্পার খর ব্যক্তিত্ব, কঠিন হাসির বিদ্রূপ ও উপহাস এবং শাণিত দৃষ্টি, তিল তিল করে পরিবর্তিত হয়েছে জীবনরসিক ঔপন্যাসিকের লেখনী কৌশলে। শম্পার তীক্ষ্নস্বরের হাসি মাঝপথেই 'একটা শান্ত করুণায়' থেমে গেছে কখনও, কখনও বা গলার স্বর গাঢ় হয়ে আসে: "লক্ষ্মী নয়—আপনার ভুল হচ্ছে। এ অলক্ষ্মী—এ ঝুটা মুক্তা।" এবং পরমুহূর্তেই উত্তর দিতে গিয়ে আর্তস্বরে তিনি বলে ওঠেন: "বণিক, আর নয়। আপনি ফিরে যান। এখনো সময় আছে। মৃত্যুকে নিয়ে খেলা করবারও সীমা আছে একটা।"—কাঞ্চনজঙ্ঘার শিরে যে বরফ চির-কঠিন, সূর্যের আলোয় যা ইন্দ্রধনুর বর্ণালি সৃষ্টি করে, তা কী ঈষৎ বিগলিত হ'ল? মনস্তাত্ত্বিকের মতো অতলচারী দৃষ্টি মেলে এবং নাট্যকার সুলভ চরিত্রের হাব-ভাব-আচরণের 'action' গুলির সাহায্যে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় শম্পার অন্তরের অন্তঃস্থলের সেই জাগতিক বাসনা ও সুখ-কামনার মানবী মূর্তিকে ক্ষণিকের জন্য মনের অবচেতন স্তর থেকে চেতন স্তরে তুলে এনেছেন। মনের নিভৃত কন্দরে লুকিয়ে-রাখা-শম্পার এই মানবিক দুর্বলতাটুকু শিল্পী নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় চতুর্দশ পরিচ্ছেদে সর্বসমক্ষে উপস্থিত করে দিয়েছেন:

"—দোষ তোমায় নয় শেঠ। অপরাধ আমারই।

লুব্ধ আর মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে ছিল শঙ্খ দত্ত। শুনছিল উদগ্র আগ্রহে।—দুর্বলতা এসেছিল আমারও। প্রাকারের পাশে ওইভাবে তোমাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে করুণা এসেছিল আমার মনে। হয়তো একটুখানি মোহও মিশে গিয়েছিল তার সঙ্গে। তাই তোমাকে আমি ডেকে এনেছিলাম অস্বীকার করেছিলাম বিধিবিধান, ভুলে গিয়েছিলাম আমি দেবতার বধূ। সীতার মতো সেইখানেই আমি গণ্ডী পার হয়েছি আর সেই

দুর্বলতার সুযোগে তুমি আমাকে কেড়ে এনেছো রাক্ষসের মতো!" —শম্পার এই স্বীকারোক্তিতে জোর পেয়েছেন শঙ্খ। ডাক দিয়েছেন তিনি শম্পাকে। শম্পারও দুচোখে লেগেছে ঘোর। রক্তে নেশা ছড়িয়েছে। একদিকে পাপ, নরক—আর একদিকে "কৃষ্ণচৈতন্যমীশ্বরম"! ঠিক করতে পারছেন না শম্পা কোন্‌টাকে আঁকড়ে ধরবেন! কিন্তু নেশা, আর মোহের ঘোর বেশীক্ষণ থাকে না। সকালের আলো এসে পড়লেই যেমন ভোরের কুয়াশাজাল ছিন্ন হয়ে যায়। তাই শঙ্খ যখন বলেন: "...আজ দেবতার কাছ থেকে আমি তোমাকে কেড়ে এনেছি। বীরকেই তুমি মালা দেবে শম্পা, সে দেবতাই হোক আর মানুষই হোক!" প্রত্যুত্তরে শম্পা তখন অকপটে স্বীকার করেন: "দেবতার চেয়ে মানুষের ওপর আমার লোভ বেশি, তা তুমি জানো বণিক। তাই এমনি ভাবে আমাকে তুমি চঞ্চল করে তুলতে চাইছ। যে মোহে একদিন তোমাকে ভেতরে ডেকে এনেছিলাম, তার রন্ধ্রপথে তুমি আনতে চাইছ বন্যাকে। কিন্তু সে আর হতে পারে না। জগন্নাথ আমার প্রভু, চৈতন্য আমার মন্ত্রদাতা, গুরু রামানন্দ আমার রক্ষাকবচ। বণিক, দোহাই তোমার, আমাকে দুর্বল করতে চেয়োনা। আমি মানুষ—আমার রক্ত মাংস আছে—একথা তুমিও ভোলো, আমাকেও ভুলতে দাও।...শম্পার চোখে জল এল।" [চোদ্দ পরিঃ]

ঔপন্যাসিকের দায়িত্ব শেষ। চরিত্রটিকে অলৌকিক ধর্মাদর্শের জগৎ থেকে মানবের মৌলিক জগতের চাওয়া-পাওয়ার, লোভ-মোহের আবর্তে ক্ষণিকের জন্য নামিয়ে এনে শিল্পী দেবীকে মানবী রূপ দিয়েছেন। শম্পা চরিত্রাঙ্কনে এইখানেই তাঁর সর্বাধিক কৃতিত্ব। লক্ষণীয় হ'ল, দেবদাসী শম্পার ভেতরের রক্ত মাংসের মানবীকে আবিষ্কার করতে গিয়ে শিল্পী দেবদাসীর ঐতিহ্যময় রূপটিকে বিকৃত, বা, কলঙ্কিত করেন নি। দেবদাসীর আদর্শে, ভক্তি-নিষ্ঠায়, দেবতার প্রতি প্রেমে শম্পা এক উজ্জ্বল ব্যক্তিত্বে শ্রীময়ী হয়ে উঠেছেন। শ্রীচৈতন্যদেবের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করে শঙ্খ যখন বলেন: "কে চৈতন্য? নবদ্বীপের ওই উন্মাদটা?" সেই মুহূর্তেই সকল দুর্বলতা কর্পূরের মতো যেন বাতাসে মিলিয়ে যায় শম্পার; পরিবর্তে ধর্মীয় সংস্কারটি উন্মুক্ত তরবারির মতো ঝিলিক দিয়ে ওঠে; "আর নয় শ্রেষ্ঠী, আর আপনাকে প্রশ্রয় দেওয়া যায় না। পুরীর রাজা স্বয়ং যাঁর পায়ে মাথা নীচু করেছেন, আমার গুরু রায় রামানন্দ যাঁর সেবক, তাঁর সম্পর্কে একটি নিন্দার কথাও আর শুনতে চাই না আপনার মুখ থেকে। আপনি একটা লুব্ধ হতভাগ্য—তার বেশী কিছুই নন। এবার আপনি যেতে পারেন শ্রেষ্ঠী—" [নয় পরিঃ] দৃপ্ত কণ্ঠ—কোন জড়তা নেই, মোহ নেই। বিত্তবান, দেশবিদেশে বাণিজ্য করা একজন বণিক একটি নারীর কাছে হতমান হয়ে যান। শঙ্খের মনে হয়—"রক্তমেঘ নয়, নীল পর্বতের চূড়া নয়—একটি আশ্চর্য সুন্দরীর স্বপ্ন নেই কোথাও। একটা হিংস্র বিদ্বেষ যেন ফণা তুলে দাঁড়িয়েছে সামনে।" [নয় পরিঃ]—এই প্রখর ব্যক্তিত্ব শিরোভূষণ মণির মতো জ্বল জ্বল করছে শম্পার ভক্তি ও বিশ্বাসে: "আমি দেববধূ। —গর্বিত ক্রোধে শম্পার সমস্ত শরীর দীপিত হয়ে উঠল: দেবতাই আমাকে রক্ষা করবেন।

আর রক্ষা করবেন চৈতন্য।" [চোদ্দ পরিঃ]—এইটিই প্রথা-সিদ্ধ দেবদাসী শম্পার চরিত্র। এরই লৌহবর্ম ভেদ করে ঔপন্যাসিক ক্ষণিকের জন্য হলেও, রক্ত-মাংসের নারীর হৃদয়ধর্মটিকে পাঠকের সামনে উদ্ঘাটিত করে নারী চরিত্রাঙ্কনেও তাঁর মনস্তাত্ত্বিকসুলভ দৃষ্টিভঙ্গী এবং শক্তিমত্তার পরিচয় দিয়েছেন।

॥ সুপর্ণা ॥

কিশোরী সুপর্ণার চরিত্রাঙ্কনেও নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের আধুনিক যুগের মনস্তত্ত্ব-সম্মত বিচার ও বিশ্লেষণ শিল্পরসোজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। মানব-মনের, বিশেষত কিশোরী মনের, গহন-গভীরে প্রেম-প্রীতি-ভালবাসার যে সুক্ষ্মাতিসুক্ষ্ম আবেগ অনুভূতির তন্ত্রীগুলি জটিল গ্রন্থিতে বাঁধা, সে-রহস্য উন্মোচনে শিল্পী মনস্তাত্ত্বিকের মতোই অনায়াস সাফল্য লাভ করেছেন। চাকারিয়ার বিত্তবান শ্রেষ্ঠী রাজশেখরের কন্যা সুপর্ণা। উজ্জ্বল দীর্ঘ শরীর, সুলক্ষণা ললাট—সুশ্রী। এই সুপর্ণাকে প্রথম প্রয়োজন হয়েছে একটি মিষ্টি কিন্তু করুণ-পরিণামী প্রেমের কাহিনী রচনা করার জন্য। ইতিহাস-কাহিনীর পাশাপাশি সমান্তরালধর্মী শঙ্খ-শম্পা-সুপর্ণার 'সাব-প্লটে'রও আবার 'সাব-প্লট' হিসেবে সুপর্ণা—গঞ্জালো—সোমদেব কাহিনী 'পদসঞ্চার' উপন্যাসের শিল্প-গঠনকে ব্যাপক, বিস্তৃত, ও জটিল রূপ দান করেছে। সুপর্ণা—গঞ্জালো প্রেম-কাহিনীর নায়িকা সুপর্ণা, মূল প্রেমকাহিনীতে (শঙ্খ—শম্পা—সুপর্ণার তৃতীয় বিন্দু হয়ে প্রেমের ত্রিভুজটি সম্পাদন করেছে। শঙ্খ—শম্পা—সুপর্ণার মূল প্রেমকাহিনীরও সুপর্ণাই নায়িকা ;—শম্পা তার উপনায়িকা। তবে, 'রাজসিংহ' উপন্যাসের চঞ্চলকুমারী নায়িকা হলেও, উপনায়িকা জেব-উন্নীসাই যেমন সর্বাপেক্ষা বলিষ্ঠ হয়ে উঠেছেন, এবং নায়িকাকে আচ্ছন্ন করে উপনায়িকাই তাঁর আসন অধিকার করে রেখেছেন ; তদ্রূপ 'পদসঞ্চার'-এও নায়িকা সুপর্ণা অপেক্ষা ব্যক্তিত্বে রূপে-সৌন্দর্যে, কৃপাণসদৃশ বাচন ভঙ্গিতে, হৃদয়ার্তি প্রকাশে, এবং কঠিনতম সংকটের মধ্যে পড়েও তাকে জীবনের সহজ নিশ্বাস-প্রশ্বাসের মতোই গ্রহণ করার অতুলনীয় ক্ষমতায় শম্পা অনেক, অনেক বেশী উজ্জ্বল ও প্রাণময় হয়ে উঠেছেন। এখানেও উপনায়িকা শম্পা, নায়িকা সুপর্ণাকে আচ্ছন্ন করে তার সিংহাসনটি নিজ অধিকারে রেখেছেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদে সুপর্ণাকে একবার পরিচয় করিয়ে দিয়ে ঔপন্যাসিক অতঃপর দশম পরিচ্ছেদে, এই কিশোরীকে মূল প্রেমের কাহিনীতে আনার আগে, একটি ছোট্ট ট্রাজিক প্রেমকাহিনীর নায়িকারূপে তাকে নিয়ে এসেছেন। কোন এক স্বর্ণোজ্জ্বল সকালে প্রাসাদের ছাতে দাঁড়িয়ে সুপর্ণা, প্রাসাদের আর এক প্রান্তে দাঁড়ানো পর্তুগীজ কিশোর গঞ্জালোকে সহসা আবিষ্কার করলো। "অদ্ভুত বেশবাস, সুন্দর কিশোরকান্তি। মাথায় চুল নয়—যেন একগুচ্ছ সোনা। কিশলয়ের মতো গায়ের রঙ।" প্রাসাদের অপর প্রান্তস্থিত ছাতে "রোদের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে সোনা দিয়ে গড়া মেয়ে"—তারই উদ্দেশ্যে আহ্বান জানাচ্ছে—**'O-L-A !'** বলছে 'সুপ্রভাত' (**Boz dias**)! পরদেশী এই

সুন্দরকান্তি তরুণের দিকে সুপর্ণা কিছুক্ষণ অবাক বিস্ময়ে চেয়ে থাকে।

এ বিস্ময়ান্বিত দৃষ্টি বিনিময় শেক্সপীয়রের ফার্দিনান্দ-মিরান্দার প্রথম সাক্ষাৎকারের প্রেম নয়, মিলটনের স্বর্গোদ্যানের নদীর দুই তীরে দাঁড়ানো আদম ও ঈভের প্রথম সাক্ষাতেই প্রেমের দৃষ্টি বিনিময়ও নয়; কিংবা, বঙ্কিমচন্দ্রের নির্জন সমুদ্র তীরে নবকুমার—কপালকুণ্ডলার বিস্ময়ের ঘোর-লাগা প্রথম সাক্ষাৎকারও নয়;—আধুনিক যুগের মনস্তাত্ত্বিকজ্ঞান-সম্পন্ন লেখক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের সুপর্ণা, গঞ্জালোকে দেখে প্রথমে বিস্মিত, এবং পরমুহূর্তেই দেখা দিল তার আকস্মিক ভীতি। "একটা আকস্মিক ভয়ে সুপর্ণা বিবর্ণ হয়ে গেল। পরক্ষণেই গঞ্জালো দেখতে পেলো ছাতের ওপরে কেউই নেই।" [দশ পরিঃ] পিতাকে জিজ্ঞেস করে তবে এই অপরিচিত বিদেশী সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হয়েছে সে। এরপর তার মনের কোণায় উঁকি দিল কৌতূহল। নিজেকে সে আর ধরে রাখতে পারল না। নিঝুম দুপুরে, যখন কেউ কোথাও নেই, চারিদিক স্তব্ধ, সেই সময় "দরজার গোড়ায় এসে দাঁড়িয়েছে সুপর্ণা। কৌতূহলের পীড়নে এই নির্জন দুপুরে চুপি চুপি দেখতে এসেছে অভিনব চেহারার এই বিদেশী মানুষটিকে।" [দশ পরিঃ]

এর পর একটি মাত্র পরিচ্ছেদে [তের] শিল্পী অতি দ্রুত অথচ মুক্তোর মতোই নিটোল, একটি কৌতূহল ও বিস্ময়, কিভাবে প্রেমের অঙ্কুরে পরিণত হল, এবং বিকাশের সন্ধি লগ্নেই ঘাতকের নিষ্ঠুর কুঠারাঘাতে বিনষ্ট হয়ে গেল,—তারই মর্মস্পর্শী ঘটনার নাটকীয় পরিস্থিতি রচনা করেছেন।

সুপর্ণা এসে দাঁড়িয়েছে গঞ্জালোর সামনে। তার 'চোখে বিশ্বাস, কৌতূহল, আর হৃদ্যতা।' পাকা ছোটগল্প রচয়িতার শিল্প-টেক্‌নিকে ব্যঞ্জনাধর্মী ভাষায় লেখনীর অল্প অল্প আঁচড়েই উভয়ের প্রেমের অঙ্কুর, আলোক-পিপাসু দুটি ছোট দল নিয়ে ঊর্ধ্বাকাশের দিকে চোখ মেললো: "সকালের আলোর মতোই উজ্জ্বল হাসি হাসল সে।" উচ্চারিত হ'ল: 'Tenho minha pequena'—'তুমি আমার বান্ধবী।' তুলির টানের মতোই ছোট ছোট আঁচড়ে একটি কিশোরীর সরল নিষ্পাপ মনের বঙ্গদেশীয় সহজাত ভীতি এবং জনশ্রুতি-জাত গড়ে তোলা, ভয়মিশ্র-ধারণা কাটিয়ে কৌতূহল, বিস্ময়, এবং ভালো লাগার মুগ্ধতা একটু একটু করে ফুলের পাপড়ির মতো বিকশিত হতে থাকে: "সুপর্ণাও হাসল। মুগ্ধ চোখে দেখতে লাগল এই বিদেশী কিশোরটিকে। ......নতুন পল্লবের রঙ্-মাখা এই মানুষটা যেন সোজা নেমে এসেছে আকাশ থেকে।" [তের পরিঃ]

গঞ্জালো তাকে অজানা ভাষায় 'তুমি আমার বান্ধবী'—বলছে! কিন্তু সে কী বলবে? সুপর্ণা বাঙলার জল-হাওয়া-মাটির মেয়ে। পরিচিত জনকে, প্রিয়জনকে আতিথেয়তায় আপ্যায়ন করার মধ্য দিয়েই অন্তরের প্রীতিটুকু সহজে ঢেলে দিতেই সে জানে। তাই সেও গঞ্জালোকে ফল-মিষ্টি এনে দিয়ে আপ্যায়ন করতে চায়।

দেখতে দেখতে একটা অদ্ভুত খেলার নেশার মতো কয়েকটা দিন কেটে যায়। মাতৃহারা

কিশোরী সুপর্ণার হৃদয়ের কোন্ গহন স্তরে যে গঙ্গালোর বেদী প্রতিষ্ঠিত হয়েছে কয়েকটা দিনেই, সে রহস্য কেউই জানে না। কিন্তু শিল্পীর গভীর মনস্তত্ত্বের জ্ঞানের আলোয় তা লুকোনো থাকে নি। মাকালীর চরণে গঙ্গালোর রক্তাপ্লুত ছিন্নমুণ্ড দেখে অস্ফুট চীৎকার করেই সুপর্ণা জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়েছে। যে নবজাগ্রত প্রেমের অমৃত বারি সুপর্ণার অন্তরের অন্তঃস্থলে একটি নতুন জীবনকে অঙ্কুরিত করেছিল গঙ্গালোর মৃত্যু আকস্মিকভাবে সেই জীবনমূলকেই ছিন্ন করে দিল। সুতরাং এই জ্ঞান হারানো সুপর্ণার মৃত্যুরই সামিল। তার জীবনের প্রথম অধ্যায় এখানেই সমাপ্ত।

সুপর্ণার দ্বিতীয় জীবন, বা জীবনের দ্বিতীয় অধ্যায়, প্রধানত পূর্ব অধ্যায়ের রচনার প্রতিক্রিয়ার রূপ। ঔপন্যাসিক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় মনস্তাত্ত্বিকের দৃষ্টিকোণ থেকে কিশোরীর কোমল মনে তার প্রথম প্রেমের ওপর এরূপ আকস্মিক, বীভৎস, ভয়ংকর এবং নিষ্ঠুর ঘটনার প্রতিক্রিয়া কত তীব্র হতে পারে, তারই মনস্তত্ত্ব-সম্মতরূপ ফুটিয়ে তুললেন, সুপর্ণাকে স্মৃতিভ্রংশ এবং বাক্‌শক্তি রহিত এক ধরনের মনোবিকলনের রুগীতে রূপান্তরিত করে। ফলে, সুপর্ণা পাঠকের গভীর বেদনা ও সহানুভূতি সৃষ্টি করলেও, নিজে মানসিক দুঃখ-যন্ত্রণার অতীত হয়ে রইল। জ্ঞান তার ফিরল—কিন্তু কার নিষ্ঠুর পাপের ফল কার ওপরে যে বিধাতার রোষ কীভাবে, কেন যে নেমে আসে সে ব্যাখ্যা কেউ দিতে পারে না। রাজশেখর মনে মনে অনুশোচনা করেন—তাঁরই পাপের ফলে কন্যার এই দুর্গতি। কিন্তু সে যাই হোক, শিল্পী, সুপর্ণার মনোবিকলনের বাস্তব কারণ পাঠকের সামনে ঘটনার মধ্য দিয়ে যেমন তুলে ধরেছেন, তেমনি মনস্তত্ত্বসম্মত উপায়েই আবার সুপর্ণার বাক্‌শক্তি ফিরিয়ে এনেছেন। এবং ফিরে এলেও যে আগের মতোই সুস্থ ও স্বাভাবিক হয়ে ওঠা সহজসাধ্য ব্যাপার নয়—এ বোধ তাঁর থাকায়, চরিত্রটি সম্পূর্ণ বাস্তবানুগ হয়ে উঠেছে। গঙ্গাসাগর তীর্থে জনৈকা রমণী গঙ্গায় সন্তান বিসর্জন দিয়েছিলেন। পরের দিন প্রত্যূষে জোয়ারের জল নেমে গেলে পঙ্কতটে সেই শিশুর ছিন্ন মুণ্ডের বীভৎস, ভয়ঙ্কর দৃশ্য, সহসা সুপর্ণার নিষ্ক্রিয় মস্তিষ্কের কোষে এমন একটি আঘাত হানে যে, মস্তিষ্কের যে স্নায়ুপথটি শুকিয়ে, বা, ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল **Law of association**-এর গুণে সেই স্নায়ুপথটি সহসা উদ্দীপিত হয়ে ওঠে, এবং সুপর্ণা তার বাক্‌শক্তি ফিরে পায় : চীৎকার করে ওঠে : "কী ও ! কী ওখানে ?"

ঔপন্যাসিক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় অতঃপর সুপর্ণাকে মূল প্রেমকাহিনীর ব্যর্থ, এবং দুঃখ-বেদনাহত নায়ক শঙ্খের সঙ্গে মিলিয়ে দিয়েছেন। দুটি চরিত্রই এখন প্রথম প্রেমের আবেগ-উচ্ছ্বাস-উদ্দীপনা বর্জিত। শঙ্খ যেন বিপদ-প্রাপ্ত নাবিক ; আর, সুপর্ণা ঝঞ্ঝা-বিধ্বস্ত এক পাখী। উভয়েরই মনের পর্দায় পীড়াদায়ক অতীতের প্রেতচ্ছায়া। বহির্মুখী পুরুষ শঙ্খ সুপর্ণাকে গ্রহণ করার জন্য যতটা নিজেকে প্রস্তুত করে নিতে পেরেছেন, অতীতের ক্ষতটাকে যতটা চাপা দিয়ে রাখতে পেরেছেন, সুপর্ণার অন্তর্মুখী নারী চরিত্রের পক্ষে শঙ্খের প্রেমে সেই ক্ষত ঢেকে রাখা ততটা সহজ নয়। 'সুপর্ণার ঘুম ভেঙেছে, কিন্তু আজো সে সম্পূর্ণ করে জেগে ওঠে নি। তার অস্বচ্ছ মনের

সামনে কী যেন—কে যেন ঘুরে বেড়ায়। সোনালি চুল, নীল চোখ, অপরিচিত তার ভাষা—

সে কি কখনো মুছে যাবে সুপর্ণার মন থেকে।" [তেইশ পরিঃ] শঙ্খের চিন্তার সূত্রে ঔপন্যাসিকের, সুপর্ণার মনের গভীরের এই বিশ্লেষণও মনস্তত্ত্বসম্মত। নারী হৃদয়ের জটিল রহস্যটি কেমন অনায়াস সাফল্যে তিনি উদ্ঘাটন করেছেন।

প্রশ্ন জাগে, তবে কি সুপর্ণা দ্বিচারিণী? বিশ্বাসহন্তা?—না। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় নারী হৃদয়ের রহস্যকে তাঁর স্বচ্ছ দৃষ্টির আলোয় সরল সত্যে উদ্ভাসিত করেছেন। অন্তর্মুখী নারী মনের পক্ষে একটি ক্ষত ভুলতে সময় লাগে। সন্তান স্নেহ তার হৃদয়ের সহজাত স্বতঃস্ফূর্ত সত্তা। সেই সন্তান স্নেহ, সুপর্ণার অন্তরে সহসা আবির্ভূত হয়েছে, তার গর্ভে সন্তানের আগমন সংবাদ জেনে। মুহূর্তে অন্তর পরিপ্লাবিত হয়ে গেছে সেই স্নেহে; এবং তখনই সন্তানের জনক, তার কাছে অতি আপনার, অতি প্রিয় শুধু নয়, তার স্বীয় সত্তার সঙ্গে মিলে মিশে একাকার হয়ে গেছে। সমস্ত সঙ্কোচ, সমস্ত লজ্জার বাঁধ ভেঙে সুপর্ণা শঙ্খকে জানিয়েছে: "আমাদের খোকা আসবে।" "বুঝতে পারছ না?……আমাদের। তোমার আর আমার।" [তেইশ পরিঃ] এইখানেই সুপর্ণা চরিত্র পূর্ণায়ত হয়ে উঠেছে।

মূল প্রেম কাহিনীর নায়ক শঙ্খ দত্ত; এবং নায়িকা সুপর্ণা। কারণ নায়কের জীবনকে শেষ পর্যন্ত একটি স্বার্থকতার লক্ষ্যে সুপর্ণাই পৌঁছে দিয়েছে।* শম্পা, শঙ্খ দত্তের জীবনে একটি গভীর রেখা, যে রেখা মুছে যাবার নয় কোনদিনই। নারী চরিত্র সম্পর্কে শিল্পীর গভীর জ্ঞানের পরিচয় এখানেও আর একবার উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। নারী শুধু অন্তর্মুখী নয়,—তার প্রেম সর্বদাই একমুখী। দ্বিচারিণীর কথা স্বতন্ত্র, নারী একবার যদি প্রিয়তম হিসেবে গ্রহণ করে পুরুষকে, তখন সেই প্রিয়তমই তার সমগ্র সত্তার সঙ্গে মিশে যায়। তাই সুপর্ণা দ্বিচারিণী নয়। শঙ্খকে যখন সে প্রিয়তমের সিংহাসনে বসিয়েছেন, তখন সব লাজ-লজ্জা সঙ্কোচ তার ভেসে গেছে। তখন জগৎ, তার আর শঙ্খের—তৃতীয় পুরুষের ছায়াও সেখানে আর পড়তে পারে না।

॥ **শম্পা ও সুপর্ণা** ॥

শম্পা ও সুপর্ণা নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের নারী চরিত্রাঙ্কনে দক্ষতার উজ্জ্বল স্বাক্ষর। নারী মনের দুর্জ্ঞেয় রহস্য, তার অনুভূতি-প্রবণতা তার আবেগ, তার ভক্তি-বিশ্বাস-নিষ্ঠতা, তার প্রেম-পূজা প্রভৃতি সম্পর্কে শিল্পীর জ্ঞানের পরিপক্কতাই শম্পা ও সুপর্ণাকে জীবনধর্মী করে তোলার চাবিকাঠি। 'পদসঞ্চার'-এর নারী চরিত্র দুটির কেউই সংসারের

* তোমার আর আমার মাঝখানে আর কেউ নেই—নেই কারো অস্তিত্ব কোনোখানে। যে ছিল, সে ছায়া হয়ে মিলিয়ে গেছে এখন। পথ খুঁজে না পেয়ে দু-দিকে চলেছিল দুটি স্রোত। এইবার একসঙ্গে মিলে একটি প্রাণস্রোতের দিকেই এগিয়ে চলেছে।" [তেইশ পরিঃ]

সাধারণ অতি পরিচিত নয়। শম্পা দেবদাসী, আর সুপর্ণার দুটি রূপ—একটি বিমুগ্ধা কিশোরীর এবং অপরটি অপ্রত্যাশিত আঘাতে মনোবিকলনের। তখন সে স্মৃতিভ্রষ্টা, বাক্‌শক্তিহারা। বাইরের জগতের রূপ-রস-সৌন্দর্য তার মনের পর্দায় কোন ছায়া ফেলতে পারে না—কোন আবেগ-অনুভূতির তরঙ্গ সৃষ্টি করতে পারে না। এরূপ চরিত্র বিরল-দৃষ্ট। শক্তিমান লেখক সুপর্ণার মনের এই বিশিষ্ট রূপ অবলীলাক্রমে অঙ্কন করেছেন। আবার তাকে যখন সংসারের স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে দিয়েছেন, তখনও কী নৈপুণ্য সহকারে মনস্তত্ত্ব-বিজ্ঞানের সূক্ষ্ম পথে পরিবর্তিত করে নারীর প্রেম-প্রীতির সংসারের স্বাভাবিক ক্ষেত্রে ফিরিয়ে দিয়েছেন, তখনও তাড়াহুড়ো করে উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য জীবনের ধীর স্বাভাবিক-রূপান্তরকে অস্বাভাবিক বা, বিকৃত করে ফেলেন নি। চরিত্রটি সৃষ্টি করার পিছনে শিল্পীর গভীর জীবনবোধ ছাড়াও অসীম ধৈর্য ও তীক্ষ্ন পর্যবেক্ষণ শক্তির পরিচয় নিহিত।

অপরদিকে শম্পা—দেবদাসী; আর এক বিরলদৃষ্ট চরিত্র। দেবদাসীদের কিছু কিছু ইতিবৃত্ত থাকলেও—তাকে শিল্পে রসোজ্জ্বল চরিত্রে রূপান্তরিত করার কৃতিত্ব খুব কম লেখকই দাবী করতে পারেন। দেবদাসী শম্পার চরিত্র সৃষ্টিতে নারায়ণ গঙ্গোপাপাধ্যায়ের ঔপন্যাসিক প্রতিভার স্বাক্ষর বিদ্যমান। মনে হয়, দেবদাসী শম্পা শিল্পীর মনোভূমিতে বেশ কিছুকাল ধরে লালিত-পালিত হচ্ছিলেন। ভাবছিলেন তিনি, দাসত্বের শৃঙ্খলে দেবতার কাছে যিনি বাঁধা, মর্ত্য-সংসারের কামনা-বাসনায় পীড়িত হলেও, জীবন-পিপাসা আকণ্ঠ ফেনায়িত হয়ে উঠলেও, সংস্কারের বন্ধন ছেড়ে বেরিয়ে আসার সাহস নেই বলেই কি মানুষের ধন দেবতা ছিনিয়ে নেবেন? এর প্রতিকার তো কিছু নেই। লেখকের মনে বিদ্রোহের ঢেউ আছড়ে পড়লেও—দেবদাসীর মনের সংস্কারের শৃঙ্খল ভাঙবে কে? নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'শিলালিপি' (জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৬) উপন্যাসে সম্ভবতঃ প্রথম দেখালেন দেবদাসীর সংস্কার-বলয় চূর্ণ করে বিপ্লবিনী সুতপাও বেরিয়ে আসতে পারলেন না। কোন্ শৈশবে তাঁকে নীলমাধবের চরণে তাঁর ঠাকুর্দা সমর্পণ করেছিলেন, পরে বড়ো হয়ে মর্ত্যের কাম-পিপাসায় জর্জরিত হয়েও সুতপা সংস্কারের বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারেন নি। রঞ্জনকে জ্বরতপ্তকণ্ঠে সুতপা বলেছেন: "একটা আশ্চর্য কাহিনী শোনো। তোমার হয়তো বিশ্বাস হবে না, কিন্তু আমার জীবনে এ কাহিনী সবচেয়ে ভয়ঙ্কর সত্য হয়ে আছে। আমার ঠাকুর্দা ছিলেন পরম বৈষ্ণব। শ্রীকৃষ্ণে সর্বস্ব নিবেদন করে তিনি ধন্য হতে চেয়েছিলেন। তাই ছেলেবেলায় আমাকেও তিনি নীলমাধবের পায়ে সঁপে দিয়েছেন। আমি দেবদাসী আমার বিয়ে করবার অধিকার নেই।" [পনের পরিঃ] এর প্রতিক্রিয়ায় রঞ্জনের চিন্তায় লেখকেরই ক্ষুব্ধ প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছে…"এ সত্যি নয়, এ স্বপ্ন। যেন হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেলেই সাবানের বুদ্বুদের মতো ভেঙে পড়বে এর রঙ।—সুতপার নিরাভরণ দীপ্ত দেহে তলোয়ারের ঝলক: তার চারদিকে আগ্নেয়বৃত্ত। বেণুদা—লোহায় গড়া নিষ্ঠুর মানুষ। ভালোবাসা আর সংস্কারের বেড়ায় বন্দিনী সুতপা, শপথ নিয়েছে

দাসত্বের শিকল ভাঙবার—অথচ যাকে ভালোবাসে সংস্কার ভেঙে তার কাছে এগিয়ে যাওয়ার জোর নেই তার—জোর নেই সুতপার।" [ঐ]

প্রেম-বারিধির তীরে দাঁড়িয়ে আকণ্ঠ পিপাসা নিয়ে দেবদাসী সুতপার আর্তনাদ নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের শিল্পীসত্তাকে শুধু ক্ষুব্ধ করে নি—দেবতারবিরুদ্ধে একটা বিদ্রোহও মাথা তুলেছিল। "মহানন্দা"-র নীতিশকে দিয়ে এর শোধ নিতে চেয়েছেন তিনি। পরাধীন দেশের জন্য ডাকাতি করতে গিয়ে তরুণ নীতিশের বারো বছরের কারাবাস ও দ্বীপান্তর হয়। কিশোরী বধূ মল্লিকাকে পিতা যতীশের কাছে রেখে চলে যান নীতিশ। দীর্ঘ বারো বছর বাদে ঘরে ফিরে এসে নীতিশ লক্ষ্য করলেন, তাঁর কিশোরী বধূ তখন পূর্ণ যৌবনা; তিনি শ্বশুরের নির্দেশে নিজেকে সোনার গৌরাঙ্গের চরণে সমর্পণ করে দেবদাসী হয়েছেন; অতএব তৃষ্ণায় নীতিশের সর্বশরীরে জ্বালা ধরলেও স্ত্রী মল্লিকার সঙ্গে একই বিছানায় শুয়ে যে দুস্তর ব্যবধান রচনা হয়ে গেছে তা তিনি আর ডিঙোতে পরেছেন কৈ? "ঘরের কোণে সোনার গৌরাঙ্গের সতর্ক প্রতিহারী-দৃষ্টি সারা দিনের উৎসব আর ভোগরাগের ভেতরে অলক্ষণীয়া এবং অপ্রাপ্যণীয়া দেবদাসী। একহাত ব্যবধানের ভেতরে সহস্র যোজনের দূরত্ব বিসারিত।" [নয় পরিঃ]

কিন্তু নীতিশের পৌরুষ ক্রমশঃ জেগেছে। রক্তের বিদ্রোহ মনে সঞ্চারিত হয়েছে। বাইরের সমাজে পরিবর্তন আনতে বিদ্রোহ করেও সুতপা-বেণুদা যে ক্ষুদ্র ব্যক্তি-সংস্কারকে ভাঙতে পারেন নি, নীতিশ সহসা ঠিক করলেন মানবেন না তিনি, দেবতার বাধা। "বাধা? সে বাধা মিথ্যে। তার ব্যক্তিত্বকে কেন সে দাঁড় করাতে পারে না ঋজু মেরুদণ্ডে, অধিকারের সুকঠিন নির্ভরতায়? দেবদাসী? কিসের দেবদাসী? তাকে ফিরিয়ে আনতে হবে জীবনে, ছিনিয়ে আনতে হবে রক্ত-মাংসের মানুষের সুনিশ্চিত বোঝাপড়ায়।" [নয় পরিঃ] এবং নীতিশ কেড়ে নিয়েছেন মল্লিকাকে দেবতার মুঠো থেকে: "বারো বছরের প্রতীক্ষার পরে একশো প্রদীপের আলোর মতো জ্বলে উঠল যৌবন। মহানন্দার মরা স্রোতে এল শ্রাবনী-সমুদ্রের জোয়ার কল্লোল। চিন্তা-কল্পনা বিতৃষ্ণা-বিস্বাদ বিলীন হয়ে গেল উত্তপ্ত মাদকতার মধ্যে। বাইরে শুকনো পাতায় টপটপ করে শিশির পড়ার শব্দ। আর অন্ধকারের ভেতরে জেগে রইল সোনার গৌরাঙ্গের চোখ—জ্বলতে লাগল কোন হিংস্র বনচরের ক্ষুধার্ত দৃষ্টির মতো।" [ঐ]

—দেবতার প্রতি যে রোষ ভাষায় ব্যক্ত হয়েছে, সে রোষ লেখকের ক্ষণিক উত্তেজনার। নীতিশ জোর করে মল্লিকাকে এক রাত্রির জন্য ছিনিয়ে নিলেও, নিজ অধিকার তার ওপর রাখতে পারেন নি।

দেবদাসী বিষয়ক প্রশ্ন, তর্ক, ক্ষোভ, রোষ ঔপন্যাসিকের 'পদসঞ্চার' উপন্যাস এসে একটা মীমাংসায় উপনীত হয়েছে মনে হয়। নীলমাধবের প্রতি ভক্তিবিশ্বাস শম্পার ক্ষণিকের জন্য টলে গেলেও, নিজেকে তিনি ফিরিয়ে এনেছেন দেবতার প্রতি প্রেম-ভক্তির কেন্দ্রে। শঙ্খের বর্বর পশুশক্তি প্রথমে তাঁর নিজের মনুষ্যত্বের কাছে ভেতরে ভেতরে দুর্বল হয়েছে, পরে শম্পার দৈবীশক্তির কাছে মাথা হেঁট করেছে। শম্পার চরিত্রটিও

এই দৈবীশক্তির আলোয় মহিমময়-সুন্দর হয়ে উঠেছে। তাঁর মানবিক দুর্বলতাটুকু চরিত্রটিকে নিছক আদর্শের ধ্রুবলোকে উন্নীত না করে ভক্তিমতী, ব্যক্তিত্বশালিনী এক অসামান্যা চরিত্রে পরিণত করেছে। শম্পা নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের সমগ্র সাহিত্যকর্মে অনন্যসাধারণ এক উজ্জ্বল চরিত্র।

॥ শঙ্খদত্ত ও রাজশেখর ॥

শঙ্খদত্ত মধ্যযুগের বাঙ্‌লার বণিক্‌সম্প্রদায়েরই একজন। পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দীর বাঙ্‌লা মঙ্গলকাব্যগুলির আসর জমজমাট হয়ে আছে সদাগরদের কাহিনীতে। বঙ্গের বাইরে নিকট ও দূর সমুদ্রে তাঁরা বাণিজ্যে বেরুতেন। সপ্তডিঙ্গা সাজিয়ে নিয়ে যেতেন : "শুকনো লঙ্কা, মোম, লাক্ষা, আদা, হলুদ, চট, কাজকরা তামা-পিতলের বাসন, ঢাকাই মস্‌লিন। চড়া দামে বিক্রী হবে কালিকট, কোচিন, আর গোয়ার বন্দরে। মাঝখানে রয়েছে বিচিত্র দেশ সিংহল—যেখানে আদার বদলে পাওয়া যায় মুক্তো, চটের বদলে হাতীর দাঁত···নিয়ে চলেছে পাটের কাপড়, গৌড়ের গুড়, ঢাকার শঙ্খবলয়, কস্তুরী, নিয়ে চলেছে সীমন্তিনীর সৌভাগ্য সিঁদুর, প্রচুর পরিমাণে আফিং আর নানা সুগন্ধি। জাহাজভরে পণ্য যাচ্ছে—জাহাজ ভরেই ফিরিয়ে আনবে ঐশ্বর্য।" [এক পরিঃ] বাঙলার স্বচ্ছল অর্থনৈতিক বনিয়াদটি গঠন করেছিলেন ধনপতি সদাগর, চাঁদসদাগরের মতো বণিককুল। 'পদসঞ্চার'-এ ধনদত্ত, শঙ্খ দত্ত, উদ্ধারণ দত্ত, রাজশেখর প্রভৃতি শ্রেষ্ঠী-বণিকের কথা আছে। এ উপন্যাসে শঙ্খ দত্ত কল্পিত উপন্যাস কাহিনীর নায়ক ; দেবদাসী শম্পা এবং সুপর্ণাকে নিয়ে শঙ্খ দত্তের প্রেমের কাহিনীটি ইতিহাস-কাহিনীর পাশাপাশি সমান্তরালভাবেই প্রবাহিত হয়ে গেছে। আবার মূল ইতিহাস-কাহিনীর সঙ্গেও তার একটি ক্ষীণ যোগ, বা স্পর্শ ঘটেছে—যখন দেখি সোমদেব তাঁকে এবং শ্রেষ্ঠী রাজশেখরকে নিয়ে বঙ্গে বিদেশী মুসলমান শাসনের বিরুদ্ধে একটি রাজনৈতিক চক্র গঠন করতে চেয়েছেন। তাই শঙ্খ চরিত্রটিরও দ্বিবিধ ভূমিকা : (১) ইতিহাস-কাহিনী বৃত্তটিকে শঙ্খ পরোক্ষভাবে স্পর্শ করে আছেন, প্রথমে সোমদেব, পরে গোলাম আলী, এবং আরও পরে কার্য-কারণসূত্রে পর্তুগীজদের সংস্পর্শে এসে (কোয়েলহো-ভ্যাসকন্‌সেলাস তাঁর বহর বিধ্বস্ত করেছে কামানের মুখে ; এবং দেশে ফিরে দেখেছেন ত্রিবেণী ও সপ্তগ্রামে পর্তুগীজ জাহাজ, মাল তোলাপড়া করছে, দেখেছেন বিদেশী জাহাজ থেকে কৃষ্ণাঙ্গ ক্রীশ্চান সন্ন্যাসী-সন্ন্যাসিনীদের নামতে)। (২) প্রথমে দেবদাসী শম্পা, এবং পরে শ্রেষ্ঠী রাজশেখরের কন্যা সুপর্ণার সঙ্গে শঙ্খের ব্যক্তি-জীবনের ধারাটি মিলে যে প্রেমের উপ-কাহিনী গঠিত হয়েছে—সেইটিই প্রধানতঃ 'পদসঞ্চার'-কে উপন্যাসের গৌরব দান করেছে।

গুরু সোমদেব শঙ্খকে দেশের রাজনৈতিক অবস্থার সঙ্গে জড়িত করতে চেয়েছেন। বিদেশী মুসলমান শাসনের অবসান ঘটিয়ে হিন্দুর রাজ্য গঠন করতে সোমদেব শঙ্খ-রাজশেখর প্রমুখ দেশের বিত্তশালী বণিক ও ভূস্বামীদের ঐক্যবদ্ধ করে একটা রাজনৈতিক

উত্থান চাইছিলেন। কিন্তু তাঁর সে আশা ও স্বপ্ন ব্যর্থ হয়ে যায়। তার অন্যতম কারণ,—শঙ্খ-রাজশেখরের মতো বিত্তশালী শ্রেষ্ঠী-বণিকগণ বিদেশী মুসলমান শাসনকে অপ্রীতির চোখে দেখেন নি। তাঁরা যথেষ্টই উদারপন্থী, এবং সঙ্কীর্ণ জাতি-সম্প্রদায়ের গণ্ডী অতিক্রম করে লেখকের উদার যুক্তির পথেই তাঁরা সোমদেবের আগ্রহ ও প্রচেষ্টাকে অযৌক্তিক ভাবাবেগ সর্বস্ব প্রমাণ করেছেন। তবে এদিক থেকে রাজশেখর যতটা উদার ও যুক্তিবাদী, শঙ্খ ততটা নন। মুসলমান শাসনের প্রতি শঙ্খের যে, শ্রদ্ধাবোধ ছিল, তা-ও নয়। বরং বলা যায়, শঙ্খ ছিলেন অনেকটাই আত্ম-তৃপ্ত, নির্বিরোধী। তাঁর কাছে মুসলমান ও ক্রীশ্চান-হার্মাদ দুই-ই বিদেশী, দুই-ই সমান। শঙ্খের দক্ষিণ পাটনে যাবার নাম শুনে, পিতা ধন দত্ত যখন তাঁকে সমুদ্রে হার্মাদদের হামলার কথা বলেন, তখন শঙ্খ নিস্পৃহ কণ্ঠে জবাব দেন : "কিন্তু সে সব মুসলমানদের বহরের ওপর। আমাদের কোনো ভাবনা নেই বাবা। আমাদের ওরা শত্রু নয়।" [এক পরিঃ] আরবী মুসলমান বণিক গোলাম আলী শঙ্খকে ক্রীশ্চান পর্তুগীজদের বঙ্গে আগমন প্রতিরোধ করার কথা জানালে, শঙ্খ প্রত্যুত্তরে বলেন : "তাতেই বা কী ক্ষতি? আপনারাও তো বিদেশী—আপনাদের ধর্মের সঙ্গেও আমাদের মিল নেই। সেজন্যে কোথাও কিছু তো আটকাচ্ছে না। আপনারা যেমন এখানে বাণিজ্য করেন ওরাও তাই করবে"……[পাঁচ পরিঃ] পরে গোলাম আলীরই কথার সূত্র ধরে শঙ্খ মনে মনে চিন্তা করেছেন গুরু সোমদেবের এই ভাবনার কথা : "হঠাৎ তার মনে পড়ে গেছে চন্দ্রনাথ মন্দিরের সেই পাগলা সন্ন্যাসী সোমদেবের কথা। খ্রীষ্টানেরা দেশ জয় করবে—মানুষের তাজা রক্তের ওপর দিয়ে পদসঞ্চার করবে গৌড়ের সিংহাসনের দিকে, তারপর সেখান থেকে গিয়ে পৌঁছুবে দিল্লীর শাহী-তখ্ত পর্যন্ত! কিন্তু হিন্দু বণিকদের কী আসে যায় তাতে? এ কাজ কি এর আগে কেউ করে নি? করে নি গোলাম আলীর স্বজাতি,—তারই আত্মজন? মুসলমানও তো এসেছে বিদেশ থেকেই!" [পাঁচ পরিঃ] লেখক চিন্তা ও মতপার্থক্যের একটা সূক্ষ্ম বিভাজনী রেখা সৃষ্টি করে শঙ্খ এবং রাজশেখর দুই প্রতিষ্ঠিত ধনী বণিকের মধ্যে একটা পার্থক্য স্পষ্ট করেছেন। প্রত্যেকটি চরিত্রই তাই স্ব-স্ব ভাববৃত্তে এবং ধ্যান-ধারণায় স্বতন্ত্র হয়ে উঠেছে।

রাজশেখর যেমন সোমদেবকে ধর্মপথের গুরু হিসাবে গ্রহণ করলেও তাঁর রাজনৈতিক মতবাদ, তথা হিন্দুর রাজ্য প্রতিষ্ঠার স্বপ্নকে প্রথম থেকেই যুক্তি-তর্কে অলীক প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করেছেন; শঙ্খ সেরূপ নন। গুরু সোমদেবের কথাগুলি সম্পূর্ণ বিশ্বাস না করলেও, কিছুটা তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা, আর কিছুটা দেশ-শাসন, বা, রাজনৈতিক চিন্তা-ভাবনা সম্পর্কে নিস্পৃহতা তাঁর চরিত্রে বড় হয়ে উঠেছে। বৈষ্ণবদের প্রতি গুরু সোমদেবের বিদ্বেষকেও যেমন সমর্থন করেন শঙ্খ, তেমনি গুরুর হিন্দুরাজ্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টাকেও মনে মনে খানিকটা মেনে নেন তিনি। আঠারো পরিচ্ছেদে রাজশেখর সোমদেবের হিন্দু রাজ্য প্রতিষ্ঠার স্বপ্নকে পাগলামো, 'আকাশ-কুসুম তৈরী' প্রভৃতি

বলে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করলে, শঙ্খ ক্ষীণ প্রতিবাদ করে বলেন : "আপনি সব জিনিসের খালি অন্ধকার দিকটাই দেখছেন কাকা।" গুরুর সমর্থনে রাজশেখরকে উপযুক্ত কিছু বলতে না পেরে শঙ্খের মানসিক অবস্থাটা : "একটা অবরুদ্ধ ক্রোধ বুকের মধ্যে বন্দী বুনো বেড়ালের মতো আঁচড়ে চলল। ঠিক এই মুহূর্তে রাজশেখরকে কোনো কঠিন কথা বলতে পারলে তৃপ্তি পেত সে—"

শঙ্খ—শম্পা—সুপর্ণাকে নিয়ে প্রেমের যে উপকাহিনীটি ইতিহাস কাহিনীর সঙ্গে সমান্তরাল গতিতে প্রবাহিত হয়ে গেছে, সপ্তগ্রামের বণিক শঙ্খ দত্ত তার নায়ক।

॥ শঙ্খ দত্ত ॥

কবি ভাবাপন্ন, রোমাণ্টিক প্রকৃতির শঙ্খ ধনী বণিক পুত্র হয়েও তাঁর সমবয়সী অন্যান্য বন্ধু-বান্ধবের মতো ভোগ-সম্পদ-নারী ও সংসারের উল্লাসকর জীবন-বৃত্তে চক্রমণ করাকে জীবনের চরম ও পরম পাওয়া বলে মনে করেন নি ; বরং এরূপ জীবনের প্রতি তাঁর গভীর বীতরাগ। তাঁর তরুণ রক্তে অজানা সমুদ্রের ডাক,—এ্যাডভেঞ্চারের নেশা, দুচোখে স্বপ্নের ঘোর, প্রকৃতি ও সৌন্দর্যের প্রতি টান। কখন কখন এই স্বপ্ন ও সৌন্দর্য 'নস্টালজিক' রূপে দেখা দেয়। তখন অকূল সাগর পার হয়ে যেতে যেতে ঘরের কথা, দেশের কথা মনে পড়ে শঙ্খের—"মনে পড়ে দুধের মতো সাদা সরস্বতীর জল : আর তার দুধারে কোমল ছায়া নেমেছে আম-জাম-বাঁশবনের। বাঁধা ঘাটের ওপরে সন্ত শিবের মন্দির—সোনার ত্রিশূল দেওয়া চূড়ো জ্বলছে রোদের আলোয়। তারপর সারি সারি নৌকার ভিড়ে গঙ্গা-সরস্বতীর জল দেখা যায় না—সপ্তগ্রাম, ত্রিবেণী। তার দেশ, তার ঘর।" [এক পরিঃ]

কবি-শিল্পী নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের রোমাণ্টিক প্রকৃতি শঙ্খের চরিত্রে সঞ্চারিত হয়ে গেছে। যিনি সাংসারিক ঝামেলা পছন্দ করেন না, সহজ প্রাপণীয়া রূপবতী নারী যাঁর মন টানে না, দূরাভিসারেই যাঁর আকর্ষণ সেই শঙ্খের কাছে রাজনৈতিক আবর্ত সোমদেব ও গোলাম আলীর জটিল-কুটিল চিন্তা বিরক্তিকর ; এ সব তুচ্ছ জিনিস তাঁকে আকৃষ্ট করতে পারে না। "শঙ্খ দত্তকে হাতছানি দেয় সমুদ্র, ডাক দেয় দক্ষিণ পাটন—দক্ষিণ ছাড়িয়ে আরো দূরে—আরো দুর্গম তার মনকে চঞ্চল করে তোলে।" [চার পরিঃ] বিয়ে করা মানেই স্ত্রী-পুত্র নিয়ে সংসারের বন্ধনে জড়িয়ে পড়া, তখন আর ছুটে বেড়াবার উৎসাহ থাকবে না। নারীর রূপ ও তনু মাদকতা হয়তো ক্ষণিকের মোহ ছড়িয়েছে তার মনে—কিন্তু ঐ পর্যন্তই। কাঁড়ারদের কণ্ঠে যখন গান শোনেন :

"ও সজনী
মরণকালে দেখি যেন
তোমারি মুখ, নয়নমণি—"

তখন তাঁর রোমাণ্টিক কবি মনে কোন অশরীরীর 'সম্ভব-অসম্ভব, বাস্তব-অবাস্তব মূর্তি ভাসতে' থাকে। মনে হয় "কে সে—কোথায় সে?"

এই রকম একটি স্বপ্নালু অভিযাত্রী মন নিয়ে শঙ্খ উপস্থিত হলেন পুরীধামে। পাণ্ডা উদ্ধবের আগ্রহে গভীর রাতে জগন্নাথ দেবের সামনে দেবদাসী শম্পার নিরাবরণ দেহের অধরা মাধুরী এবং ভাসমান শ্বেতপদ্মের মতো লীলায়িত ছন্দের নৃত্যে "একটি ফেন-বুদ্বুদের মতো আলোক তরঙ্গের চূড়ায় জেগে রইল শঙ্খ দত্তের চেতনা।" [সাত পরিঃ]

কিন্তু সুর-ছন্দ-নৃত্য থেমে যাবার পর, মন্দির থেকে পথে বেরিয়ে এসে শঙ্খের চেতনা থেকে অতীন্দ্রিয় অনুভূতির রোমাণ্টিক কল্পনা ধীরে ধীরে মুছে গেছে, পরিবর্তে স্থূল ইন্দ্রিগুলিই জ্বলে উঠেছে যেন সহস্র প্রদীপ শিখায়। ক্রমশঃ জৈবিক আকাঙ্খাগুলি শঙ্খকে তাড়িয়ে নিয়ে চলে দেবদাসী শম্পার সন্ধানে। ইচ্ছা শক্তির বলেই সাক্ষাৎও ঘটে দেবদাসীর নিভৃত কক্ষে। সব ভীরুতা, এবং জড়তা দূর করে শঙ্খ 'হৃত' শম্পাকে দেবতার মুঠো থেকে ছিনিয়ে নেওয়ার কথাও সদম্ভে ঘোষণা করে গেলেন। "দেবতার দাসী নেমে আসুক স্বর্গ থেকে। কিন্তু মানুষের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেবার কি অধিকার দেবতার? মানুষ তার ন্যায্য পাওনায় দেবতাকে ভাগ বসাতে দেবেন না। প্রতিবাদ জানাবে সে।" [নয় পরিঃ] প্রতিবাদ শুধু নয়, শম্পাকে তিনি জানিয়েছেন "দেওয়াল পার হয়েই আমি আসব" এবং ছিনিয়ে নিয়ে যাবেন মানুষেরই প্রাপ্যকে। শঙ্খ দত্ত নীতিশের পথই নিতে চেয়েছেন। নীতীশের সামনে কোন দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর ছিল না, কিন্তু শঙ্খের ক্ষেত্রে আছে সেই বাধার প্রাচীর। নীতীশের আসুরিক কামনা রাঘবের মূর্তিতে শঙ্খের সমস্যার সমাধান করে দিতে কোথা থেকে হাজির হ'ল। পরে শঙ্খ ভেবেছেন: "এক রকমের তান্ত্রিক-প্রক্রিয়া আছে—সেই অভিচারের নির্ভুল আচরণ করতে পারলে মানুষের মনের ভেতর থেকেই সৃষ্টি হতে পারে এক কল্প পুরুষ। একটা কবন্ধ দৈত্যের মতো মস্তিষ্কহীন হৃদয়হীন নিষ্ঠুর পশু সে—তার সাহায্যে যে-কোনো কূট ক্রূর কামনার নিরাকৃতি চলে। ওই রাঘবকেও তেমনিভাবে সৃষ্টি করেছিল সে। ও আর কেউ নয়—তারই বীভৎস বাসনার রূপমূর্তি!" [বারো পরিঃ] বলা বাহুল্য শঙ্খের এই আত্মবিশ্লেষণ—কৃতকর্মের অনুশোচনারই পূর্বাভাস! নীতীশের যে নৈতিক অধিকার ছিল শঙ্খের তা নেই। কিন্তু তার চেয়েও বড়ো করে দেখা দিয়েছে ঔপন্যাসিকের আদর্শবোধ—পশুশক্তি বনাম নৈতিক শক্তির। "এতদূরে কোথায় জগন্নাথের মন্দির—কোথায় উদ্ধত চূড়ো? কোথায় তার নিশীথ পলায়নের ওপরে দারুব্রহ্মের কঠিন চোখের ক্রূর দৃষ্টি? চৈতন্যের কীর্তনের সুর তো এখানে শোনা যায় না।" [চোদ্দ পরিঃ]

কিন্তু শঙ্খ এখন মনের আয়নায় নিজের ভেতরের মূর্তিটাও দেখছেন। বিবেকের ভ্রূকুটি দেখতে পাচ্ছেন তিনি। সংশয়ে, প্রশ্নে জর্জরিত হচ্ছে তাঁর অন্তর। কখনো ভাবছেন "দেবদাসীকে আবার যথা স্থানেই ফিরিয়ে দিয়ে আসেন। দুদিন তিনি শম্পার কাছ থেকে দূরেই পালিয়েছিলেন। প্রথম উত্তেজনার অবসাদ কেটে যেতেই মনে হয়েছে সে অশুচি। দেবতার নৈবেদ্যর কাছে এগিয়ে যাওয়ার সাহস কোথায় তার—স্পর্ধা কই?"

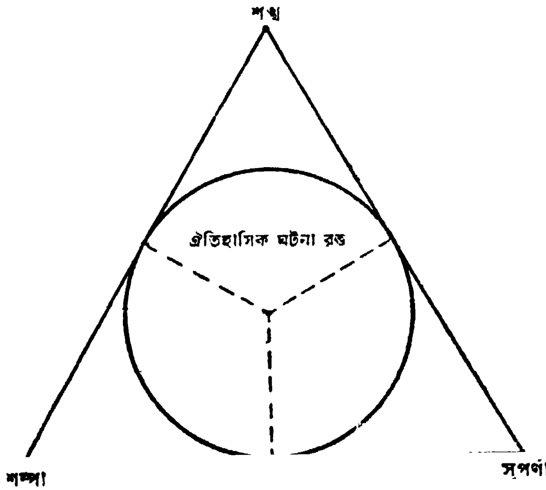
তবু শম্পার সামনে উপস্থিত হয়েছেন শঙ্খ বোঝাপড়ার আশায়। হয় নি বোঝ পড়া। শম্পা তাঁকে জানিয়ে দিয়েছেন : "আমাকে নিয়ে আসোনি—নিজের মৃত্যুকে এনেছ সঙ্গে।" প্রত্যুত্তরে ক্ষমাপ্রার্থী শঙ্খ বলেছেন, "দেবতার কাছে অনর্থক ফুরিয়ে যেতে দিইনি তোমাকে। জীবনের প্রয়োজনে উদ্ধার করে এনেছি।" দুরাশার মোহ একটু একটু করে আবার ঘিরেছে শঙ্খকে। দৃষ্টিতে তাঁর লোভ চিক্ চিক্ করে উঠেছে। কিন্তু পাষাণ প্রাচীর বেষ্টিত দেবদাসীর অন্তরে প্রবেশ করতে পারে নি সে দৃষ্টি—তিরস্কৃত হয়ে ফিরে এসেছে। কঠিন কণ্ঠে শম্পা জানিয়েছে, "যে কোনো বন্দরে, যে কোনো ঘাটে তুমি আমায় নামিয়ে দাও। আমি আমার দেবতার কাছে ফিরে যাব।" সে কথায় কর্ণপাত করেন নি শঙ্খ ; নীতিশই যেন শঙ্খের ওপর আর একবার ভর করতে চায় : "কৃষ্ণ! চৈতন্য! একবারের জন্যে নিজের দু কান দু হাতে চেপে ধরতে ইচ্ছা হল শঙ্খর! তারপরেই একটা ক্রুদ্ধ প্রতিদ্বন্দ্বিতার মতোই মনে হল, আচ্ছা দেখা যাক—চৈতন্যই তবে রক্ষা করুক শম্পাকে।" [ঐ]

কিন্তু এই দম্ভ-লোভের আরও গভীরতর স্তরে শঙ্খের মনুষ্যত্ব, আদর্শ, বিবেক একটা সংকোচ রূপে গুঁড়ি মেরে ছিল। তাই একটি মাত্র দরজার ব্যবধানে নৌকার মধ্যে শম্পা সম্পূর্ণ অরক্ষিত অবস্থায় থাকা সত্ত্বেও কুণ্ঠাকে জয় করতে পারেন নি তিনি। আত্মগ্লানির দহনও তাঁকে দুর্বল করে দিচ্ছিল। অবশেষে একদিন রাত্রে ভীরুতার জাল ছিন্ন করে শঙ্খ এসে দাঁড়ালেন শম্পার দরজার সামনে। হাতের মৃদু চাপেই দরজা খুলে গেল। দেবতার প্রতি গভীর বিশ্বাসে শঙ্খের ভেতরের পশুটাকে ভয় করেন নি শম্পা। দেববধূ নিজেকে সম্পূর্ণভাবেই তাঁর করুণার ভরসায় সমর্পণ করে, দরজা উন্মুক্ত রেখেই নিশ্চিন্ত মনে নিদ্রাচ্ছন্ন!—নীতিশের পশুটাকে জাগাবার চেষ্টা করলেন শঙ্খ : "মূর্খ নির্বোধ! কাকে ভয় পাও তুমি? কিসের আশঙ্কা তোমার? ছিনিয়ে আনবার সাহস যদি হয়ে থাকে, তবে এত কুণ্ঠা কেন আত্মসাৎ করতে?" [চোদ্দ পরিঃ] কিন্তু শঙ্খের সব দুঃসাহসই ভেতরের গুঁড়ি মেরে থাকা আদর্শ বুদ্ধিটার জন্যই ঠাণ্ডা হয়ে আসতে থাকে : "......কোন্ ভরসায় সে খুলে রেখেছে দরজা? তার ওপর বিশ্বাস? না, শম্পা আশা করে দেবতা তাকে পাহারা দেবেন, তার রক্ষা কবচ হয়ে থাকবে চৈতন্যের আশীর্বাদ—তার চারদিকে নিরাপদ গণ্ডি টেনে রেখেছেন রামানন্দ?" [ঐ]—এই দুর্বল মন নিয়েই শঙ্খ প্রবেশ করেছেন শম্পার কক্ষে ; এবং শম্পার শুভ্র বরণ দেহের সমস্ত রেখাগুলো অবারিত হয়ে আছে তার সামনে।" একদিন যে নগ্ন রূপ রক্তে আগুন ধরিয়ে দিয়েছিল, আজ নীতি ও আদর্শবোধের যাদুস্পর্শে তার সম্পূর্ণ বিপরীত প্রতিক্রিয়া ঘটল। "......এ কী হল তার? সাপের মাথার ওপর কোথা থেকে নেমে এল একটা মন্ত্রপড়া শিকড়?" [ঐ]

সুতপার জীবন-আর্তি ঔপন্যাসিককে যেভাবে ক্ষুব্ধ করেছিল, নীতীশের পৌরুষ শক্তি নিজ অধিকার বোধে সুতীক্ষ্ণ হয়ে দেবতার মুঠো থেকে কেড়ে নেওয়ার মধ্য দিয়ে ঔপন্যাসিক সেই ক্ষোভকে শান্ত করতে চাইলেন ; কিন্তু তাঁর ভেতরের আদর্শবোধে

সম্ভবতঃ তা আঘাত করেছিল। তাই 'পদসঞ্চার'-এ তৃতীয়বার সেই দেবদাসী প্রসঙ্গের অবতারণা করে নায়ক শঙ্খ দত্তের মধ্যে নীতীশের পশুশক্তিটাকে জাগিয়ে তারপর নৈতিকতার বজ্রে তাকে ধরাশায়ী করলেন। পুরুষের ভেতরের বর্বর পশুটাকে তিনি সহ্য করতে পারছিলেন না। শম্পার দৈব-বিশ্বাস জয়ী হ'ল—তথা লেখকের নৈতিকতারই জয় ঘোষিত হ'ল ; এবং এইরূপ মীমাংসায় শিল্পকে (art) তিনি নীতি-আদর্শ-ও সৌন্দর্যের উচ্চ বেদিতে প্রতিষ্ঠিত করলেন !

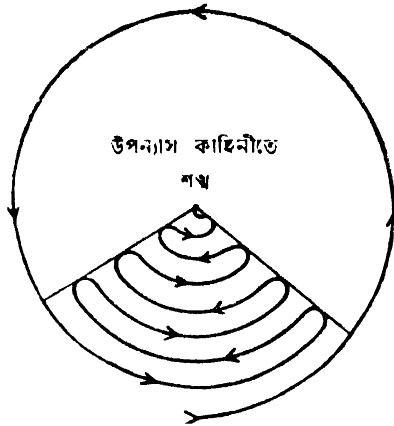
শঙ্খের চরিত্রটি এই উপন্যাসে দ্বিবিধভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। দুটি চিত্রের সাহায্যে এই চরিত্রটির অবস্থান ও প্রকৃতি বোঝাবার চেষ্টা করব আমরা।



১নং চিত্র : শঙ্খ, শম্পা ও সুপর্ণা
ইতিহাস কাহিনীকে স্পর্শ মাত্র করে আছে।

১নং চিত্রে দেখানো হয়েছে 'পদসঞ্চার'-এর ঐতিহাসিক কাহিনী ও ঘটনা বৃত্তের সঙ্গে শঙ্খ দত্ত, শম্পা, এবং সুপর্ণার যোগ খুবই ক্ষীণ—তারা কার্য-কারণ সূত্রে কাহিনীটিকে স্পর্শ করে আছে মাত্র, ইতিহাসের ঘটনা-কাহিনীকে প্রভাবিত করতে পারে নি। পরের পাতায় ২নং চিত্রে, উপন্যাসের কাল্পনিক ঘটনা-কাহিনীতে শঙ্খ চরিত্রটির দুটি রূপ প্রতিভাত : চরিত্রটি বৃত্তায়ত—(১) অংশতঃ ঘটনাস্রোতে ভাসমান, রোমাণ্টিক কল্পনা-প্রবণ। এখানে অন্তর্মুখী চিন্তা-ভাবনার চাপ নেই, বাইরের সংঘাত থাকলেও অন্তর্দ্বন্দ্বের অভাবে অগভীর। বৃত্তের পরিধি রেখায় চরিত্রটির গতি। (২) বৃত্তের অপর অংশে শঙ্খ চরিত্রের অন্তর্দ্বন্দ্ব তাঁকে কি ভাবে পাকে পাকে কেন্দ্রাভিমুখে টেনে নিয়ে গেছে সেইটি দেখাবার চেষ্টা করা হয়েছে।

শম্পা, শঙ্খের অন্তরে গভীর একটি ক্ষত সৃষ্টি করে দিয়ে যান। তবে সেই সঙ্গে, শঙ্খের ভাসমান, অভিযাত্রী, রোমান্টিক মনকে সংসার বন্ধনে ধরা দেবার একটি আকাঙ্ক্ষাও বুঝি জাগিয়ে দিয়ে যায়। সুপর্ণাকে গ্রহণ করতে তাই তাঁর মনে বিশেষ কোন অনীহা প্রকাশ পায় না। চার বছর সুপর্ণা কথা বলে নি—সে পাগল ; এ কথা শুনে শঙ্খ হঠাৎই বলে ফেলেন : "আমি ওকে কথা বলাব কাকা—আমি ওকে ফিরিয়ে আনব।" [আঠার পরিঃ] প্রকারান্তরে সুপর্ণার দায়িত্বভারই শঙ্খ স্বেচ্ছায় তুলে নিয়েছেন।



২নং চিত্র—শঙ্খের চরিত্র অংশতঃ
ঘটনাস্রোতে ভাসমান, অংশতঃ অন্তর্মুখী।

কেন ? শঙ্খ তার কারণ অনুসন্ধান করে পেয়েছেন—শম্পার মতো সুপর্ণাও দেবতার শিকার। সেই দেবতার কাছে বারে বারে শঙ্খ কিছুতেই হার মানবেন না। এ যেন দৈব এবং পুরুষকারের দ্বন্দ্ব। সুপর্ণার ক্ষেত্রে শঙ্খের এরূপ যুক্তি খুব জোরালো বলে মনে হয় না। দৈবকে চ্যালেঞ্জ করার মতো পুরুষকার যদি শঙ্খের থাকতো, তাহলে সমুদ্রগর্ভে তাঁর বহর ডুবে যাবার চার বছর পর তাঁকে উপন্যাস-কাহিনীতে আবার যখন ফিরে আসতে দেখি, তখন তাঁর মনে প্রায়শ্চিত্ত চিন্তাটা আসে কেন ? "এই প্রায় চারটি বছর ধরে একটি মাত্র কথাই ভেবেছে শঙ্খ দত্ত। জগন্নাথের দাসীকে চুরি করে এনেছিল সে—তাই এমনি করে দেবতার অভিসম্পাত নেমে এসেছে তার ওপর। কারো দোষ নেই—কেউ-ই দায়ী নয়। এ-দণ্ড তার প্রাপ্য ছিল—নিজের বিকৃত কামনার মাশুলই তাকে মিটিয়ে দিতে হয়েছে কড়ায়-গণ্ডায় ; নীলমাধব তাঁর দিগন্ত-নীল বুক পেতে দিয়ে গ্রহণ করেছেন বধূকে —মর্ত্যের কোনো আবিল দৃষ্টি সেখানে গিয়ে কখনো পৌঁছবে না।" [আঠার পরিঃ] কুড়ি পরিচ্ছেদেও শঙ্খের আবার প্রায়শ্চিত্ত চিন্তা দেখা দিয়েছে।—এই অন্যায় ও পাপ বোধই যদি শঙ্খের এসে থাকে, তারপর সুপর্ণাকে গ্রহণ করার যুক্তি অন্য যা কিছুই

হোক, দেবতার বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ হিসাবে তাকে মেনে নেওয়া মুস্কিল। অন্যত্র, লেখক শঙ্খের জন্য এরূপ যুক্তিও দেবার চেষ্টা করেছেন : "শুধু শম্পা নয়—সুপর্ণাও সুন্দর। ধরা-ছোঁয়ার বাইরে চলে গেছে বলেই সে আরো বেশি অপরূপ। দুর্লভের জন্যেই তো শঙ্খ দত্তের চিরদিনের আকর্ষণ।" [কুড়ি পরিঃ] আসলে শম্পা, শঙ্খের শিরায়-শিরায় উম্মত্ত কামনার জ্বালা ও মাদকতা বিষক্রিয়ার মতো ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। তাঁর যৌবন-ধর্ম তাকে অস্বীকার করতে পারে নি। সুপর্ণাকে দেখে সে উদ্দীপনা, সে বান ডাকা-জোয়ার শঙ্খের ছিল না। এ যেন একটা শূন্যতাকে ঢাকা দেবার চেষ্টা, একটা অতৃপ্তিকে মেটাবার চেষ্টা। শঙ্খের জীবনে লেখকের ব্যক্তিগত জীবনের উপচ্ছায়া আছে কিনা গবেষকগণ ভাববেন ; আমরা বলব সুপর্ণা ও শঙ্খের চরিত্রকে পূর্ণতা দিতেই, এবং শিল্প-কাহিনীর খাতিরে, ঔপন্যাসিক দুটি অতৃপ্ত, অ-সুখী জীবনকে শূন্যতায় হারিয়ে যেতে না দিয়ে, সফল করে তুলতে চেয়েছেন। কামনা-মদিরার যে বিষামৃতের পাত্রটি শঙ্খ ওষ্ঠে তুলতে চেয়েছিলেন, মাঝপথেই তা ভেঙে যাওয়ায়, বিপরীত প্রতিক্রিয়ায় একটি সংসার বন্ধনে ধরা দিলেন। কিন্তু ভেতরের ক্ষতটা রয়েই গেল। তাই আসন্ন মাতৃত্বের গৌরবে সুপর্ণার মন থেকে যখন অতীত প্রেমের প্রেতছায়াটা অপসারিত হ'ল এবং সুপর্ণা নিজেকে শঙ্খের কছে পরিপূর্ণরূপে ধরা দিল, তখনও শঙ্খ তাঁর অতীতকে ভুলতে পারেন নি : "তার [সুপর্ণার] অন্ধকার চুলের বিশৃঙ্খল রাশির দিকে তাকিয়ে সে ভাবতে লাগল : এইবারে শম্পাকেও সে ভুলতে পারবে তো ?" [তেইশ পরিঃ]—মণিমোহনও (উপনিবেশ) প্রায় একইভাবে মা-ফুনের বিষামৃত পানের স্মৃতিটা মিথ্যা ভোলবার চেষ্টায় রাণী এবং পুত্র খোকাকে দেখে সান্ত্বনা পেতে চেয়েছিলেন ; সামাজিক সম্মানের দিকে তাকিয়েই বোধ হয়।

এ হ'ল কবি হৃদয়ের চির-অতৃপ্তি। নায়ক শঙ্খের মধ্যে লেখকের কবি-ব্যক্তিত্ব একাত্ম হয়েই এই চির-অতৃপ্তির ক্রন্দন ধ্বনিত হয়েছে। কবি-কল্পনায়, বৃহৎ পৃথিবীকে, এবং অজানাকে জানার আগ্রহে, জীবন তৃষ্ণায় এবং ব্যক্তিত্বের প্রকাশে উপন্যাস কাহিনীকে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত বহন করে নিয়ে গেছেন বলেই শঙ্খ দত্ত এই কাহিনীর নায়ক। কাহিনীর সূচনায় শঙ্খকে আমরা দেখি রোমান্টিক কবিভাবাপন্ন, বিনয়ী, পিতৃভক্ত, এক উদার যুবক হিসেবে। বৃহত্তর জগৎ ও জীবনকে তাঁর দেখার আগ্রহ, সংসারের মায়া-মোহের ক্ষুদ্র গণ্ডির প্রতি তাঁর বিতৃষ্ণা। অতঃপর দুর্লভ দেবদাসীর রূপ ও যৌবন, একই সঙ্গে শঙ্খের পৌরুষ এবং স্বপ্নালু যৌবনকে আগুনের শিখার মতো জ্বালিয়ে তুলল। দেবতার হাত থেকে ছিনিয়ে নিতে চাইলেন তিনি, মানুষের প্রাপ্যকে। নায়কোচিত শৌর্যে শঙ্খ নিজেকে বিশিষ্ট করে নিলেন। তীব্র কামনা এবং যৌবনের অহঙ্কার ও বিদ্রোহ, তাঁকে পুরুষের আদিম প্রবৃত্তি—'বীর ভোগ্যা বসুন্ধরা'—এই নীতিতে চালিত করল। শম্পাকে তিনি হরণ করিয়ে আনলেন। এ পর্যন্ত তীব্র ঘটনা প্রবাহ শঙ্খ চরিত্রটিকে আপন গতিতে টেনে নিয়ে গেছে। এ পর্যন্ত চরিত্রের বিকাশ বহির্মুখী (ঘটনা-বৃত্তের পরিধি পথেই তাঁর গতি)। এরপর ধীরে ধীরে চরিত্রটিকে

ঔপন্যাসিক অন্তর্মুখী করে তুলেছেন। কৃতকর্মের ভাল-মন্দ বিচার ও ন্যায়-অন্যায় বোধ ফুটে উঠতে শুরু করেছে যৌবনের উত্তেজনা প্রশমিত হয়ে। কিন্তু জাগ্রত যৌবনের দম্ভ ও রূপের নেশা এত সহজে মাথা নীচু করে না। শ্রীচৈতন্যের প্রতি শম্পার ভক্তি ও বিশ্বাস যদি বৈষ্ণবোচিত বিনয়ে ও সহিষ্ণুতায় বিগলিত হোত, তাহলে ফল কী দাঁড়াত জানি না, কিন্তু ঔপন্যাসিক শম্পার চরিত্রে একদিকে মানবিক দুর্বলতা, এবং অন্যদিকে দৈবী ক্ষমতার দর্প ওতোপ্রোতভাবে মিশ্রিত করে যে ব্যক্তিত্বটি দাঁড় করিয়েছেন শঙ্খের বিপরীতে, তা দেববিদ্রোহী শঙ্খকেও তেজদৃপ্ত করেছে। এতদ্‌সত্ত্বেও শঙ্খকে তিনি বিবেকহীন, মনুষ্যত্বহীন করে তোলেন নি। তাঁর ভেতরে রয়েছে উদার, কবিভাবাপন্ন, রুচিবান অভিমানী হৃদয়। সেই উদার রুচিসম্পন্ন মনুষ্যত্বই তাঁকে বাধা দিল। হাতের মুঠোর মধ্যে পেয়েও অবক্ষয়িত শম্পাকে তিনি স্পর্শমাত্র করতে পারলেন না। দারু-ব্রহ্ম শম্পাকে হয়ত শঙ্খের লোভের গ্রাস থেকে রক্ষা করেছিলেন, কিন্তু ঔপন্যাসিক শঙ্খ চরিত্রের অন্তর্দ্বন্দ্বটিকে যেভাবে শিল্পিত করেছেন, তাতে মনে হয়, শঙ্খের মনুষ্যত্ব, তাঁর গুপ্ত ধর্মবোধই শম্পাকে রক্ষা করেছিল—লোভী, কামমুগ্ধ শঙ্খের হাত থেকে।

এরপর নিয়তি নির্দেশিত পথে শঙ্খ ভেসে গেছেন। অন্তর্দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত হয়েছেন। কিন্তু জীবনরসিক শিল্পী, শঙ্খকে ব্যর্থ হতাশায় ও শূন্যতায় ডুবে যেতে দেন নি। যেন অলক্ষ্যে বসে শঙ্খের ভাগ্যবিধাতা তাঁকে মিলিয়ে দিলেন আর একটি প্রণয়-ব্যর্থ শূন্যোতাময় চরিত্র, সুপর্ণার সঙ্গে। লক্ষণীয়, শঙ্খের চরিত্র এখন ভাগ্য, বা নিয়তি-নির্দেশিত পথে এগিয়ে চলল। তথাপি শিল্পী তাঁর মানসিক পরিবর্তন এবং হৃদয়-স্পন্দের সুনিপুণ পরিস্ফুটনে চরিত্রটিকে পরিবর্তনশীল এবং প্রাণবন্ত করে তুলেছেন।

॥ **নায়ক বিচার** ॥

এখন প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক, শঙ্খ উপ-কাহিনীর (মূল প্রেম-কাহিনী) নায়ক হলেও সমগ্র কাহিনীকে নেতৃত্ব দিতে পেরেছেন কি তিনি ? অর্থাৎ শঙ্খ কি 'পদসঞ্চার' উপন্যাসের নায়ক ? উপন্যাসের শিল্পরূপ দানের আলোচনা প্রসঙ্গে **Dianne Doubtfire** বলে-ছিলেন : উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র ['**central figure**'] কে ? যাঁর গল্প, অর্থাৎ যাঁকে নিয়ে গল্প তিনিই কেন্দ্রীয় চরিত্র ; এই চরিত্রের প্রতি লেখকের সহানুভূতি থাকে বলেই, তাঁর কর্তব্য হ'ল—'**to engage the reader and make him care what happens**।'* 'পদসঞ্চার' কি—শঙ্খ দত্তের কাহিনী ? ডি মেলো, অথবা মামুদ শার কাহিনী ? 'পদসঞ্চার' কোন ব্যক্তি চরিত্রের কাহিনীই নয়। এটি ঐতিহাসিক উপন্যাস—

* "You will have decided who is to be your central figure, the one whose story it is. You are in sympathy with this character......and your task is to engage the reader and make him care what happens." ["The Craft of Novel-writing"]

তাই একটি বিশেষ যুগের ইতিহাস-কাহিনী এর মুখ্য বিষয়। আবার, একটি বিশেষ যুগকে অবলম্বন করলেও ঔপন্যাসিক সেই বিশেষ যুগ বা কালকে তার পূর্ববর্তী অতীত থেকে তার পরবর্তী অনাগত ভবিষ্যৎ পর্যন্ত এক মহাকালের কোলে স্থাপন করেছেন। ঐতিহাসিক উপন্যাসের এই মহাকালের অপর নাম, বিধাতা পুরুষ। চরিত্রই তো শুধু ইতিহাসের স্রষ্টা নয়, ইতিহাসও চরিত্র সৃষ্টি করে।

আপাতদৃষ্টিতে ঐতিহাসিক কাহিনীর নায়ক ডি মেলোকেই মনে হয়। কারণ, বঙ্গে পর্তুগীজ জাতির বাণিজ্যকুঠী নির্মাণ, ও দুর্গ প্রতিষ্ঠা সমেত এদেশের সঙ্গে ঐতিহাসিক বাণিজ্য চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছেন তিনিই। বঙ্গে ইয়োরোপীয় জাতির পদসঞ্চার ঘটল। এর জন্য ডি মেলোকে ব্যক্তিগত ক্ষয়-ক্ষতি বড় কম স্বীকার করতে হয় নি। অনেক ঝড়-ঝাপটা সহ্য করতে হয়েছিল। তিক্ত অভিজ্ঞতাও তাঁর হয়েছিল যথেষ্টই। তথাপি, বঙ্গে ক্রীশ্চান পর্তুগীজদের পদসঞ্চার একদিনের ঘটনা নয়, একজনের কাহিনীও নয়। ভাস্কো-ডা-গামা একদিন যে স্বপ্ন দেখেছিলেন, কোভিলহো-আলমিডা থেকে ডি মেলো-কোয়েলহো-সাম্পায়ো পর্যন্ত সকলেই সেই স্বপ্নের পথটিকে বাস্তবে রূপদান করতে নিজ নিজ অমূল্য জীবন তুচ্ছ করেছেন। কাজেই ডি মেলো এই ইতিহাসের স্রষ্টা নন, ইতিহাসই উপযুক্ত কালে ডি মেলোকে বরণ করে নিয়েছে এই মহাগৌরবের পদে।

মামুদ শা তো বঙ্গের ইতিহাসের একটি খণ্ড যুগের শেষ প্রতিনিধি—একটি শাসন ব্যবস্থার সলিল সমাধি ঘটে তাঁর মৃত্যুতে। ভাঙনের চরে বসে বেলাশেষের গান গেয়ে গেছেন তিনি। সমগ্র কাহিনীকে নেতৃত্ব দেওয়ার মতো ক্ষমতা ও আয়ু কোনটাই তাঁর ছিল না। তিনিও কালের হাতের ক্রীড়নক। একদিকে দিল্লীর বাদশাহ হুমায়ুন, অপরদিকে নবাগত ক্রীশ্চান সভ্যতা ও শক্তি, মাঝখানে ত্রাস-সঞ্চারী শের খাঁ বঙ্গের ইতিহাসের ধারাটিকে নতুন খাতে প্রবাহিত করতে সমুদ্যত। বঙ্গের, বৃহত্তর দৃষ্টি-কোণ থেকে ভারতের ভাগ্যবিধাতা সেই দুর্যোগে কালের খরস্রোত কাটিয়ে ইতিহাসের তরণীটিকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন। মামুদের ওপর পড়েছে তাঁর কোপ দৃষ্টি ; শের খাঁকে দিয়েছেন তিনি অমিত পরাক্রম ও সুযোগ : আর ডি মেলোর দিকে চেয়েছেন প্রসন্ন হাসিতে। তাই খোদাবক্স খাঁর কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে যে ডি মেলো তিক্ত, জর্জরিত মন নিয়ে ফিরে গিয়েছিলেন গোয়ায় ; বিধাতা পুরুষের বরাভয় হাসিতে, মহাকালের অলঙ্ঘ্য নির্দেশে সেই ডি মেলোকে আবার চার বছর পরে ডি-কুনহার আদেশে ফিরে আসতে হ'ল চট্টগ্রামে। "তাঁর দেহ-মন আর্ত হয়ে বলতে চাইছে : **Estou Cansado** • ক্লান্ত—আমি ক্লান্ত!" কিন্তু উপায় নেই। ভাগ্য বিধাতা যে সম্মান-পুরস্কার তাঁর জন্য তুলে রেখেছেন, সে কি অন্যে পেতে পারে? শের খাঁ, বা পরবর্তীকালে মোঘল শক্তি বঙ্গ অধিকার করে নিলেও আরও দূর ভবিষ্যতে ক্রীশ্চানরাই তাঁদের প্রতাপ বিছিয়ে দিয়েছিলেন, শুধু বঙ্গে নয়, সারা ভারতবর্ষে, এমন কি দূর-প্রাচ্যেও। সে ইঙ্গিতও আছে 'পদসঞ্চার'-এ। "ইতিহাসের ঢেউ উঠেছে, ইতিহাসের ঢেউ ভেঙেছে। চট্টগ্রাম—গৌড়।

হুমায়ুন, শের শা, মামুদ শা, সাম্পায়ো,—শক্তি আর কূটতার পাশা খেলা। দিল্লীর মসনদের ওপর ঝুঁকে পড়েছে বিহারের বাঘের উদ্যত থাবা। প্রাণভয়ে প্রহর গুণছেন হুমায়ুন। চূড়ান্ত লজ্জায় আর অপমানে নিজের প্রাণ দিয়ে ফিরোজ শার রক্তের ঋণ শোধ করেছেন অভিশপ্ত আবদুল বদর।

"আর তার মধ্যে একটু একটু করে ভিত পাকা হয়েছে পশ্চিমের বাণিজ্য বাহিনীর। মালদ্বীপ থেকে সিংহল, সিংহল থেকে কালিকট, গোয়া, তারপরে বঙ্গোপসাগর। 'বেঙ্গালা'। ভারতের স্বর্গ। পোর্টো পেকেনো।......" [তেইশ পরিঃ]

বঙ্গের ইতিহাস-কাহিনীর সঙ্গে এদেশের ধর্ম-সংস্কৃতি ও হিন্দু রাজ্য প্রতিষ্ঠার একটা রাজনৈতিক উত্থানের চেষ্টা করেছিলেন সোমদেব। দেশের ধনী বণিক ও ভূস্বামীদের ঐক্যবদ্ধ করে, তিনি চেয়েছিলেন বিদেশী মুসলমান ও বিদেশী ক্রীশ্চানের লড়াই-এ দু'পক্ষ যখন কাটাকাটি করবে, সেই সুযোগে ঘটবে হিন্দুর জাতীয় উত্থান। তার জন্য চাই শক্তির প্রতিষ্ঠা। —শিব নয় চামুণ্ডাকে জাগাতে হবে এবং ক্লীব, ও নৃত্য-গীতে বিগলিত তনু বৈষ্ণবদের দেশ থেকে বিতাড়িত করতে হবে। এই 'সাব প্লট্'-এর নায়ক সোমদেব শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়েছেন। ক্রীশ্চানের তরবারিতে প্রাণ দিয়েছেন। মহাকালের ইচ্ছাই বড় হয়েছে। ক্ষয়-মূল ব্রাহ্মণ্য শক্তি, এবং তার শাক্ত-তান্ত্রিক সাধন-পদ্ধতি কালের ঢেউ-এ মুছে গেল। "শেষ পর্যন্ত নিজেকেই আহুতি দিলেন সোমদেব। মহাকালী নয়—মহাকালের কাছে।" [একুশ পরিঃ]

কল্পিত উপন্যাস-কাহিনীর নায়ক শঙ্খ। নায়িকা সুপর্ণা এবং উপনায়িকা দেবদাসী শম্পা। প্রেমের এই উপকাহিনীটির নায়ক শঙ্খ শেষ পর্যন্ত তাঁর পৌরুষ-শক্তিকে দৈবী শক্তির বেদীমূলে বলী দিয়েছেন। দৈবের ইচ্ছাই বলবতী হয়ে শঙ্খের ভাগ্য বেঁধে দিয়েছে সুপর্ণার সঙ্গে। শঙ্খ সুখী হয়েছে কিনা, সে প্রশ্ন গৌণ হয়ে গেছে দৈবের কাছে।

তাই 'পদসঞ্চার'-এর নায়ক বিধাতা পুরুষ—মহাকাল।

আট

শিল্প-কাহিনীর গঠন কৌশল

বঙ্কিমচন্দ্রের সার্থক ঐতিহাসিক উপন্যাস "রাজসিংহ"—(চতুর্থ সংস্করণ, ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত)। তার আগে 'রাজসিংহ' ছিল ঐতিহাসিক গল্প বা কাহিনী। তখন তার কলেবর ছিল মাত্র ৮৩ পাতার। চতুর্থ সংস্করণে যখন সেটি উপন্যাসের মর্যাদা পেল, তখন তার কলেবর হয়েছে ৪৩৪ পাতার। শুধু কলেবর নয়, তখন শিল্পের চরিত্রই গেছে বদলে। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'পদসঞ্চার' প্রথম আত্মপ্রকাশ করে ১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দে। তার বেশ কিছু আগে 'শারদীয়া দেশ' পত্রিকায় এই উপন্যাসটির ভ্রূণ দেখা দিয়েছিল 'ইতিহাস'-নামক গল্পে। 'পদসঞ্চার' উপন্যাসে সেই গল্পটি কিছু পরিবর্তিত হয়ে 'কথামুখ' নামে সংযোজিত হয়েছে। এটিকে সমগ্র উপন্যাসের ভূমিকা বা 'প্রিলিউড' রূপে গ্রহণ করা যেতে পারে।

॥ মূল ভাববস্তু ॥

'পদসঞ্চারে'র মূলভাব, বা ভাববস্তু (theme) হ'ল: হোসেন শাহী রাজবংশের শাসনের [১৪৯৪ খ্রীঃ—১৫৩৮ খ্রীঃ] শেষভাগে বঙ্গের আকাশে তীব্র সংকট ও সর্বনাশের মেঘ ঘনিয়ে আসে। সাসারামের শের খাঁ, এবং দিল্লীর হুমায়ুন বঙ্গের ঐশ্বর্য ও সিংহাসনের জন্য হানা দিচ্ছেন। বঙ্গের রাজনৈতিক ইতিহাসে নতুন সমস্যা ও সংকট দেখা দিল পর্তুগীজদের আগমনে। ভারতের দক্ষিণ ও পশ্চিম উপকূলে ইত্যবসরেই তাঁদের প্রভুত্ব স্থাপিত হয়েছে,—বাণিজ্যকুঠী ও সামরিক দুর্গ মাথা তুলেছে। এখন তাঁরা ভারতের ইন্দ্রলোক, বঙ্গে বাণিজ্যাধিকার লাভের আশায় উপনীত হয়ে সংকটকে জটিল করে তুললেন। অবশেষে ভারতের শাসনদণ্ড যে-পশ্চিমী শক্তি একদিন ছিনিয়ে নিয়েছিল, তারই সুদৃঢ় ভিত্তি স্থাপিত হ'ল চট্টগ্রাম থেকে সপ্তগ্রাম পর্যন্ত পর্তুগীজদের বাণিজ্যকুঠী নির্মাণে ও সামরিক দুর্গ প্রতিষ্ঠায়। বঙ্গকে অবলম্বন করলেও সমগ্র ভারতবর্ষই এই উপন্যাসের 'থীমে'র বিষয় হয়েছে। বঙ্গের তথা ভারতবর্ষের ধর্ম-সংস্কৃতি, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা, পশ্চিমী শক্তির পদস্থাপনায় কেমনভাবে ধীরে ধীরে নবরূপ লাভ করেছিল, স্বাধীনতা-উত্তর যুগে বসে তারই মূলানুসন্ধান করতে বসে পর্তুগীজদের বঙ্গের রাজনীতিতে অনুপ্রবেশ ঘটল কীভাবে এবং

কোন্ কারণে, কীভাবে বঙ্গের ঐশ্বর্য-প্রসবিনী কুটীর শিল্পগুলি পশ্চিমী শিল্পের হাতে ধ্বংস হ'ল, এবং খ্রীষ্ট ধর্ম নবসভ্যতার আসন বিছিয়ে দিল, তারই কাহিনী শিল্প-রূপ লাভ করেছে 'পদসঞ্চার'-এ।

বেশ শক্তিশালী একটি ঐতিহাসিক কাহিনী গঠন করে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর বক্তব্য বিষয়কে শিল্প-সার্থক রূপ দিয়েছেন। তাঁর গ্রন্থের ঐতিহাসিক অংশের প্রত্যেকটি ঘটনা, গল্প বা কাহিনী ঐতিহাসিকের বিবরণ-সমন্বিত, তথাপি তিনি যে ঐতিহাসিক নন,—ঔপন্যাসিক-শিল্পী, একথা মুহূর্তের জন্যও বিস্মৃত হন নি। প্রকৃত শিল্পী মাত্রেই ইতিহাসের পুনর্মূল্যায়ন করবেন, ইতিহাসকে তিনি পুনঃসৃষ্টি করবেন তাঁর কল্পনার ঐশ্বর্যে ও রঙে। উপন্যাস শিল্পের আঙ্গিকের পরিধির মধ্যে কল্পনারও একটি বিশিষ্ট ভূমিকা আছে। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাসগুলির শিল্পকর্মের মধ্যে বলিষ্ঠ রোমাণ্টিক কল্পনার প্রয়োগ, বিশেষতঃ তাঁর ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলিতে কল্পনা এক অভিনব সৌন্দর্য সৃষ্টি করেছে। রবীন্দ্রযুগের রোমাণ্টিক কল্পনাই নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের কবি মনের মৌলধর্ম। ঐতিহাসিক উপন্যাস 'পদসঞ্চার'-এর শিল্প-গঠনে এই রোমাণ্টিক কল্পনা কাব্যের ব্যঞ্জনা এনেছে, এবং শিল্প কাঠামোকে নতুন এক শ্রী দান করেছে। একটি ছোট গল্পকে গ্রহণ করে সমান্তরালধর্মী দুটি প্রধান কাহিনী এবং অনেকগুলি শাখা-কাহিনী ও উপকাহিনীকে নিপুণ বয়ন-কৌশলে একটি পূর্ণাঙ্গ শিল্পরূপ দান করেছেন। পদসঞ্চারের স্থাপত্য-ধর্মী শিল্প কাঠামোয় যে বিস্তৃত পরিধি এবং উচ্চতা তিনি দিয়েছেন তা রীতিমত বিস্ময়াবহ।

'পদসঞ্চার'-এর মুখ্য ও গৌণ কাহিনীগুলিকে (sub-plot) যে ভাবে বোনা হয়েছে তাতে গল্প-কাহিনীর সূত্রের কোন প্রান্তই ঝুলে থাকে নি, অথবা বুননে তা কোথাও শিথিল, বা বেমানান হয় নি। চরিত্র, ঘটনা ও গল্প কাহিনীগুলিকে Organic unity তে শিল্পী কার্য-কারণসূত্রে দক্ষতার সঙ্গে বেঁধে ফেলেছেন। প্রত্যেকটি ঘটনা কার্য-কারণসূত্রে বাঁধা। 'প্লট' বা শিল্প-কাহিনী গ্রন্থনের এটিই মৌল পদ্ধতি। "A plot is also a narrative of events, the emphasis falling on causality." ["Aspects of the Novel"–E. M. Forster] 'প্লট' নির্মাণে সময়ের অনুক্রম রক্ষা করা হয় ঠিকই, কিন্তু কার্যকারণের শৃঙ্খলটি তাকে অনেক সময় আচ্ছন্ন করে রাখে। 'পদসঞ্চার'-এর ঘটনা ও চরিত্র এবং গল্প-কাহিনীগুলি কি ভাবে কার্য-কারণসূত্রে বাঁধা পড়েছে, তা শিল্প-কাহিনীর বিশ্লেষণ থেকে জানা যায়।

॥ প্লট বা শিল্প-কাহিনীর লক্ষণ ও বৈশিষ্ট্য ॥

কিন্তু তার আগে 'প্লট' বা শিল্প-কাহিনীর বয়ন-বিষয়ক আরও দু একটি কথা মনে রাখা প্রয়োজন : (১) চমক ও রহস্য শিল্প গঠনের পক্ষে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। *

* ...Element of surprise or mystery...is of great importance in a plot." [E.M. Forster]

নিছক কৌতূহল সৃষ্টি করাই হ'ল গল্পের প্রধান বৈশিষ্ট ; কিন্তু শিল্প-কাহিনী গঠন করতে এবং বুঝতে (২) বুদ্ধির (intelligence) এবং স্মৃতির (memory) প্রয়োজন। এরা পরস্পর সম্পর্কান্বিত। অতীতকে স্মরণ করতে না পারলে, আমরা বুঝব কীভাবে ?* (৩) শিল্প কাহিনীর গঠনে শিল্পীকে প্রত্যেকটি ঘটনা-গতি এবং শব্দ ব্যবহার সম্পর্কে সচেতন ও সংযত থাকতে হয়। তবেই কাহিনী হবে ঠাস-বুনুনির ; এবং অবান্তর ও অবাঞ্ছিত ঘটনা, চরিত্র বা শব্দ যোজনা শিল্প-সৌকর্যকে বিনষ্ট করতে পারবে না ;** (৪) সৌন্দর্য সৃষ্টির প্রতি লেখকের বিশেষ মনোযোগ দেওয়া সমীচীন নয় ঠিকই, তথাপি তিনি যা গঠন করেছেন তা সুন্দর হওয়া বাঞ্ছনীয় : 'beauty at which a novelist should, never aim, though he fails if he does not achieve it' (৫) চরিত্র সৃষ্টি এবং দ্বন্দ্বের মধ্য থেকেই শিল্প-কাহিনীর নির্মাণ শুরু হয়।*** বিপরীত পক্ষে প্লট নির্মাণের মধ্য দিয়ে চরিত্র ও ঘটনা পরিস্থিতি নির্বাচন করা যায়। Forster বলেন, চরিত্র থেকেই ঘটনার উদ্ভব, এবং সেই ঘটনাই আবার চরিত্রের পরিবর্তন ঘটায়।**** ঔপন্যাসিকের সৃষ্ট চরিত্র--সে কি প্রকৃত জীবন ? বা চোখে দেখা, খাঁটি দৈনন্দিন জীবন ? এ সম্পর্কে মতভেদ যা-ই থাক পণ্ডিতদের মধ্যে, একথা সত্য যে, চোখে দেখা দৈনন্দিন প্রকৃত জীবনকে শিল্পী তাঁর 'intelligence' 'memory,' 'surprise,' 'mystery', সর্বোপরি তাঁর জীবনদর্শন এবং কবি কল্পনার দ্বারা শিল্পিত কাহিনীর সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই নবরূপ দেন। শিল্প-কাহিনীর গঠনের পক্ষে এই সৃষ্টিকরা চরিত্রেরই প্রয়োজন। আইভি কম্পটন বার্নেট বলেন : "As regards plot I find real life no help at all. Real life seems to have no plots," পার্সি লুব্বকের মতে (Parcy Lubbock : "The Craft of Fiction") 'প্লটের' দুটি বিশিষ্ট প্রকারের একটি হ'ল, এই জীবন-সম্পর্কিত ! তিনি জীবনের বিরাট-বিস্তৃত চিত্রকে প্লটের বিষয় করেছেন। ঔপন্যাসিক সেখানে সর্বদর্শীর দৃষ্টিকোণ থেকে জীবনকে দেখেন, এবং তাঁর কাহিনী-জালটি নিপুণভাবে বয়ন করেন। লুব্বকের 'Panoramic spectacles of life' এডুইন মুইর-এর (Edwin Muir) ভাষায় ক্রনিকল্। এডুইন মুইর প্লটের যে শ্রেণী বিভাগগুলি করেছেন তার অন্যতম হ'ল 'dramatic novel' বা নাটকীয় শিল্পরীতির উপন্যাস। এই রীতির

* "Memory and intelligence are closely connected, for unless we remember we cannot understand." [E.M. Forster]

** Every action or word in a plot ought to count ; it ought to be economical and spare ; even when complicated it should be organic and free from dead matter. [E.M. Forster]

*** Plot grows out of characterisation and conflict."—[The Craft of Novel-writing."—Dianne Doubtfire.]

**** "Incident springs out of character, and having occurred it alters that character." [Aspects of the Novel]

উপন্যাসে 'প্লট' ও চরিত্র অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কে গাঁথা—"are inseparably knit together."* Forster-এর মতো তিনিও বলেন : "......given 'qualities of the characters determine the action, and the action in turn progressively changes the characters, and everything is borne forward to an end"। (৬) হেনরী জেমস** উপন্যাসের শিল্পরীতির আলোচনা প্রসঙ্গে গল্পের নাট্য ধর্মিতার ওপর জোর দিয়েছেন। Lubbock-ও নাট্য ধর্মিতাকে শিল্পরীতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হিসেবে উল্লেখ করেছেন। তাঁর দুটি শিল্পরীতির কথা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি—এইটি দ্বিতীয় রীতি। যাই হোক, হেনরি জেমস মনে করেন, চরিত্র সৃষ্টিই ঔপন্যাসিকের একমাত্র কাজ নয়, তাকে শিল্পসম্মত রূপে উপস্থাপিত করাতেই তাঁর সিদ্ধি। এই প্রসঙ্গেই তিনি গল্পের dramatic treatment-এর কথা বলেছেন।

'পদসঞ্চার'-এ মূলত দুটি কাহিনী ধারা : (১) ইতিহাস-কাহিনী বা, প্রধান কাহিনী এবং (২) উপন্যাস-কাহিনী—এটি সাব-প্লট। ইতিহাস-কাহিনীর আবার প্রধানতঃ দুটি অংশ : (ক) বঙ্গের ইতিহাস—হুশেন শাহী আমলের [১৪৯৪ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৫৩৮ খ্রীষ্টাব্দ প্রধানতঃ শেষ ভাগ। মামুদ শাহ-এর শাসনকাল এখানে গৃহীত ; এবং (খ) বঙ্গে পর্তুগীজ বণিকদের আগমন—অনেক দুঃখ-যন্ত্রণার পর বাণিজ্যাধিকার লাভ, কুঠী ও দুর্গ নির্মাণ এবং বঙ্গের রাজনৈতিক পরিস্থিতির মধ্যে অনুপ্রবেশ। (১) বঙ্গের ইতিহাসের অঙ্গ হিসেবে ধর্মপ্রাণ, বাঙালীর ধর্মীয় ইতিহাসটি মূল ইতিহাসের সঙ্গে সমান্তরালভাবেই 'পদসঞ্চার' উপন্যাসে রচিত হয়েছে। অতএব মোট এই তিনটি কাহিনী-ধারার সঙ্গে শিল্পী আবার যুক্ত করেছেন বেশ কয়েকটি সাব-প্লট বা শাখা কাহিনী। যেমন—সোমদেব-শঙ্খদত্ত-রাজশেখরের কাহিনী, গঞ্জালো-সুপর্ণার কাহিনী খাজা শিহাবুদ্দীন-ডি মেলো কাহিনী, ভ্যাসকনসেলস-কোয়েলহো-ডি মেলোর ষড়যন্ত্র কাহিনী, ডি মেলো-গুয়াজিল কাহিনী—এগুলি প্রশাখার মত দেখা দিয়েছে। এখন দেখতে হবে এই কাহিনীগুলি সংশ্লিষ্ট চরিত্রের সাহায্যে শিল্পী কেমনভাবে তাঁর 'প্লট' নির্মাণ করেছেন। (২) মানব জীবনের প্রেম-প্রীতি, ধর্ম-সংস্কৃতির কাল্পনিক উপন্যাস কাহিনী।

॥ শিল্প নির্মাণ কৌশল ॥

'পদসঞ্চার'-এর শিল্প নির্মিতি খুবই জটিল—কাহিনী, উপকাহিনী, বা শাখা-কাহিনীগুলির মধ্যে কখনও দুটিকে, কখনও তিনটিকে সমান্তরালভাবে, কিংবা বেণী-বন্ধনে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া, কখনও শাখা-কাহিনীর সঙ্গে ইতিহাস-কাহিনী, কখনও বা শাখা-কাহিনীর সঙ্গে ধর্মীয়-কাহিনীকে যুক্ত করে একটি organic unity দেবার চেষ্টা।

* "The Structure of the Novel"—Edwin Muir.

** "The Art of the Novel—James, Henry

ইতিহাস, ধর্ম, প্রেম, প্রথা-সংস্কার, দেশ, কাল—সব মিলিয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ শিল্পরূপ নিয়েছে 'পদসঞ্চার'।

'পদসঞ্চার' তেইশটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত। কিন্তু কাহিনী শুরু করার আগে 'কথামুখ' অংশটিকে সমগ্র কাহিনীর ভূমিকারূপে অথবা নাটকের প্রলিউডের ঢঙে রচনা করা হয়েছে। বঙ্গে পর্তুগীজদের বাণিজ্যকুঠী নির্মাণ ও দুর্গ প্রতিষ্ঠার পূর্ব ইতিহাসটি না জানলে, পর্তুগীজদের স্বভাব-প্রকৃতির উদ্দেশ্যটি জানা না থাকলে, আলোচ্য উপন্যাসের শিল্পকর্মের রসগ্রহণ সম্ভব হোত না।

কথামুখ : 'কথামুখ' অংশে লেখক আলোচ্য উপন্যাসের শিল্পকর্মকে একটি সুদৃঢ় ভিত্তির উপরই স্থাপন করেছেন। কোভিলহান, বার্থোলোমিউ ডায়াস, কাবরাল, ভাস্কো-ডা-গামা, তারপর আলমিডা হয়ে আলবুকার্ক—একে একে অভিযান চালিয়েছেন। নানা ধরনের ক্ষয়-ক্ষতি স্বীকার করেছেন। আগুন জ্বালিয়ে, কামান দেগে, রক্তের স্রোত বইয়ে তাঁরা ধীরে ধীরে কালিকট থেকে গোয়া, ইথিওপিয়া থেকে সিংহলে তাঁদের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করলেন। 'কথামুখ'-এর ভাস্কো-ডা-গামার অসমাপ্ত কার্যকে প্রথম পরিচ্ছেদে ঔপন্যাসিক আলমিডা থেকে আলবুকার্ক-এ এসে কেমনভাবে পশ্চিমের বাণিজ্যলক্ষ্মী রক্ত পান শেষ করে প্রাচ্যের সিংহাসনে বরদা হয়ে বসলেন, তারই সংক্ষিপ্ত বিবরণীর মধ্য দিয়ে ভূমিকারূপী 'কথামুখ'-এর সঙ্গে মূল উপন্যাস-কাহিনীর সংযোগ স্থাপন করলেন। শুধু তাই নয় 'কথামুখ'-এর কাহিনী অংশটি মূল উপন্যাস-কাহিনীকে বঙ্গের গণ্ডী ছাড়িয়ে ভারতের পটভূমিকায় ব্যাপ্ত করতে সাহায্য করেছে। 'কথামুখ' এবং প্রথম পরিচ্ছেদের অতীতের ইতিবৃত্তে একটি নির্দিষ্ট স্থানের সীমারেখা আস্তে আস্তে সরে যায়। কাহিনী ভারতের সীমা ছাড়িয়ে আরব-স্পেন-পর্তুগাল—এশিয়া থেকে ইওরোপ পর্যন্ত ব্যাপ্ত হয়ে যায়। সার্থক ঐতিহাসিক উপন্যাস দেশ ও কালের বলয়কে গ্রহণ করেও, ধীরে ধীরে দেশ ও কালের নির্দিষ্ট সীমাকে অতিক্রম করে বিশালতা বোধ জাগায়। শিল্পী অসাধারণ নৈপুণ্যে তাঁর 'কথামুখ'-এ দেশের সঙ্গে কালের বলয়কেও অতীত থেকে দূর ভবিষ্যতের দিকে বিস্তৃত করে দিয়েছেন : "অন্ধকার কাঁপিয়ে আর একবার অট্টহাসি করল ভাস্কো-ডা-গামা। কোথা থেকে জেগে উঠল একটা চকিত ঝোড়ো হাওয়া—হাহাকার করে উঠল দারুচিনি আর এলালতার বন। আর আকাশের পুঞ্জিত মেঘে বিকীর্ণ হল খর বিদ্যুতের অসিধারা—যেন বিধ্বস্ত মুর প্রতিষ্ঠার ভগ্ন দুর্গে অবারিত হল আর এক নতুন শক্তির তোরণ-দ্বার।

"আর সেই অট্টহাসি রাত্রির আকাশে কেঁপে চলল কোটি অলক্ষ্য নিশি-বিহঙ্গের পাখার মতো। সেই তরঙ্গিত হাসির ছোঁয়ায় সুদূর বাঙলায় ঢাকায়, শান্তিপুরে, চন্দ্রকোণায় ঘুমন্ত তাঁতীরা একটা দুঃস্বপ্ন দেখল একসঙ্গে। স্বপ্ন দেখল, একটা লৌহময় রাক্ষস একখানা তীক্ষ্ণ-ধার করাত দিয়ে একটির পর একটি করে তাঁদের আঙুল কেটে চলেছে।" শিল্পী অনায়াসেই ভাস্কো-ডা-গামার কালকে অতিক্রম করে চলে গেছেন দূর ভবিষ্যতে, যখন ইংরেজ বণিকরা আসবেন এদেশের শিল্পগুলিকে টুঁটি

টিপে হত্যা করতে। 'কথামুখ'টি যে সমগ্র উপন্যাসেরই ভূমিকাস্বরূপ, অর্থাৎ একই শিল্পকর্মের অন্তর্গত, তা বুঝতে এতটুকু অসুবিধা হয় না, যখন দেখি 'পদসঞ্চার'-এর সমাপ্তিও ঘটেছে একই সুরে, সেই ভবিষ্যতের ইঙ্গিতবাহী রণনে।

"একবার—দুবার—তিনবার! পর্তুগীজদের কুঠি থেকে কামানের শব্দ।

"আর বহুকাল আগে কালিকট বন্দরে ডা-গামার অট্টহাসির মতো সেই কামানের আওয়াজ ছড়িয়ে পড়ল পূর্ব থেকে পশ্চিমে, উত্তর থেকে দক্ষিণে। বাঙলার পথ-মাঠ-পাহাড়-নদী-বন-বনান্তর পার হয়ে সেই শব্দ ভেসে চলল ইতিহাসের দিগন্তে। আর তার সঙ্গে সঙ্গে একটা ভয়াবহ জাগ্রত স্বপ্নে বুঝি চমকে উঠল বাঙলাদেশের তাঁতীরা! একটা অস্পষ্ট অস্ফুট যন্ত্রণার মতো বুঝি তাদের মনে হল—কারা যেন তীক্ষ্ণধার অস্ত্র দিয়ে নিষ্ঠুর হিংসায় এক একটি করে তাদের হাতের আঙুলগুলো কেটে চলেছে!" [তেইশ পরিঃ] বলা বাহুল্য, এর সুর এবং কালের ছন্দ মহাকালের বিষাদ-গম্ভীর রূপেরই আরতি করে। ভূমিকা ও উপসংহার এইভাবে শিল্পীর বয়ন কৌশলে একটি বিশাল ভাববৃত্তে বাঁধা পড়ে যায়; এবং শিল্প কাঠামোর **organic unity**-ও অক্ষুন্ন থাকে।

মূল উপন্যাস: মূল উপন্যাসটির বয়ন কৌশল এবং কাহিনীর গঠনভঙ্গি লক্ষণীয়। প্রত্যেকটি পরিচ্ছেদে প্রথম থেকেই ঔপন্যাসিক দুটি কাহিনী-ধারাকেই—ইতিহাস-কাহিনী এবং উপন্যাস-কাহিনী—সমান্তরাল ভাবে শেষ পর্যন্ত এগিয়ে নিয়ে গেছেন। প্রত্যেকটিরই আবার কতকগুলি শাখা-কাহিনী আছে—এই শাখাগুলি প্রয়োজন মত নিজ নিজ ধারার সঙ্গে পাকে পাকে জড়িয়ে গেছে এবং আশ্চর্য কৌশলে উভয় ধারার মধ্যে সংযোগ রক্ষা করেছে অথবা বলা যেতে পারে দুটি বৃক্ষ তার ডালপালা ছড়িয়ে পরস্পরকে ছুঁয়ে আছে এবং কাহিনীকে জটিল ও বিস্তৃত করেছে। কতকগুলি ছোট ছোট কাহিনী আছে, যেগুলি প্রশাখা রূপে বৃক্ষদুটিকে পল্লবিত করেছে। চরিত্রগুলি কাহিনী থেকে উদ্ভূত হয়ে ঊর্ণনাভের মতো কাহিনী-জাল বুনতে বুনতে পরিণাম রচনা করেছে। কোথাও তারা ত্রিভুজ সৃষ্টি করে কাহিনীর গঠনে জটিলতা এনেছে, এবং শিল্পকে সৌন্দর্যে, বৈচিত্র্যে ও গভীরতায় মননধর্মী করেছে।

শিল্প কৌশলের চিত্র রূপ: 'পদসঞ্চার'-এর কাহিনীর শিল্প-বয়ন কৌশলটি বর্ণনার আগে সম্ভাব্য দুটি বিকল্প চিত্র অঙ্কন করে দেখানো যেতে পারে; এবং কাহিনীতে চরিত্রগুলি যেখানে ত্রিভুজ গঠন করেছে তারও একটি সম্ভাব্য চিত্র দেওয়া হ'ল।

প্রথম সম্ভাব্য চিত্রটিতে দেখানো হয়েছে দুটি বৃক্ষ একই মাটির ওপর অসংখ্য শাখা-প্রশাখা সহ পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে—কখনও কোথাও তারা পরস্পরকে ছুঁয়ে আছে। ভিত্তি ভূমির দুটি স্তর: (ক) বঙ্গের ইতিহাস—খোদাবক্স-মামুদ শা-শের খাঁ-হুমায়ন—বঙ্গের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ইতিহাস। (খ) উদাব ধর্মপ্রাণ, বঙ্গের ধর্ম-সংস্কৃতির পরিচয়—নির্যাতিত বৌদ্ধ ধর্ম, ব্রাহ্মণ্য প্রতাপ, শৈব এবং পরে তান্ত্রিক সোমদেবের গর্ব

খর্ব করে শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব এবং বৈষ্ণব ধর্মের বিস্তার, আরও পরে পাশ্চাত্য জাতির শক্তি প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে খ্রীষ্টধর্মের আবির্ভাব।

এই মাটির উপর উঠে দাঁড়িয়েছে দুটি সমান ও সমান্তরালধর্মী বৃক্ষ—(১) পর্তুগীজ ভাস্কো-ডি মেলোর ইতিহাস-কাহিনী এবং (২) শঙ্খ-শম্পা ও সুপর্ণার প্রেমের কাল্পনিক

উপন্যাস কাহিনী

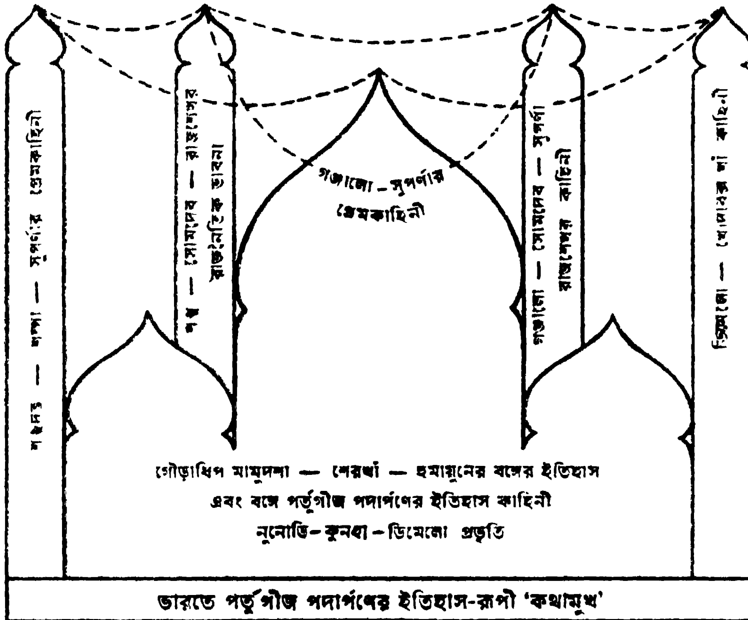
পর্তুগীজ
ইতিহাস কাহিনী
(ভাস্কো—আলমীডা—আলবুকার্ক
ইত্যাদি)

বঙ্গের ইতিহাস (১৪৯৪-১৫৩৮) মামুদশা—শেরখাঁ—হুমায়ুন
এবং বঙ্গের ধর্ম-সংস্কৃতি—সামাজিক—রাজনৈতিক—অর্থনৈতিক ইতিহাস
সোমদেব—(শৈব-শাক্ত-তান্ত্রিক) শ্রীচৈতন্য (বৈষ্ণব)+বৌদ্ধ এবং খ্রীষ্টান

সম্ভাব্য দুটি বৃক্ষের চিত্র।

উপন্যাস-কাহিনী। (১) পর্তুগীজ ইতিহাস-কাহিনীর প্রধান শাখা গঞ্জালো-সোমদেব-সুপর্ণা-রাজশেখরের কাহিনী এবং কাল্পনিক উপন্যাস-কাহিনীর একটি-প্রধান শাখা—সোমদেব-শঙ্খ দত্ত-রাজশেখরকে নিয়ে বঙ্গের তদানীন্তনকালের রাজনৈতিক চিন্তাভাবনার বিবরণ—পরস্পরকে স্পর্শ করেছে; তার ফলে দুটি বৃক্ষের মধ্যে একটি যোগাযোগ সাধিত হয়েছে। এ ছাড়াও আছে উভয় বৃক্ষেরই অনেকগুলি ছোটখাট শাখা-প্রশাখা, যা বৃক্ষদুটিকে পল্লবিত, জটিল এবং বিশালতা দানে সাহায্য করেছে।

সম্ভাব্য বিকল্প চিত্রটি স্থাপত্য-ভাস্কর্যের আদর্শে কল্পিত। 'পদসঞ্চার'-এর শিল্প কাহিনীর গঠনভঙ্গীকে তাজমহল সদৃশ স্থাপত্যচিত্ররূপে ব্যাখ্যা করলে—(১) 'কথামুখ' অংশে ভারতের দক্ষিণ ও পশ্চিম উপকূলে প্রথম পর্তুগীজ শাসন, বাণিজ্য কুঠী ও দুর্গ নির্মাণের ইতিহাস : মনোএল-ভাস্কো-কাব্রাল-আলমিডা-আলবুকার্ক-এর কাহিনীটি



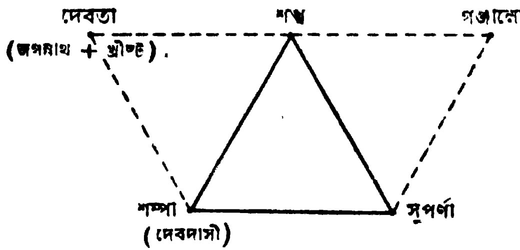
সম্ভাব্য বিকল্প (তাজমহল সদৃশ স্থাপত্য-ভাস্কর্যের) চিত্র।

'পদসঞ্চার' উপন্যাস-এর ভিত্তিভূমি স্বরূপ। (২) মূল গম্বুজটি—বঙ্গের ইতিহাস (১৪৯৪-১৫৩৮ খ্রীষ্টাব্দ)। গৌড়াধিপ মামুদ শা এবং তৎসহ শের খাঁ-হুমায়ুনের বঙ্গ আক্রমণ একদিকে, অন্যদিকে গোয়ার গভর্নর নুনো ডি-কুনহার প্রতিনিধি হিসেবে ডি মেলোর নেতৃত্বে বঙ্গে পর্তুগীজের বাণিজ্যাধিকার, কুঠী ও দুর্গ নির্মাণ এবং খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের ইতিহাসরূপে কল্পিত। (৩) গম্বুজের চারকোণে চারটি স্তম্ভ যথাক্রমে—একটি হ'ল : শঙ্খ দত্ত-দেবদাসী শম্পা ও সুপর্ণার প্রেমকাহিনী, তথা মূল উপন্যাস কাহিনী ; দ্বিতীয়টি হ'ল : শঙ্খ-সোমদেব ও রাজশেখর-এর তদানীন্তন কালের বঙ্গের রাজনৈতিক চিন্তাভাবনার বিবরণ কাহিনী ; তৃতীয়টি হ'ল : সোমদেব-রাজশেখর-সুপর্ণা ও গঞ্জালোর করুণ কাহিনী ; এবং চতুর্থটি হ'ল : খোদাবক্স খাঁ-ডি মেলো-কোয়েলহোর কাহিনী। এর মধ্যে গঞ্জালো ও সুপর্ণার প্রেমের কাহিনীটি পর্তুগীজ কাহিনীর শীর্ষদেশে মালার মতো শোভাবৃদ্ধি করেছে। পিছন দিকের দুটি কাহিনী স্তম্ভের মধ্যে সেই মালাটি

সংযোগ রক্ষা করে দুলছে। এতদ্ব্যতীত প্রত্যেকটি কাহিনীর সঙ্গে প্রত্যেকটির শিল্পগত যোগ দেখানো হয়েছে পরস্পরের মধ্যে সংযোগসূত্রের সাহায্যে।

॥ কাল্পনিক কাহিনীর চরিত্রগুলির অবস্থান চিত্র ॥

'পদসঞ্চার'-এর শিল্প-গঠনে চরিত্রগুলি যেখানেই প্রেমের স্পর্শ পেয়েছে, সেখানেই কাহিনীতে শৈল্পিক জটিলতা সম্পাদন করতে, এবং নাটকীয় গতি ও সৌন্দর্য সৃষ্টি করতে ত্রিভুজ রচনা করেছে। এ ক্ষেত্রেও একটি সম্ভাব্য জ্যামিতিক চিত্র অঙ্কন করে, চরিত্রগুলির সম্পর্ক ও অবস্থান দেখানো যেতে পারে।



৩নং চিত্র

চিত্রটি দেখলেই বোঝা যাবে শঙ্খ দত্ত ও দেবদাসী শম্পার প্রণয় কাহিনীতে এসে সুপর্ণা মিলিত হয়ে একটি ত্রিভুজ রচনা করেছেন, এই ত্রিভুজটিই 'পদসঞ্চার' উপন্যাসের প্রধান বা মূল ত্রিভুজ। অপর দুটি ত্রিভুজ গৌণ, এবং কিছুটা অস্পষ্ট, তাই টিপ্-টিপ্ রেখায় রচিত। দেবদাসী শম্পা জগন্নাথের (দেবতা) চরণে সমর্পিতা: তিনিই তাঁর প্রভু, স্বামী। বণিক শঙ্খ দত্ত তাঁর রূপে-সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হয়ে, দেবতার ধন ছিনিয়ে নিলেন যখন, তখনই অস্পষ্টভাবে তৃতীয় বাহুটি মিলিত হয়ে, একটি ত্রিভুজ রচনা করে। রাজনীতির শিকার হলেন শঙ্খ। পর্তুগীজ কামান তাঁর বহর ধ্বংস করলো। ভেসে গেলেন শঙ্খ এবং শম্পা। শঙ্খ ফিরে পেলেন পিতৃবন্ধু রাজশেখর ও তাঁর স্মৃতিহারা কন্যা সুপর্ণাকে। শম্পাকে কেন্দ্র করে শঙ্খের জীবন ধারা কূল পেল সুপর্ণাকে লাভ করে। তাকে বিয়ে করলেন। শঙ্খের জীবন-ধারা এইখানে এসে মূল ত্রিভুজটি রচনা করলো। শম্পা শেষ পর্যন্ত হারিয়ে গেলেন না—ফিরে এলেন দেবতারই কোলে, তবে জগন্নাথ নন, যীশু। শঙ্খ সুপর্ণাকে পেয়েছিলেন স্মৃতিহারা, বাক্যহারা অবস্থায়। তার কারণ, সুপর্ণা পেয়েছিলেন প্রচণ্ড আঘাত—গঞ্জালোর বীভৎস মৃত্যুদৃশ্যে। কিশোর গঞ্জালো এসে তাঁর মনে প্রেমের নবাঙ্কুর সৃষ্টি করেছিলেন। তাই শঙ্খ যখন তাঁকে জীবন সঙ্গিনীরূপে গ্রহণ করলেন, তখন একদিকে যেমন তিনি শঙ্খের সঙ্গে মূল, বা প্রধান ত্রিভুজ রচনায় যোগ দিলেন, অপরদিকে তাঁর অপরিণত-গঞ্জালো-প্রেমের আর একটি অস্পষ্ট ত্রিভুজও রেখায়িত হয়ে ওঠে।

॥ কার্যকারণ সূত্রে কাহিনী গ্রন্থন ॥

এক বা প্রথম পরিচ্ছেদ থেকেই ঔপন্যাসিক ইতিহাস ও উপন্যাস, দুটি ধারার বিনুনি-পাক দিয়েছেন। পর্তুগীজরা বঙ্গদেশের ঐশ্বর্যে আকৃষ্ট হয়ে বাণিজ্যের লোভে একের পর এক অভিযান করে, ক্ষয়-ক্ষতি-ব্যর্থতাকে মেনে নিয়ে অবশেষে সাফল্যের দ্বারে উপনীত হলেন; এই মূল ঐতিহাসিক কাহিনীর যে পটভূমিকা 'কথামুখ' অংশে শিল্পী প্রতিষ্ঠিত করেছেন, সেই পূর্বসূত্রের সংক্ষিপ্ত বিবরণ সহ শেষমুখটির সঙ্গে বঙ্গে পর্তুগীজদের পদস্থাপনার ইতিহাসের সূচনা মুখটি বেঁধে দিয়েছেন প্রথম পরিচ্ছেদে। ফলে, 'কথামুখ' অংশটি উপন্যাসের সমগ্র শিল্প কাঠামো থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকে না যেমন, তেমনি ঐতিহাসিক উপন্যাসের প্রধান কাহিনীধারার তূরী নিনাদ শোনা গেল। লেখক পর্তুগীজদের বঙ্গে বাণিজ্যাধিকারের কাহিনীস্তম্ভ বা বৃক্ষটি স্থাপন করেছেন, তদানীন্তন কালের বঙ্গের একদিকে সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় জীবন এবং অপর-দিকে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জীবনের ভিত্তির বা মৃত্তিকার ওপর। সেই ভিত্তি ভূমির ইঙ্গিতটিও প্রথম পরিচ্ছেদে উল্লেখ করতে ভোলেন নি তিনি: "ভাস্কো-ডা-গামা যে দেশের কাহিনী শুনেছিলেন স্বপ্নের মতো, তখনো সেই 'প্যারাডাইজ্ অব ইন্ডিয়া' পরম শান্তিতে ঘুমিয়ে আছে তার আম-কাঁঠালের স্নিগ্ধ ছায়ায়; তখনো তার ধান ক্ষেতে ফলছে নিরুদ্বেগ সোনা, 'পোর্টো গ্র্যান্ডি' চট্টগ্রামে আরব বাণিজ্যতরীর পাশাপাশি নোঙর ফেলেছে বাঙালি বণিকের সপ্তডিঙা মধুকর। তার তাঁতী তখনো নিপুণ হাতে বুনছে অপূর্ব মসলিন, আর তার আকাশে-বাতাসে ভাসছে চণ্ডীদাসের গান।

"আর সাসারামের বাঘ শেরশাহ সবে সতর্ক পাদচারণা শুরু করেছেন ঐতিহাসিকের অরণ্যে। তাঁর একচক্ষু গৌড়ে, আর এক চক্ষু দিল্লীর দিকে স্থিরবদ্ধ।"

পর্তুগীজ কাহিনী-স্তম্ভের অথবা, বৃক্ষের সমান্তরাল যে অপর স্তম্ভ, বা বৃক্ষটি উঠেছে সেটি হ'ল উপন্যাসের কাল্পনিক কাহিনীর। প্রথম পরিচ্ছেদে সেই কাহিনীর তূরিও ঔপন্যাসিক চালনা করেছেন শঙ্খ দত্তের পাটনে বাণিজ্য যাত্রা দিয়ে। এই দুই কাহিনী স্বতন্ত্র ও সমান্তরাল গতিতে পাশাপাশি বেড়ে উঠলেও মাঝে মাঝে উভয়ের মধ্যে নিপুণ কৌশলে তিনি সংযোগ রচনা করেছেন। শঙ্খ দত্তের চিন্তা সূত্রে সোমদেবের বঙ্গের ধর্মীয় এবং রাজনৈতিক পরিবর্তন-চেষ্টার কাহিনীর ভিত্তি গঠন করেছেন। যার ওপর দাঁড়িয়ে আছে বৃক্ষ বা স্তম্ভ দুটি। ভূমির সঙ্গে স্তম্ভ বা বৃক্ষের মূলটি সুদৃঢ় হয়েছে অর্থনৈতিক দিক থেকে। শঙ্খ দত্ত তদানীন্তন কালের বঙ্গের ধনী বণিক বা সদাগর। বঙ্গের অর্থনৈতিক বনিয়াদটি তাঁরা গঠন করেছেন। আর, ধন দত্ত এবং সোমদেবের হার্মাদ ও পর্তুগীজ বণিকের লুব্ধ দৃষ্টির আলোচনায়, এবং পর্তুগীজদের দীনহীন চেহারার জাহাজটির বঙ্গাভিমুখে যাত্রার প্রসঙ্গে দুটি বৃক্ষের শাখায় জড়িয়ে গিয়ে, অথবা দুটি স্তম্ভের সংযোগ রক্ষাকারী দুটি তোরণ চাপের মতো দাঁড়িয়ে দুটি মূল ধারাকেই নিপুণে কৌশলে তিনি বেঁধে ফেলেছেন। সুতরাং 'পদসঞ্চারে'র জটিল শিল্প গঠন-রীতির মূল পরিকল্পনাটি প্রথম পরিচ্ছেদেই ফুটে উঠেছে। প্রথম পরিচ্ছেদের 'সাব-টাইট্ল্' বা

শিরোনাম : "Viemos buscar, Cristaos e speciarias" পর্তুগীজদের আগমন উদ্দেশ্যটি ব্যক্ত করে এবং পাশ্চাত্ত্য জাতির চরিত্র বৈশিষ্ট্য ও ঐতিহাসিক আবহাওয়া রচনা করে ঔপন্যাসিকের শিল্প-পরিকল্পনার একটি 'design' বা নকশাকে আভাসিত করে।

বঙ্কিমচন্দ্রের জীবন-ভাবনা এবং জগৎ ও জীবন সম্পর্কিত দৃষ্টিভঙ্গী হেতু তাঁর ঐতিহাসিক উপন্যাস "রাজসিংহ"-এর শিল্প গঠনটি গথিক স্থাপত্য সুলভ গম্ভীর, সুদৃঢ়, মহিমময় রূপ নিয়েছে। স্কটের রোমান্টিক দৃষ্টিভঙ্গী, এবং কৌতূহল উদ্রেককারী গল্প বলার প্রবণতা হেতু তাঁর শিল্প গঠনটি প্রধানতঃ সহজ সরল শাখা-প্রশাখা বিরল একটি বৃক্ষের মতো রূপ নেয়। "পদসঞ্চার"-এ ঔপন্যাসিক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের কবিজনোচিত রোমান্স-প্রীতি, নায়ক শঙ্খ দত্তের দূরাভিসারের নেশা ও ব্যাকুলতা এবং প্রকৃতি প্রেম-মুগ্ধতার মধ্য দিয়ে আত্মপ্রকাশ লাভ করে সমগ্র শিল্প-কাঠামোর 'ডিজাইন'-এর সঙ্গে এমনভাবে সাঙ্গীভূত হয়েছে যে, তাঁর কবি-ভাষা এবং রোমান্টিক জীবন দৃষ্টিভঙ্গী উপন্যাসের শিল্প-কাঠামোকে অভিনব সৌন্দর্যের আলোয় উদ্ভাসিত ও আকর্ষণীয় করে তুলেছে। বঙ্কিমচন্দ্রের 'রাজসিংহের শিল্প গঠনের সঙ্গে যদি গথিক শিল্প গঠনের তুলনা করা যায়, তাহলে 'পদসঞ্চার'-এর গঠন সৌন্দর্য হ'ল তাজমহলীয়। শিল্পীর বস্তুনিষ্ঠার সঙ্গে রোমান্টিক কল্পনা-ঐশ্বর্য ওতপ্রোতভাবে জড়িত থাকার জন্যই এরূপ গঠনভংগী সম্ভব হয়েছে। প্রথম পরিচ্ছেদেই এই 'ডিজাইন'-টির আভাস পাওয়া যায়।

দুই বা দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের 'এপিগ্রাম' হ'ল : "Os mares sao azues. Quanto mais vivo, melhor."—শিল্পীর ভাষায় 'গভীর নীল সমুদ্র। আরো উজ্জ্বল, আরো সুন্দর।' প্রথম পরিচ্ছেদে বঙ্গের ছায়া সুনিবিড়, শান্ত মধুর যে রূপের ইংগিত দেওয়া হয়েছে, এবং 'দীনহীন চেহারার' যে পর্তুগীজ জাহাজটিকে বঙ্গের অভিমুখে আসতে দেখা গিয়েছিল, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের প্রথমাংশেই বর্ণিত হয়েছে সেই জাহাজের ক্যাপিতানের কথা—ডি মেলো, যিনি এই উপন্যাসের ইতিহাস-কাহিনীর নায়ক। অতএব প্রথম পরিচ্ছেদের ইতিহাস অংশের কাহিনীমুখ এই পরিচ্ছেদে এসে উন্মোচিত হয়েছে। ভাগ্য ডি মেলোকে ঝড়-ঝঞ্ঝার মধ্য দিয়ে বঙ্গের ঐশ্বর্য-সৌন্দর্যের উপকূলে টেনে এনেছে। সঙ্গে আছে অন্যান্য অনুচর ছাড়াও কিশোর ভাইপো গঞ্জালো,—যাকে নিয়ে রচিত হবে প্রেমের ছোট্ট একটি করুণ কাহিনী, যা উপন্যাসের কল্পিত কাহিনী ও ধর্ম-সংস্কৃতির কাহিনী-ভূমির সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করতে সাহায্য করবে। ডি মেলোর দুচোখে স্বপ্ন; বেঙ্গালার আকাশে-বাতাসে মধুর শান্তি, চারিদিকে অনন্ত সৌন্দর্য আর ছড়িয়ে আছে অফুরন্ত ঐশ্বর্য—তার সোনার ধানে, ও নানাবিধ ফসলে, এবং তার শিল্পে। মুরদের তাঁরা হটিয়ে দিয়েছেন ইওরোপ থেকে, এখান থেকেও তাদের তাঁরা বিতাড়িত করে ছিনিয়ে নেবেন বাণিজ্যের অধিকার; তারপর "এইখানে আমরা আরামে বসব হাত পা ছড়িয়ে।" আরাকানী জনৈক জেলের (থুন্দসান) সহায়তায় ডি মেলো বেঙ্গালার মাটিতে পদার্পণ করলেন; তবে 'গ্র্যান্ডি! বণিটা!'—চট্টগ্রাম বন্দরে নয়,—

চাকারিয়ায়। ডি মেলো প্রতারিত হয়েছেন। ঘটনাটি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। 'ডি-ব্যারস' প্রমুখ ঐতিহাসিকগণ বেঙ্গালার মানুষের প্রতিটি আচারে-আচরণে যে বিশ্বাসঘাতকতা ও প্রতারণার গন্ধ খুঁজে পেয়েছেন, যার ফলে বেঙ্গালায় পর্তুগীজ আগমনের ইতিহাসকে সহজ-সরল না করে, জটিল-কুটিল করে তুলেছে, তারই প্রথম পরিচয় পেলেন ডি মেলো। এই বিশ্বাসঘাতকতা ও প্রতারণার সম্মুখীন হতে হয়েছে ডি মেলো এবং তাঁর পরবর্তী পর্তুগীজ অভিযানকারী—ভাসকন্সেল্স কোয়েলহো, আজেভেদো, আলবুকার্ক—প্রমুখ নেতাদের প্রতি পদে পদে। তাঁরই জন্য শিল্প-কাহিনীর 'ডিজাইনে' সঙ্গতভাবেই দেখা দিয়েছে জটিলতা। ঔপন্যাসিক দ্বিতীয় পরিচ্ছেদেই সেই প্রতারণার ইঙ্গিতটি দিয়ে মূল ইতিহাস-কাহিনীকে জটিল করার পরিকল্পনাকে আভাসিত করলেন। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের ইতিহাস অংশের শেষভাগে অত্যন্ত নিপুণ কৌশলে নাটকীয় 'সাসপেন্স' এবং তীব্র কৌতূহল সৃষ্টি করে কয়েকটি ছত্রে যেন একটি 'ব্যাসকুট' রচনা করলেন : "কিন্তু ওই উপকূলে যে ভয়াল অভিজ্ঞতা তাঁর জন্যে অপেক্ষা করছে, তাকি ভুলেও ভাবতে পেরেছিলেন ডি মেলো? যদি ভাবতে পারতেন, তাহলে আরো জোরে—আরো কঠিন বন্ধনে গঞ্জালোকে তিনি বুকের পাঁজরে আঁকড়ে ধরতেন, আর্তনাদ করে উঠতেন : এখানে নয়, এখানে নয়! পালাও-পালাও—উর্ধ্বশ্বাসে পালাও। ওই থুন্দ্সানকে জলের মধ্যে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে পালিয়ে যাও যতদূরে হয়—কিন্তু!" —কাহিনীকে এমন জায়গায় এনে থামানো হয়েছে, যেখানে এসে পাঠকের দুর্নিবার কৌতূহল পরবর্তী ঘটনাকে জানার জন্য, এবং ছোটগল্পের মতো একটি অতৃপ্তি, মনকে পরের অধ্যায়ের জন্য ঠেলতে থাকে। কাহিনী বুননের শিল্পকর্মটি এইভাবে অবিচ্ছেদ্য কার্য-কারণ শৃঙ্খলায় গাঁথা হয়ে যায়। তৃতীয় পরিচ্ছেদ তখন আপনা থেকেই শিল্পকর্মের একটি অপরিহার্য অঙ্গ হয়ে ওঠে। এ ছাড়া, এই ধরনের পরিচ্ছেদ-সমাপ্তি কাহিনীর মধ্যে জটিল গ্রন্থি সৃষ্টি করে : কাহিনীর বাঁক নেওয়া, বা গতি-পরিবর্তনের ইঙ্গিত বহন করে ; এবং লেখকের পরিকল্পনার আড়ালে যে রহস্য ঢাকা আছে তাকে জানার জন্য পাঠকের **'intelligence'** বা বুদ্ধিতে শান পড়ে। এ ছাড়াও কাহিনী গল্পের সহজ-সরল গতিপথ ত্যাগ করে নাটকীয় চমকপ্রদ কোন ঘটনার সম্ভাবনায় আঙ্গিকটিকে ঠাসবুনানির জন্য তৈরি করে দেয়।

প্রথম পরিচ্ছেদে কল্পিত কাহিনীর নায়ক শঙ্খ দত্ত যেমন রোমান্সপ্রিয়, কবি-ভাবাপন্ন ; তাঁর মন যেমন নীড়ের গণ্ডী ভেঙ্গে মুক্তপক্ষ বিহঙ্গের মতো উড়তে চায়—আকাশ চায়, আলো চায়, স্বপ্ন দেখে—দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে ইতিহাস-কাহিনীর নায়ক ডি মেলোও সেইরকম রোমান্টিক প্রকৃতির। গভীর, নীল, উজ্জ্বল, সমুদ্রের সৌন্দর্যে ডি মেলোর চোখ তলিয়ে যায়। "সপ্ত-সাগর পাড়ি দিয়ে আসা মানুষটির কাছে নীল জল কিছু নতুন কথা নয় ; কিন্তু আজকের এই সকালের মধ্যে মিশেছে একটা অদ্ভুত মাটির গন্ধ—একটা অপরিচিত পৃথিবীর সংবাদ।"—বলে দিতে হয় না, লেখকের কবি মনটি ডি-মেলোও পেয়েছেন, তাঁর ইন্দ্রিয়ানুভূতি ডি মেলো পেয়েছেন ; তাই বাঙলার মাটির অদ্ভুত

গন্ধটুকু আবিষ্কার করতে তাঁর দেরি হয় না। দুই নায়কের এই রোমাণ্টিক প্রকৃতি 'পদসঞ্চারের' শিল্প-কাঠামোর ওপর সৌন্দর্যের এক মায়াময় আলো বিকিরণ করেছে ; অথবা, এভাবেও বলা যায়, শিল্পীর রোমাণ্টিক প্রকৃতি এবং সৌন্দর্যবীক্ষা 'পদসঞ্চার'-এর শিল্প-কাঠামোর ওপর ভাস্কর্য-অলংকার স্বরূপ। এই ধরনের শিল্পকর্ম যন্ত্রণা-ভাবায়, জীবনের গভীর থেকে গভীরতর প্রদেশে মনকে যন্ত্রণা-নিমগ্ন করে, তার চেয়ে জীবনের উপরিভাগের স্বপ্ন-আশা-আকাঙ্ক্ষা-অতৃপ্তির ব্যাকুলতায় মনকে অনেক বেশী উদাস করে দেয়। শঙ্খ এবং ডি মেলো—চরিত্র দুটির রোমাণ্টিক কবিপ্রকৃতি এই উপন্যাসের শিল্পরূপকে অভিনব সৌন্দর্যের আলোয় মনমুগ্ধকর করেছে ; কিন্তু বঙ্কিমী শিল্প-কর্মে অন্তরালশায়ী যে গভীর জীবন-জিজ্ঞাসা আছে, যে জীবন-তৃষ্ণা আছে, 'পদসঞ্চার'-এ তা প্রধানত আড়ালেই থেকে গেছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের দ্বিতীয় অংশে এবং তৃতীয় পরিচ্ছেদের প্রথমাংশে চন্দ্রনাথের পূজারী সোমদেবের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়েছে। মূলকাহিনী-বৃক্ষ বা স্তম্ভ দুটি যে ভূমির ওপর দাঁড়িয়ে আছে, (চিত্রে দেখানো হয়েছে) সেই ভূমিটি গঠিত হয়েছে দুটি স্তরের সাহায্যে—বঙ্গের শাসক শ্রেণী ও রাজনৈতিক ইতিহাস, এবং ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস। সোমদেব তদানীন্তন কালের ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি। তখনকার ব্রাহ্মণেরা ছিলেন প্রধানত শৈব, অথবা, শাক্ত-তান্ত্রিক। বৌদ্ধ সম্প্রদায়কে নিগৃহীত করে ব্রাহ্মণেরা প্রাধান্য বিস্তার করেছিলেন। কিন্তু ধীরে ধীরে শাক্ত-তান্ত্রিকদের বীরাচারী সাধনায় ধর্ম অপেক্ষা সুরা ও নারী নিয়ে ব্যাভিচার ও কামোন্মত্ততা দেখা দিতে থাকে। সাধারণ মানুষের মনে এই ধর্মাচরণের প্রতি ভক্তিভাব-বিদূরিত হয়ে, ভীতি ও অশ্রদ্ধা মাথা চাড়া দেয়। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকেই ব্রাহ্মণ-তান্ত্রিকদের মূলে পচন লাগে। ধর্মানুরাগী মানুষের আকুলকরা ডাকে বৈষ্ণব প্রেমধর্মের প্রচারক শ্রীচৈতন্যদেবের 'তিমির বিদার উদার অভ্যুদয়।' আলোচ্য 'পদসঞ্চার' উপন্যাসে ক্ষয়িষ্ণু-মূল ব্রাহ্মণ-শাক্ত তান্ত্রিক ধর্মের প্রতিনিধিরূপে সোমদেব চরিত্রটি অঙ্কিত। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের দ্বিতীয়-ভাগে ঔপন্যাসিক বঙ্গের সেই ধর্ম-সংস্কৃতির ভিত্তিভূমির গঠন শুরু করেছেন। সোমদেব শান্ত-শিবের উপাসক নন, মহারুদ্রের সাধক কাপালিক সন্ন্যাসী। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে 'পদসঞ্চার'-এর শিল্পরূপের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ, ভিত্তিভূমির প্রাথমিক স্তরটি রেখায়িত হ'ল।

তখনকার ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় শুধুমাত্র ধর্মাচারণেই নিমগ্নচিত্ত ছিলেন না ; বঙ্গে বিধর্মী মুসলমান শাসন সম্বন্ধেও তাঁদের বিদ্বেষ ও ঘৃণার অন্ত ছিল না। ব্রাহ্মণরা যে সমাজের উচ্চাসন থেকে অধঃপতিত, পদে পদে লাঞ্ছিত, অসম্মানিত তার কারণ, হিন্দুর শাসনদণ্ড মুসলমানের হাতে বলেই। তাই ক্ষুব্ধ ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় আজ আর শবরূপী শিবের ধ্যানে মগ্ন নন, হিন্দুর পুনরভ্যুত্থানের জন্য, রাজনৈতিক ক্ষমতা বিধর্মী মুসলমানের হাত থেকে ছিনিয়ে নেবার স্বপ্ন-আকাঙ্ক্ষা তাঁরা অন্তরে অন্তরে পোষণ করেন। সুতরাং ব্রাহ্মণ-কাপালিক সোমদেব ধর্ম ছাড়াও হিন্দু শাসনাধিকারের স্বপ্ন ও আকাঙ্ক্ষাকে বাস্তবায়িত

করতে তলে তলে একটি প্রচেষ্টা চালাতে থাকেন। তৃতীয় পরিচ্ছেদের প্রথমাংশে বণিক-সদাগর রাজশেখরের সঙ্গে সোমদেবের হিন্দুর ক্ষমতাধিকার বিষয়ে আলোচনায় একটি নতুন শাখা স্পষ্ট হয়ে উঠল। শাখাটির সূচনা হয়েছিল প্রথম পরিচ্ছেদের দ্বিতীয়ভাগে—শঙ্খ দত্ত-সোমদেবের বিধর্মী মুসলমানদের হাত থেকে শাসনভার হিন্দুর হাতে ফিরে পাওয়ার আলোচনায়, এবং বিদেশী পর্তুগীজদের সম্বন্ধে সাবধান বাণী উচ্চারণে এই নতুন শাখাটি পূর্ণাঙ্গ হয়ে উঠল, সোমদেব-শঙ্খ দত্ত এবং আরও পরে গঞ্জালো এসে যখন যুক্ত হলো। পদসঞ্চারের, শিল্পরূপটিকে স্থাপত্য রূপে চিত্রিত করলে, সোমদেব—শঙ্খ—রাজশেখর—পর্তুগীজ গঞ্জালোর রাজনৈতিক শাখা-কাহিনীটি দুটি কাহিনী-স্তম্ভের মধ্যে সংযোগ রক্ষা করে, বক্ষে মালার মতো দুলছে। তৃতীয় পরিচ্ছেদের প্রথমাংশে সোমদেব—রাজশেখর সাক্ষাৎকারের শিল্পগত আরও একটি গুরুত্ব আছে। শৈব সোমদেব যে, শাক্ত-তান্ত্রিক সোমদেবে রূপান্তরিত হয়েছিলেন তা এই পরিচ্ছেদেই প্রথম বোঝা গেল। ব্রাহ্মণ-শাক্ত-তান্ত্রিকের ধর্মাচরণ পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ ও ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম দশকের বাঙলার ধর্মীয় চিন্তা ও অবস্থার একটি প্রধান রূপ—যা এই উপন্যাসের শিল্পকাহিনীর ভিত্তি ভূমি গঠনে প্রায় অপরিহার্য হয়েই দেখা দিয়েছে।

শিল্পকাহিনীর গঠনে তৃতীয় পরিচ্ছেদের গুরুত্ব আরও একটি দিক থেকে। এই উপন্যাসের কল্পিত কাহিনীর যে বৃক্ষ বা স্তম্ভটি রচিত হয়েছে শঙ্খদত্ত, দেবদাসী ও সুপর্ণাকে নিয়ে, সেই কাহিনীর নায়িকা সুপর্ণাকে ঔপন্যাসিক পাঠকের সামনে উপস্থিত করেছেন এই পরিচ্ছেদে। আঠারো পরিচ্ছেদে এসে সুপর্ণা-শঙ্খের মিলিত জীবন ধারার কাহিনী পাওয়া যাবে। এবং, শঙ্খ-শম্পা মিলে শিল্পকাহিনীর মধ্যে ত্রিভুজের যে দুটি বাহু রচিত হয়েছিল, সুপর্ণা-শঙ্খের সঙ্গে মিলিত হয়ে সেই ত্রিভুজের তৃতীয় বাহুটি গঠন করে ত্রিভুজ সম্পন্ন করে। এই মূল ত্রিভুজের দুই পাশে যে দুটি অস্পষ্ট ত্রিভুজের ছবি চিত্রে প্রদর্শিত হয়েছে, সেই দুটির একটি গঠিত হয়েছে সুপর্ণা-গঞ্জালো-শঙ্খকে নিয়ে। কাজেই 'পদসঞ্চারের' শিল্পকাহিনীর গঠনে সুপর্ণা চরিত্রের উপস্থাপনায় তৃতীয় পরিচ্ছেদের গুরুত্ব অপরিসীম।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে ইতিহাসের কাহিনী ধারায় যে ব্যাসকূট সদৃশ এক জটিল অবস্থার ইঙ্গিত ছিল, তৃতীয় পরিচ্ছেদের দ্বিতীয়ভাগে সেই কাহিনীকে সংশয়-জটিল পথে ঔপন্যাসিক এগিয়ে নিয়ে গেছেন। নায়ক ডি মেলোর মনের সংশয়, প্রশ্নে তীক্ষ্ন: 'এই কি সেই চট্টগ্রাম?'

ডি মেলোর কপালে ভ্রূকুটির রেখা। এই পরিচ্ছেদের 'সাব টাইট্‌ল'-এও ডি মেলোর সংশয়াচ্ছন্ন মনের প্রশ্নটি পাঠকের সামনে আগেই ছুঁড়ে দিয়েছেন ঔপন্যাসিক: **"Que cidade e esta?"**—"এ কোন্ শহরে এলাম"?

চাকারিয়ার নবাব-দরবারে ডি মেলো উপস্থিত হলেন। চাকারিয়ার নবাব খোদাবক্স খাঁ, বঙ্গে হোসেন শাহী শাসন ইতিহাসেরই অঙ্গ। পর্তুগীজ ক্যাপিতান ডি মেলো প্রথম প্রতারিত হয়ে চট্টগ্রামের পরিবর্তে চাকারিয়ার নবাব খোদাবক্স খানের দরবারে উপনীত

হলেন। ফলে পর্তুগীজদের বঙ্গে বাণিজ্যাধিকার লাভের ইতিহাসের সূচনা হলেও, প্রকৃত অধিকার লাভের জন্য আরও কিছুকাল অপেক্ষা করতে হয়েছিল। তাই এটিকে মূল পর্তুগীজ কাহিনীর শাখা-কাহিনী রূপে দেখানো হয়েছে। এই শাখাটি একদিকে বঙ্গের মূল ইতিহাসের অঙ্গ, অন্যদিকে পর্তুগীজ ইতিহাস কাহিনীকে তা পল্লবিত করেছে।

॥ **শাখা কাহিনী :** (খোদাবক্স খাঁ ও ডি মেলো) ॥

তৃতীয় পরিচ্ছেদ থেকে একাদশ পরিচ্ছেদ পর্যন্ত, খোদাবক্স খাঁ এবং ডি মেলোর শাখা-কাহিনী বিস্তৃত হয়েছে। চতুর্থ পরিচ্ছেদে ডি মেলো অনুচরবর্গসহ কারারুদ্ধ হয়েছেন : এবং একাদশ পরিচ্ছেদে পারস্য বণিক খাজা শিহাবুদ্দিন, বা সাহাবুদ্দিনের সহায়তায় ডি মেলো অনুচরবর্গসহ নবাবের কারাগার থেকে মুক্তিলাভ করে গোয়ায় প্রত্যাবর্তন করেছেন। এইখানেই ডি মেলোর প্রথম অভিযান সমাপ্ত। কিন্তু এই কাহিনীটির একাধিক প্রশাখাও আছে। শিল্পী অত্যন্ত নিপুণতার সঙ্গে তাঁর কাহিনী-বৃক্ষে একটি একটি করে ডালপালা গজিয়ে তুলে বৃক্ষটিকে বিশাল-বিস্তৃত করেছেন। ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে খোদাবক্স-ডি মেলো কাহিনীর মধ্যে ছোট্ট একটি জটিল গ্রন্থি সৃষ্টি করা হয়েছে। ডি মেলোর অনুচরদের মধ্যে পেড্রো দু'একজন সঙ্গী-সাথী সহ দলনেতার বিরুদ্ধে সহসা বিদ্রোহী হয়ে ওঠে; নাটকীয় চমকে কাহিনীতে ক্ষিপ্র গতি আসে এবং কাহিনী যখন নতুন একটি বাঁক নিতে চলেছে, ঠিক সেই মুহূর্তে চমকের পর চমক সৃষ্টি করে ভ্যাসকন্‌সেল্‌স্‌ ও কোয়েলহোর আবির্ভাব এবং বক্রগামী কাহিনীমুখ ডি মেলোদের মুক্তি-সম্ভাবনায় আবার সোজা পথ নেয়। ভ্যাসকনসেলস্‌-কোয়েলহো-ডি মেলো কাহিনী-শাখার নতুন প্রশাখা। কিন্তু পরিচ্ছেদ শেষে আবার সেই ব্যাসকূট সদৃশ রহস্যময় এক ইঙ্গিত : "কিন্তু মুক্তি! কী ভয়ঙ্কর—কী নিষ্ঠুর মূল্য যে তার জন্যে দিতে হবে, সে দুঃস্বপ্ন কি কল্পনাতেও ছিল অ্যাফন্‌সো ডি মেলোর?"—পাঠককে নতুন ভাবনার পথে ঠেলে দেয়, এবং পরবর্তী ঘটনার জন্য তীব্র আগ্রহ সৃষ্টি করে। এইভাবে সমগ্র শিল্প-কাহিনীতে মাঝে মাঝেই তিনি নতুন গতি সঞ্চার করেছেন। ছুটন্ত গাড়িতে গীয়ার পরিবর্তন করে যেমন গতিবৃদ্ধি করা হয় অনেকটা সেইরকম। উদ্রিক্ত আগ্রহ-কৌতূহলকে তীব্রতর করতে ঔপন্যাসিক সপ্তম পরিচ্ছেদে পাঠককে ধরে রাখেন ভিন্ন ঘটনার তুঙ্গে। সেখানেও অনুরূপ তীব্র উত্তেজনাকর দুর্নিবার আগ্রহ প্রশমিত করার অন্য এক ঘটনা। সে প্রসঙ্গ যথাসময়ে আলোচিত হবে। অষ্টম পরিচ্ছেদে নবশক্তি প্রাপ্ত খোদাবক্স-ডি মেলো শাখা-কাহিনী সোজাপথে আরও এক ধাপ এগিয়ে যায়। মুক্তিপণের দরাদরিতে ব্যর্থ হন ভ্যাসকন্‌সেল্‌স্‌-কোয়েলহো। কারাকক্ষেই বুঝি ডি মেলোকে কাটাতে হয়! কিন্তু তা হ'ল না। আরও একটি ছোট্ট প্রশাখা নাটকীয় চমক দিয়ে সহসা উদ্ভূত হয় রাতের অন্ধকারে। এ এক ষড়যন্ত্র। দাঁড় ও বৃক্ষের সাহায্যে পিছন দিকের কারা-প্রাচীর লঙ্ঘন করে রক্ষীকে পরাস্ত করে ভ্যাসকন্‌সেল্‌স্‌-কোয়েলহোর আবির্ভাব। অভাবিত

মুক্তির সুযোগ ঘটে ডি মেলো ও তাঁর অনুচরবর্গের। কিন্তু, অস্বাভাবিক কিছু ঘটল না। কিভাবে জানাজানি হয়ে সবাই ধরা পড়ে গেলেন ; এবং বিদ্রোহী পোড্রোর প্রাণ গেল। কেবলমাত্র কিশোর গঞ্জালোই পাঁচিল টপকে বাইরে বেরিয়ে আসতে পারলো ; যে-মুক্তি তার পক্ষে সত্যই ভয়ংকর ও বীভৎস ! ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ শেষে শিল্পী তার রহস্যাচ্ছাদিত ইঙ্গিত দিয়েছেন। এবং সেই সঙ্গে, একটি দৃঢ় ভিত্তির উপর দুই বৃক্ষের চিত্রের পরিকল্পনাটিকে শাখা-প্রশাখায় পূর্ণাঙ্গ করে তুলতে, অথবা, শিল্প-স্থাপত্যকে ভাস্কর্য-মণ্ডিত করতে আবার একটি নতুন শাখা, দুই স্তম্ভের সংযোজক এক নতুন চাপ গঞ্জালোকে নিয়ে গঠিত হ'ল। ইতিহাসের মধ্যে যেন রোমান্স! সময়ান্তরে তার শিল্পরূপ ব্যাখ্যাত হবে। আপাততঃ তাকে ব্রাহ্মণ-শৈব-শাক্ত তান্ত্রিক সোমদেবের হাতে শিল্পী তুলে দিয়েছেন অষ্টম পরিচ্ছেদের অন্তে।

যে শ্বাসরুদ্ধকারী ঘটনার ফেনিল আবর্ত রচনা করে পর্তুগীজ ইতিহাসের নায়ক ডি মেলো ছুটে চলেছেন অজানা ভবিষ্যতের দিকে, তারই উত্তেজনাকে একটু প্রশমিত করে শিল্পী তৎক্ষণে উপন্যাসের কল্পিত কাহিনীটিকেও অনুরূপভাবে নাটকীয় ঘটনা-পরিবেশ-পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে পাঠকের মনকে আর একটি তুঙ্গে তুলে নিয়ে আসেন নবম পরিচ্ছেদে। দশম পরিচ্ছেদটি তিনি নিলেন গঞ্জালোকে নিয়ে মধুর, অথচ, ট্রাজিক পরিণাম বিশিষ্ট একটি ছোট-খাটো রোমান্স রচনার প্রস্তুতির জন্য। খোদাবক্স-ডি মেলো কাহিনীর উত্তেজনা আরও একটু প্রশমিত হতে দিলেন। অতঃপর একাদশ পরিচ্ছেদে এই কাহিনী-শাখা পূর্ণাঙ্গরূপ নিল, তার একটি নতুন প্রশাখার সংযোজনায়। খাজা সাহাবুদ্দিন, জনৈক পারস্য ধনী বণিক, যাঁর পণ্যভরা পর্তুগীজ ঢঙের দুখানি জাহাজ ভ্যাজ পেরিরা আটক করে রাখেন,—নুনো ডি-কুনহার কাছ থেকে সাহায্য লাভ করে, নবাবের কারাগার থেকে মুক্তিপণ দিয়ে ডি মেলোকে অনুচর সহ মুক্ত করেন। ডি মেলো গোয়ায় ফিরে যান। কিন্তু সাহাবুদ্দিনের কাহিনী-সূত্রের মুখটি এখনো খোলা রইলো, কারণ শিল্প-কাহিনীতে তাঁর প্রয়োজন এখনও আছে।

॥ **কাল্পনিক কাহিনী** ॥

চতুর্থ পরিচ্ছেদে ঔপন্যাসিক তাঁর কাল্পনিক কাহিনীর নায়ক শঙ্খ দত্তের চরিত্রকে মোটামুটি একটি অবয়ব দিতে চেয়েছেন। শঙ্খ দত্তের কাহিনী ধীরগতিতে প্রথম পরিচ্ছেদে শুরু হওয়ার পর চতুর্থ পরিচ্ছেদে এসে শিল্প-কাহিনীর পরিকল্পনা বা 'ডিজাইন'-এর দিকে আরও একটু এগিয়ে এল। কবি-স্বভাবের শঙ্খ দক্ষিণ পাটনে বাণিজ্য যাত্রায় বেরিয়ে পুরীধামে ঘাটে বহর ভিড়িয়েছেন। মূল কাল্পনিক কাহিনীর গঠনে, নায়ক চরিত্রের রূপায়ণে, এবং 'পদসঞ্চার'-এর শিল্প-মূর্তির নির্মাণে পুরীধামের গুরুত্ব অপরিসীম। এখানে উদ্ধব পান্ডার সঙ্গে শঙ্খের সাক্ষাৎ, এবং সেদিন রাত্রেই জগন্নাথ দেবের মন্দিরে বিশিষ্ট নির্বাচিত, ব্যক্তিদের মধ্যে একজন হিসেবে শঙ্খ সৌভাগ্য ও সুযোগ লাভ করলেন দেবদাসীর নৃত্য দেখার। উদ্ধব পান্ডা এখানে 'মেকানিক্যাল এজেন্ট' মাত্র।

কাহিনীর মধ্যে জোয়ার আসার সঙ্কেত শোনা গেল। কিন্তু তার আগে মূল কাল্পনিক কাহিনী ও মূল ঐতিহাসিক কাহিনীর পর্তুগীজদের সঙ্গে একটি যোগাযোগ প্রয়োজন—শিল্পাঙ্গিকের 'অরগ্যানিক ইউনিটি' বজায় রাখতে। সুতরাং, এক্ষেত্রেও গোলাম আলীর মতো একটি 'মেকানিক্যাল এজেণ্ট' জাতীয় চরিত্রের প্রয়োজন হয়েছে। গোলাম আলী এসে শঙ্খকে ডেকে নিয়ে গেছেন নির্জন সমুদ্রতীরে—হার্মাদ-পর্তুগীজদের সম্পর্কে তাঁকে সাবধান করে দেওয়া, এবং সংঘবদ্ধভাবে তাদের এদেশ থেকে হটিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে। পঞ্চম পরিচ্ছেদে ঔপন্যাসিক পর্তুগীজ কাহিনীটিকে গ্রহণ না করলেও গোলাম আলির কথাবার্তার মধ্য দিয়ে তাদের চরিত্র পরিচয়টি মুর ও মুসলমান শাসকদের কাছে কিরূপ, তা ব্যক্ত করেছেন। সোমদেব-শঙ্খ-রাজশেখর মিলে দেশের রাজনৈতিক অবস্থা বিষয়ে যে শাখা-কাহিনীর সাহায্যে উভয় কাহিনী-ধারার মধ্যে যোগসূত্র রচনা করেছেন, গোলাম আলী এসে বঙ্গের সেই রাজনৈতিক অবস্থা ও পরিস্থিতির আলোচনা করে ঐতিহাসিক ভাব পরিমণ্ডল বজায় রেখেছেন।

'পদসঞ্চারে'র শিল্প-কাঠামোয় শঙ্খ-দেবদাসী-সুপর্ণার কাল্পনিক কাহিনীর যে বৃক্ষটি দাঁড়িয়ে আছে, তার সূচনা এই পঞ্চম পরিচ্ছেদে। প্রথম ও চতুর্থ পরিচ্ছেদে ঔপন্যাসিক এই কাহিনীর নায়ক শঙ্খ দত্তের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন পাঠকের। চতুর্থ পরিচ্ছেদেই দেবদাসী প্রসঙ্গের ইঙ্গিত আছে। পঞ্চম পরিচ্ছেদে শিল্পী নায়ক শঙ্খ দত্তকে প্রবেশ-নিষিদ্ধ মন্দিরাভ্যন্তরে জগন্নাথের সামনে যেখানে দেবদাসী স্বর্গীয় রূপের হিল্লোল তুলে দেবতার চরণে প্রণামে নত, সেইখানে উপস্থিত করে দিলেন। দেবদাসী শম্পার জীবনধারাপথে শঙ্খ হলেন তৃতীয় বিন্দু, প্রথম বিন্দু নীল মাধব, দ্বিতীয় বিন্দু শম্পা স্বয়ং।

রূপের তরঙ্গে আলোর মোহিনী মায়ায়, অলংকার ঐশ্বর্যের দীপ্তিতে, পুষ্পচন্দনের সৌরভে যে মায়ালোক রচনা করেছেন শিল্পী, তা রোমান্সের নেশা ধরায়। কাহিনীর এই রোমান্স-ধর্মিতা, কিংবা ভিন্নভাবে শিল্পীর রোমাণ্টিক প্রকৃতি আলোচ্য উপন্যাসের শিল্পাঙ্গিকের পক্ষে ত্রুটি বা দুর্বলতা নয়—ঐশ্বর্য বা গুণ। ইতিহাসের ঘটনার ঘন-ঘটায় বস্তুর পুঞ্জ যেখানে গগন অন্ধকার করে স্ফীতকায় হয়ে ওঠার সম্ভাবনা, শিল্পী সেখানে রোমান্সের খর প্রবাহে তাকে ভাসমান, গতিশীল করার কৌশল অবলম্বন করেছেন। অথবা, এভাবেও বলা যেতে পারে, বাস্তব ঘটনার বস্তুপুঞ্জের ভার যাতে পীড়াদায়ক না হয়, তারই জন্য মাঝে মাঝেই রোমান্সের মায়াময় স্বপ্নালোকে তাকে এমন এক সৌন্দর্যে বিভূষিত করেছেন যে, পাঠক সানন্দে সে বস্তুভার বহন করে নিয়ে চলেন। এই উপন্যাসের শিল্পরীতির অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হ'ল রোমান্স ও বাস্তবের সূত্র দুটি কল্পনার মাকুতে শিল্পী টানা ও পোড়েনের সাহায্যে শিল্প-কাহিনীটি সার্থকভাবে বয়ন করেছেন। পঞ্চম পরিচ্ছেদে তিনি যে স্বপ্নের, মায়ার, সৌন্দর্যের জগৎটি রচনার জন্য তুলির টান দিয়েছেন, সপ্তম পরিচ্ছেদে তাকেই রূপময় করে তুললেন। তাঁর শিল্পরীতির এটিও একটি কৌশল। ধীরে ধীরে, স্তরে-স্তরে, ধাপে-ধাপে তিনি

পাঠককে তুলে নিয়ে আসেন উত্তেজনা, কৌতূহল, আগ্রহ-আবেগের পাদদেশে ; তারপর একটা নাটকীয় মুহূর্ত রচনা করে এক লাফে পাঠককে তুলে নিয়ে আসেন সেই আবেগ-উত্তেজনাকর ঘটনার তুঙ্গে। থর থর করে কাঁপতে থাকে পাঠকের মন ; ঘূর্ণিঝড়ের মতো পাক খেয়ে ওঠে গতি এবং পরিণামের দিকে ছুটে চলে কাহিনী। পূর্বেই খোদাবক্স-ডি মেলো-ভ্যাসকন্‌সেলস ঘটনা কাহিনীর শিল্পরূপের ব্যাপারে সে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। একদিকে ধাপে ধাপে যেমন ইতিহাসের ঘটনা-কাহিনীকে নাটকীয় চমক ও উত্তেজনাকর আবেগ-কৌতূহলের তুঙ্গে তুঙ্গে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন, অপরদিকে কাল্পনিক কাহিনীটিকেও ওই একই শিল্পরীতিতে ধাপে-ধাপে আবেগের তুঙ্গে উত্তোলিত করেছেন। আর একদিকে—ভূমিস্থ ইতিহাস, কাহিনী, শাখার মতো দুটি প্রেমের কাহিনী, এবং একটি রাজনৈতিক চিন্তা-ষড়যন্ত্রের কাহিনীর প্রত্যেকটিকেই ঐ একই রীতিতে উত্তেজনাপূর্ণ, নাটকীয় চমক সৃষ্টিকারী ঘটনার শীর্ষে উন্নীত করেছেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদে দেবদাসীর আবির্ভাবে যে মায়ালোকের দ্বারোদ্ঘাটন করলেন, ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে তাকে আর নিয়ে এলেন না। পরবর্তী আরও বিস্ময়কর ঘটনার জন্য সে যেন খানিকটা দম সঞ্চয় করে নিল, ঘটনাকেন্দ্রে ঝড়ের গতি আহরণ করে নিল ; না হলে নারী ও তার কামজ দেহ-রূপের সম্পর্কে উদাসীন শঙ্খের রক্তে দোলা লাগবে কি করে! তাঁকে মাতাল করবে কে ?

পঞ্চম পরিচ্ছেদে যে বিস্ময়াবহ স্বপ্নজগতের দ্বারোদ্ঘাটন হ'ল সপ্তম পরিচ্ছেদে শঙ্খকে হাত ধরে সেই স্বপ্ন-মায়ার জগতে এনে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হ'ল—সঙ্গে সঙ্গে পাঠককেও :

"মন্দির নয়—মায়ালোক।

"বীণা, বাঁশি আর মৃদঙ্গের ধ্বনিতে যেন গন্ধর্বলোকের ঐকতান। ঘরের উজ্জ্বল আলোগুলো পরিণত হয়েছে জ্যোতির তরঙ্গে—ফুল আর ধূপগন্ধ আবর্তিত হচ্ছে সুরের রেণু রেণু পরাগের মতো। চারদিক থেকে সরে গেছে মন্দিরের দেওয়াল—দূরের সমুদ্র যেন সঙ্গীতের তরল তরঙ্গ হয়ে সব কিছু ভাসিয়ে নিয়ে গেছে ; আর সেই সমুদ্রের শীর্ষে ধ্বনি-গন্ধের একটি সহস্রদল শুভ্রপদ্মের ওপর দেবদাসীর দেহ লীলায়িত হচ্ছে বিষ্ণুমানসী উর্বশীর মতো।

"একটি ফেন-বুদ্বুদের মতো আলোক তরঙ্গের চূড়ায় জেগে রইল শঙ্খ দত্তের চেতনা।" —এই ভাবে শিল্পী ঘটনাকে আবেগের শীর্ষে তুলে নিয়ে এসেছেন। তাঁর নিবিড় রোমান্টিক কল্পনায় ধীরে ধীরে স্থান ও কালের (space and time) সীমারেখাটি মুছে যায়। জেগে থাকে শুধু একটি রূপ ও সৌন্দর্যের জগৎ। ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে বর্ণিত সোমদেব-রাজশেখরের বঙ্গের রাজনৈতিক ও ধর্মীয় অবস্থা বিষয়ক চিন্তা, কিংবা, খোদাবক্স খানের নিষ্ঠুর, ভয়ঙ্কর কারাকক্ষে ডি মেলোদের যন্ত্রণা—সপ্তম পরিচ্ছেদে সবই হাল্কা হয়ে ভাসতে থাকে শৈল্পিক কৌশল গুণে।

"দেবদাসী দেবতার বধূ। তাই দেবতার কাছে তার কোন সংকোচ নেই। নিজের

দেহমন, লাজলজ্জা—সব নিঃশেষে নিবেদন করে দিয়েই সে ধন্য"। দেবতা ও দেবদাসী দুটি বিন্দু আর পৃথক রইল না—একটি সরল রেখায় যুক্ত হয়ে গেল। শঙ্খ দেখলেন, দেবদাসী শম্পার নৃত্য এবং নৃত্যের তালে তালে রূপ-সৌন্দর্যের উদ্ভাস। আস্তে আস্তে এই রূপের নেশা প্রথমে বাসনা, পরে কামনার আগুন ছড়ালো তাঁর রক্তে। পান্ডা উদ্ধবের কাছে জানতে পারলেন, শম্পা 'হৃতা'—যাকে অপহরণ করে এনে মন্দিরে দান করা হয়েছে। শম্পার প্রতি শঙ্খের বাসনা একটা রূপ নিতে চাইছে এবার। "রক্তমাংশের একটি নারীমূর্তি আত্মপ্রকাশ করছে তার মধ্য থেকে। দেবদাসী নয়—একটি মানবী; সোনার ফলেভরা চলন্ত দ্রাক্ষালতা।" শম্পা ও শঙ্খের মধ্যে একটি সরল রেখা ক্রমশ যুক্ত হতে থাকে।

'হৃতা' শব্দটিই শঙ্খের মনে দারুণ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করল। তাঁর বুকের মধ্যে তীক্ষ্ন যন্ত্রণা দিয়ে শব্দটি কেটে বসতে থাকে। দেবতা, আর কল্পনা-রাজ্যের ভক্তি বিশ্বাসের নিরাবয়ব সুন্দর নন; তিনি ক্রমশ শঙ্খের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠলেন,—ঈর্ষার পাত্র হয়ে উঠলেন। "কোথা থেকে একটা অক্ষম ঈর্ষা সঞ্চারিত হতে লাগল শঙ্খ দত্তের মনে। এই মন্দিরের ওপরে ঈর্ষা—দেবতার ওপরে ঈর্ষা। মানুষের প্রাপ্য কেড়ে নিয়েছে মন্দির—জোর করে অধিকার করেছে দেবতা।" —সুতরাং তৃতীয় বিন্দু শঙ্খের সঙ্গে প্রথম বিন্দু দেবতার যোগসূত্রটিও ঔপন্যাসিক এই সপ্তম পরিচ্ছেদেই অস্পষ্টরেখায় যোগ করে দিয়ে একটি অস্পষ্ট ত্রিভুজ যেমন এক পাশে গঠন করলেন তাঁর শিল্প-কাহিনীতে; অপর দিকে শঙ্খ-শম্পা-সুপর্ণার মূল প্রেম কাহিনীর দুটি বিন্দু শম্পা ও শঙ্খের মধ্যেও সরল রেখাটি এখানেই অঙ্কিত হয়ে গেল।

শঙ্খের মনে কামনার যে আগুন জ্বললো তাই নিয়ে মূল প্রেমকাহিনীর যাত্রা শুরু। পথে পথে চঙ্ক্রমণ শুরু হ'ল শঙ্খের। আর একবার শম্পাকে দেখা চায়। কীভাবে তাঁকে পাওয়া যায়। জাগর রাত্রির ক্লান্তি ও স্নায়ুর উত্তেজনাই কী শুধু? ভোরের শীতলস্পর্শ-হাওয়ায়, এবং সমুদ্রের শীতল স্পর্শ-জলে অবগাহন করে উত্তেজনা কিছুটা প্রশমিত হলেও, আবার তা প্রখর হয়ে উঠল, পথে বিবাহের শোভাযাত্রায় নীলাম্বরী শম্পাকে অগ্রগামিনী দেখে। একটি ছোট্ট আবর্ত রচনা করে শোভাযাত্রা চলে গেল; কিন্তু নায়কের মনটিকে বেঁধে নিয়ে গেলেন শম্পা। শিল্প-কাহিনীকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য পাঠকের মনের মধ্যেই কৌতূহলকে তীক্ষ্ন করে সপ্তম পরিচ্ছেদ সমাপ্ত হয়েছে।

আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ও শিল্পিত হয়েছে এই পরিচ্ছেদে। বাঙলা দেশ থেকে একদল বৈষ্ণব সম্প্রদায় পুরীধামে এসেছেন। শ্রীচৈতন্য প্রবর্তিত হরি-সংকীর্তনে তাঁরা মানুষের অন্তরে নব-কল্লোল জাগিয়ে তুলেছেন। বঙ্গের ধর্ম-সংস্কৃতির একটি প্রধান রূপ যেমন ব্রাহ্মণ শৈব-শাক্ত-তান্ত্রিক সোমদেব ফুটিয়ে তুলেছেন, তেমনি ধর্মের আর একটি রূপ,—সেই শ্রীচৈতন্য প্রবর্তিত প্রেমভক্তির রূপ—যা ষোড়শ শতাব্দীর বঙ্গে প্রাধান্য পেয়েছিল, তারই সূচনা করলেন এই সপ্তম পরিচ্ছেদে। শাক্ত-তান্ত্রিকদের

কাছে এই নৃত্যগীতোন্মত্ত বৈষ্ণব সম্প্রদায় নপুংসক ; চৈতন্যদেব বদ্ধ উন্মাদ। কাজেই উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে বঙ্গে যে একটি বিরোধ ক্রমস্ফুটমান হয়ে উঠছিল, ঔপন্যাসিক তাঁর ধর্মসংস্কৃতির ভিত্তিভূমিটি গঠনে সেদিকও উপেক্ষা করেন নি। "এই বৈষ্ণবদের নাম শুনলেই ক্ষেপে ওঠেন গুরু সোমদেব। মাথার ওপরকার জটাগুলো যেন সাপের মতো ফণা তোলে। চোখ থেকে আগুন ঠিকরে বেরিয়ে আসে।—'ক্লীবের দেশকে আরো ক্লীব করে দিচ্ছে ওরা। যেটুকু পৌরুষ অবশিষ্ট ছিল, ওরাই তা শেষ করবে। এই পাষণ্ড বৈষ্ণবগুলোকে ধরে একটার পর একটা করে মহাকালীর পায়ে বলি দেওয়া উচিত।' "

অতঃপর একদিকে প্রেমের মূল-কাহিনীকে কয়েকটি শাখা-প্রশাখাসহ পরিণতির দিকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন ঔপন্যাসিক নবম থেকে চতুর্দশ পরিচ্ছেদের মধ্যে ; এবং আর একদিকে পাশাপাশি বুনে চলেছেন সুপর্ণাকে নিয়ে আর একটি ট্রাজিক-ধর্মী প্রেমের কাহিনীর শাখা। লক্ষণীয় বিষয় হ'ল : প্রথম দিকে পরিচ্ছেদ গুলিতে তিনটি কাহিনী ধারার (ভূমি ও দুটি ধারা) দুটি করে নিয়ে বস্ত্র বয়নের মতো করে বুনেছেন শিল্পী। পরে কিছুটা এগিয়ে, এক একটি ধারাকে পর্যায়ক্রমে এগিয়ে নিয়েছেন।

অষ্টম পরিচেছদে ডি গেলোর ভ্রাতুষ্পুত্র গঞ্জালো কারা প্রাচীরের অন্তরাল থেকে মুক্তি পেয়ে নবাব সৈন্যের তাড়া খেয়ে পালিয়ে এসে সোমদেবের হাতে পড়েন।

নবম পরিচেছদে মূল প্রেমের কাহিনীটি বিবর্দ্ধিত করতে হয়েছে। নেশাগ্রস্তের মতো দেবদাসীকে অনুসরণ করতে করতে শঙ্খ রাজপ্রাসাদের ফটকের সামনে দাঁড়িয়ে থেকেছেন কাঙাল ভিক্ষুকের মতো। তাঁকে দেখে উদ্ধব পাণ্ডাও হয়ত কিছু সন্দেহ করে থাকবে। শেষে নিজেকে কোন ক্রমে শান্ত করে দক্ষিণ পাটনে বেরিয়ে পড়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। কাহিনীকে শিল্পী তাঁর পরিকল্পনার পথে চালিত করতে আবার একটি আবর্তের সৃষ্টি করে তাতে গতি সঞ্চার করেছেন। ঝিনুকের মালা কিনতে কিনতে দুই সাধারণ ব্যক্তির কথাবার্তা থেকে শঙ্খ জানতে পারলেন দেবদাসী কোথায় থাকেন। দেবদাসী দেবতার বধূ। বৈষ্ণব গুরু রায় রামানন্দ তাঁর গুরু, নৃত্য-গীতের শিক্ষক। রাজার প্রহরী তাঁর আবাসস্থানের ওপর সদা সতর্ক দৃষ্টি রাখে। শঙ্খ দত্ত সবকিছু উপেক্ষা করে শম্পার প্রাসাদের আনাচে-কানাচে ঘুর ঘুর করতে থাকেন, এবং অবশেষে শম্পার এক দাসী এসে তাঁকে অন্তঃপুরে নিয়ে যায়।

চড়া রোমান্সের সুরে শঙ্খ-শম্পার সাক্ষাৎকারটি বর্ণনা করা হয়েছে। বর্ণনা এবং চিত্রকল্প কবিত্বময়, রোমান্টিক। ভীরুতা দূর হয়ে একটু একটু করে দুঃসাহস উঁকি দিতে থাকে শঙ্খের চরিত্রে ; আর হাস্যে-কথায় সপ্রতিভ শম্পার সৌন্দর্যের প্লাবন-ডাকা তরল হৃদয় সহসা হীরের মতো কঠিন আকার ধারণ করে। নাটকীয় চমক নয়, নাটকীয় পরিস্থিতি। শম্পার কঠিন কণ্ঠের নির্দেশে দাসী আবার শঙ্খকে বাইরে বার করে দিয়ে আসে।

ষোড়শ শতাব্দীর বঙ্গে ব্রাহ্মণ ধর্ম-সংস্কৃতির শাক্ত-তান্ত্রিক প্রভাব ক্রমশ হতমান

হয়ে শ্রীচৈতন্যের বৈষ্ণব প্রেম ধর্ম এক ভাব-বন্যা সৃষ্টি করেছিল। সপ্তম পরিচ্ছেদের এই ইঙ্গিতটি নবম পরিচ্ছেদে উজ্জ্বল রেখায়, ভাবে-ভক্তিতে সুস্পষ্ট শুধু হয় নি, ধর্ম-সংস্কারের যে ভিত্তির একাংশ সোমদেব গঠন করেছিলেন, শ্রীচৈতন্য-রায় রামানন্দ তার অপরাংশ গঠন করেছেন। "একটি সংকীর্তনের দল আসছে। খোল করতালের শব্দে মুখরিত হচ্ছে পথ। দলের মাঝখানে নাচতে নাচতে আসছে একটি মানুষ। চাঁপা ফুলের মতো উজ্জ্বল স্বর্ণাভ তাঁর গায়ের রঙ, কোমরে একটি গৈরিক কটিবাস ছাড়া আর কোন আবরণ নেই। অপূর্ব সুপুরুষ মানুষটি। মুহূর্তের জন্যে মুগ্ধ হয়ে রইল শঙ্খ দত্তের দৃষ্টি।

"ন সো রমণ না হাম রমণী
দুঁহু মন মনোভাব পেষল জানি"

"পথের দুপাশে মন্ত্রমুগ্ধের মতো দাঁড়িয়ে আছে মানুষ। দেখছে এই ভাবাবেগের লীলা।"

দ্বাদশ পরিচ্ছেদে শঙ্খ-শম্পার কাহিনী একটি অভাবনীয় পরিণামের দিকে ছুটে গেছে। উদ্ধব পাণ্ডার মনে শঙ্খের বিসদৃশ আচরণে এবং পুরীধামে অকারণে বসে থাকা সন্দেহের উদ্রেক করেছে। শিল্প-কাহিনীর প্রয়োজনেই এই কৌশল। উদ্ধবের এই সন্দেহই শঙ্খকে একটি আবর্তে পাক খেতে না দিয়ে তাঁকে বেরিয়ে আসতে সাহায্য করেছে। অতএব দক্ষিণ পাটনে যাত্রার পুনরায়োজন করেন শঙ্খ। কিন্তু তাঁর রক্তে যে কামনার আগুন ছড়িয়েছে, তাকে নির্বাপিত করা সহজ নয়। সুতরাং কামোত্তেজনায় শঙ্খ দত্ত দুঃসাহসিক হঠকারিতার পরিচয় দিলেন। এর জন্য প্রয়োজন হয়েছে ছোট্ট প্রশাখার মতো রাঘবের কাহিনীর। তার আসুরিক শক্তি একটি হরিণকে নিয়ে একাই দশজনের মহড়া নেওয়া, প্রভৃতি শঙ্খের মনে সহসা এক দুর্বুদ্ধি জাগিয়েছে। দেবদাসী শম্পাকে রাজার প্রহরী-বেষ্টন থেকে ছিনিয়ে আনার জন্যই যেন তাকে কামনা করেছিলেন। শঙ্খের কামনারই প্রতিমূর্তি রাঘব রাতের অন্ধকারে দেবদাসীকে কোলে করে তুলে এনেছে শঙ্খের বহরে। এখানে এসে কাহিনী একটা ঝাঁকানি খেয়ে গতি পরিবর্তন করল। শম্পাকে দেবতার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে শঙ্খের বহর ভেসে চলল। রাঘবের আসুরিক ক্ষমতার কাহিনীটুকু তাই শিল্পাঙ্গিকের প্রয়োজনেই রচিত।* এতদ্ব্যতীত তদানীন্তনকালের সমাজের চিত্র পরিস্ফুট করতে নিম্নশ্রেণীর সাধারণ মানুষের মধ্যে এই ধরনের শিকারের গল্প, তুচ্ছ জিনিস নিয়ে মারপিট, বন্য বর্বরতা প্রভৃতির বর্ণনা,

* কোথা থেকে যে ওই লোকটা এল—ওই রাঘব। শঙ্খ দত্তের সন্দেহ হয়: ও কখনো ছিল না—শম্পাকে নৌকায় তুলে দেওয়ার পরে একরাশ ধোঁয়ার মতো নিরস্থিত্ব শূন্যতায় মিলিয়ে গেল বুঝি। শঙ্খ দত্ত শুনেছিল, এক রকমের তান্ত্রিক-প্রক্রিয়া আছে—সেই অভিচারের নির্ভুল আচরণ করতে পারলে মানুষের মনের ভেতর থেকেই সৃষ্টি হতে পারে এক কল্প পুরুষ।...তার সাহায্যে যে-কোনো কূট-ক্রূর কামনার নিরাকৃতি চলে। ওই রাঘবকেও তেমনিভাবে সৃষ্টি করেছিল সে।
[চৌদ্দ পরিঃ]

তখনকার প্রথা-সংস্কার রূপে বিবাহাদি শুভকাজে দেবদাসীকে অগ্রবর্তিনী করে শোভাযাত্রার চিত্র [সপ্তম পরিঃ]—এই সব ছোট-খাট প্রশাখার সাহায্যে শিল্পী তাঁর শিল্পাঙ্গিককে বিস্তৃত করেছেন।

চতুর্দশ পরিচ্ছেদে এসে শঙ্খ-শম্পার কাহিনী বিশেষ এক পরিণামে পৌঁচেছে। দেবদাসী শম্পাকে ছিনিয়ে এনেছেন শঙ্খ দত্ত, কাম ও প্রবৃত্তির তাড়নায়। কিন্তু উত্তেজনার বশবর্তী হয়ে এরূপ দুঃসাহসিক কাজ করলেও শঙ্খের বিবেক, মনুষ্যত্ব, তাঁর রুচি, শিক্ষাদীক্ষা,—তাঁর কামোন্মত্ততা ও দেহ-লোলুপতার অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। ঔপন্যাসিকের স্বচ্ছ জীবনদর্শন চরিত্রের গভীরে প্রবেশ করার ক্ষমতা, পাণ্ডিত্য-রূপে শিল্প-কাহিনীর কণ্ঠে ফাঁস হয়ে বসে নি, বিপরীত পক্ষে কাহিনীর ছুটন্ত গতি, অ্যাকশন-ধর্মী করে পাকে পাকে শঙ্খের চরিত্রের গভীরে প্রবেশ করেছে। মানুষ কত তুচ্ছ! তার যতই ঐশ্বর্য, বাহুবল, দর্প-অহঙ্কার থাকুক! অদৃশ্য সেই দৈবশক্তিকে ক্ষমতার মদমত্ততায় মানুষ যতই অলীক মনে করুক, বা তাকে 'চ্যালেঞ্জ' জানাক দুর্জ্ঞেয় সেই অনন্ত শক্তির হাতে সে অতি নগন্য এক খেলনা মাত্র ছাড়া আর কি! ["শঙ্খদত্ত পেছন ফিরে তাকালো। অর্গলবন্ধ না করেই পরম নিশ্চিন্তে শিথিল বসনে আলোক শিখায় নিষ্পাপ মুখখানি প্রদীপ্ত করে নিদ্রামগ্ন। শঙ্খের শরীরে ভয়ের, বিবেকের শীতল স্রোত প্রবাহিত হয়ে গেল। "শম্পার শুভ্র বরণ দেহের সমস্ত রেখাগুলো অবারিত হয়ে আছে তার সামনে। অথচ এ কী হল তার? সাপের মাথার ওপর কোথা থেকে নেমে এল একটা মন্ত্র পড়া শিকড় ?"]

ক্ষুরের ধারার মতো সূক্ষ্ম এক মনস্তাত্ত্বিক পথের ওপর দিয়ে শিল্পী তাঁর কামোন্মত্ত চরিত্রের কাহিনীটিকে অবলীলাক্রমে পার করে নিয়ে এলেন। যেন সার্কাসের মেয়ে একটি সরু তারের ওপর দিয়ে হেলায় সাইকেল চালিয়ে চলে গেল! সীতার অগ্নি-পরীক্ষার মতোই ঔপন্যাসিক তাঁর তীব্র রোমান্টিক কল্পনা এবং উপযুক্ত বাস্তব পরিবেশে মানব চরিত্র বিষয়ে গভীর জ্ঞানের শক্তিতে সুন্দরী নারীর নগ্ন রূপ ও স্থূল দেহজ কামনা-প্রবৃত্তির আগুনের মধ্য দিয়ে শিল্পকে শুচিস্নান করিয়ে নিয়ে এলেন। সীতার জয়ের মতোই আর্টের বিজয়-দুন্দুভি বেজে উঠল। চতুর্দশ পরিচ্ছেদ রচনায় শিল্পীর অসামান্য শক্তিকে অভিনন্দন জানাতেই হয়।

কাহিনী এখানেই শেষ হয় নি। এই পরিচ্ছেদেরই দ্বিতীয় অংশে মূল পর্তুগীজ-কাহিনীকে একটুখানি এগিয়ে নিয়ে এসে শঙ্খ-শম্পার কাহিনীকে একটা ধাক্কা দিয়ে তার গতিপথের পরিবর্তন ঘটানো হয়েছে।

ষড়যন্ত্রে ব্যর্থ হয়ে ভ্যাসকন্‌সেল্‌স্‌ ও কোয়েলহো ফিরে যাচ্ছিলেন। চোখে পড়ল জেন্টুরদের বহর। সে বহর শঙ্খ দত্তের। তাতে নানাবিধ মশলাপাতি ছাড়াও ছিল মোম ও লাক্ষা। আর ছিলেন দেবদাসী শম্পা সহ বণিক শঙ্খ দত্ত। প্রতিশোধ স্পৃহায় অধীর হয়ে তাঁরা শঙ্খের বহরের ওপর কামান দাগলেন। আর্তনাদ-হাহাকারে নৈশ অন্ধকার বিদীর্ণ করে শঙ্খের বহর সমুদ্রগর্ভে ডুবে গেল। কোথায় ভেসে গেলেন শঙ্খ;

আর কোথায় ভেসে গেলেন শম্পা "নোনা জলে হারিয়ে যেতে যেতে শঙ্খ দত্তের শুধু একটা কথাই মনে হল : শম্পা ? শম্পার কী হবে ? তাকে কি এইবার রক্ষা করতে পারবেন জগন্নাথ, পারবেন "কৃষ্ণ-চৈতন্যমীশ্বরম ?"

এইভাবেই মানুষের পৌরুষ অহঙ্কার, তার ঐশ্বর্য, পাপ অদৃশ্য শক্তি ঈশ্বরের হাতে খেলনার মতো ভেঙে টুকরে টুকরো হয়ে গেল। এইভাবেই করুণাময় তাঁর ভক্তকে. আশ্রিতকে দর্পীর হাত থেকে ছিনিয়ে নিলেন।

চতুর্দশ পরিচ্ছেদের 'সাব-টাইটেল' "Al diablo que te doy"—শিল্প-কাহিনীর পরিকল্পনাটিকেই স্পষ্ট করে তোলে। শঙ্খ দেবতার কাছ থেকে শম্পাকে হরণ করে এনে অহঙ্কার করেছিলেন : দারুব্রহ্ম জগন্নাথ কী পারলেন দেবদাসীকে রক্ষা করতে ? প্রত্যুত্তরে শম্পা তাঁকে জানিয়ে দিয়েছিলেন : রাজার প্রহরীদের হাত থেকে তাঁর নিস্তার নেই। "কিন্তু তাঁর চাইতেও শক্তিমান মন্দিরের প্রধান পুরোহিত। কালপুরুষের মতো তাঁর দৃষ্টি—পৃথিবীর যে-প্রান্তেই তুমি পালাও সে দৃষ্টি তোমাকে অনুসরণ করবে।" শম্পার কণ্ঠে যেন দেবতারই রোষ পর্তুগীজ 'এপিগ্রাফ'টির সাহায্যে ধ্বনিত হচ্ছে : শয়তান নিক তোকে। অপরদিকে নবাব ও মুরদের হাতে লাঞ্ছিত-বন্দী ডি মেলোর জন্য প্রতিশোধে উন্মত্ত-প্রায় কোয়েলহো ভ্যাসকনসেলস জেণ্টুদের বহর দেখে যখন বলেন : 'শয়তান নিক তোদের'—তখন দুটি কাহিনী আর পৃথক থাকে না। একই পরিণামের ভাবসূত্রে গাঁথা পড়ে যায়।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদের গুরুত্ব শুধু মাত্র শিল্পকাহিনীর গঠনের দিক থেকেই নয়, কল্পিত কাহিনীর দুটি প্রধান চরিত্রের—শঙ্খ দত্ত ও দেবদাসী শম্পা—জীবন গতিপথ পরিবর্তিত হয়ে গেছে। এখান থেকেই এই চরিত্র দুটি নিজ নিজ পরিণামের দিকে পৃথক পথে ছুটে গেছে।

॥ শাখা কাহিনী : (গঞ্জালো-সুপর্ণা) ॥

শঙ্খ-শম্পার প্রেম-কাহিনীর পাশে পাশে আর একটি প্রেমাংকুরের ছোট্ট ট্রাজিক কাহিনী দুটি কাহিনী-স্তম্ভের মধ্যে শিরোভূষণ-মাল্যের মতো জড়িয়ে আছে। এ কাহিনী গঞ্জালো-সুপর্ণাকে নিয়ে। অষ্টম পরিচ্ছেদে ডি মেলোর ভ্রাতুষ্পুত্র কিশোর গঞ্জালো নবাবের কারাপ্রাচীরের অন্তরাল থেকে মুক্তি লাভ করে সোমদেবের হাতে এসে পড়েছে। ইতিহাসে উল্লেখ আছে এ কাহিনীর। উল্লেখ আছে কেমনভাবে ব্রাহ্মণেরা তাকে মহাকালীর কাছে বলী দিয়েছেন। ঔপন্যাসিক ইতিহাসের এই গৌণ ঘটনাকে কবির কল্পনায় অসামান্য এক শিল্পমূর্তি দান করেছেন—কাহিনীটি সমগ্র শিল্পাঙ্গিকের অলঙ্কার হয়ে উঠেছে।

দশম, একাদশ, এবং ত্রয়োদশ—মূলতঃ এই তিনটি পরিচ্ছেদে গঞ্জালো-সুপর্ণার প্রেমাংকুরের উপকাহিনী মুক্তোর মতো টলটল করছে। এই উপকাহিনী উদ্ভূত হয়েছে প্রধানতঃ সোমদেব-রাজশেখর-শঙ্খ দত্ত মিলে বঙ্গে বিদেশী শাসন বিষয়ে রাজনৈতিক

চিন্তা-ভাবনার যে বৃহৎ একটি শাখা দেখা দিয়েছে, তারই অঙ্গ থেকে, এবং গিয়ে মিশেছে একদিকে পর্তুগীজ-ইতিহাস-কাহিনী, এবং অপরদিকে কল্পিত প্রেমকাহিনীর অংশে।

সোমদেব চেয়েছিলেন বিধর্মী বিদেশী শাসকের হাত থেকে দেশের শাসনভার কেড়ে নিয়ে, হিন্দুর রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে। এর জন্য দেশের বৈশ্য-ক্ষত্রিয়-শূদ্র-সকলকেই ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। মুসলমানী শাসনে তারা পরম নিশ্চিন্তে যে ঘোর মোহ-নিদ্রায় মগ্ন, সেই নিদ্রা তাদের ভাঙাতে হবে, জাগাতে হবে সকলকে। এই দুর্দিনে খর্পরধারিণী করালবদনা মহাকালীর প্রতিষ্ঠা চাই, তাঁর পূজা সম্পন্ন করতে বলী চাই। বলীর রক্ত ছাড়া তাঁর পূজো সম্পন্ন হয় না,—মা জাগেন না। দেশের শত্রু, জাতির শত্রু সেই বিদেশীর নর রক্তই হবে শ্রেষ্ঠ বলী! এ হেন অবস্থায়, প্রাণভীত গঞ্জালো এসে এঁরই হাতে পড়ল। সোমদেব ভাবলেন, স্বয়ং মহাকালীই তাঁর বলী-উপচারের আয়োজন বুঝি করলেন। গঞ্জালোকে তিনিই পাঠিয়ে দিয়েছেন তাঁর কাছে। সানন্দে তিনি গঞ্জালোকে নিয়ে শ্রেষ্ঠী রাজশেখরের গৃহে গোপনে রাখতে আদশ দিলেন। শুভদিনে মায়ের পুজো নিষ্পন্ন করতে হবে। দশম পরিচ্ছেদে ঔপন্যাসিক রাজনৈতিক এবং ধর্মীয় চিন্তাকে অবিচ্ছেদ্যরূপে কাহিনী-দেহে সম্পৃক্ত করে দিয়েছেন। গঞ্জালো বিধর্মী বিদেশী; বঙ্গের সিংহাসনের ওপরেই বুঝি পর্তুগীজদের লোভ। তাদেরই একজনকে বলী দিয়ে মায়ের পুজো নিষ্পন্ন করতে পারলেই তাঁর আশীর্বাদে হিন্দুরাজ্য প্রতিষ্ঠা সহজ হয়ে যাবে। অতএব বলীটিকে সযত্নে রক্ষা করতে তিনি রাজশেখরের গৃহেই তাকে রাখলেন।

রাজশেখরের বনেদী আমলের প্রাসাদ এবং তার জীর্ণ ফাটল-বিশিষ্ট কক্ষাদির বর্ণনা জঙ্গলাকীর্ণ পরিবেশ, নবাবের অশ্বারোহী সৈনিকের আগমন, মধ্যযুগের আবহাওয়া তৈরী করেছে। যে যুগে ছিল তান্ত্রিকদের বীভৎস এই সাধন-পদ্ধতির কুসংস্কার। একটা ছমছমে রহস্যের আবরণ দৃশ্যটার ওপর ছড়িয়ে পড়তে থাকে। এরই মধ্য থেকে, নির্বাপিত হওয়ার আগে দীপশিখা যেমন একবার উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, সেইরূপ গঞ্জালোও সহসা উজ্জ্বল হয়ে উঠল। প্রাসাদের ছাদে যেদিকে রাজশেখরের কন্যা সুপর্ণা দাঁড়িয়ে ছিল, একটি বুলবুল পাখীর শিস অনুসরণ করে জীর্ণ কক্ষে বন্দীপ্রায় গঞ্জালোর দৃষ্টি গিয়ে পড়লো সেইখানে। সুপর্ণার দৃষ্টির সঙ্গে সে দৃষ্টি মিলিত হ'ল। সুপ্রভাত জানাচ্ছে গঞ্জালো সুপর্ণাকে! সুপর্ণাকে তার মনে হ'ল Bonito!—সুন্দর। সুপর্ণা দেখলো কিশোর সুন্দর এক বিদেশীকে। অদ্ভুত তার বেশবাস। "মাথায় চুল নয়—যেন একগুচ্ছ সোনা। কিশলয়ের মতো গায়ের রঙ।"

বিষাদ—গম্ভীর, মন্থর কাহিনীতে প্রাণের সামান্য দোলা লাগল। কাহিনী প্রসন্নগতি পেল। সহসা নবাবের অশ্বারোহী সৈন্যের আগমনে রাজশেখরের বুকে ভয়ের হাতুড়ী পড়ে, কাহিনীতেও উত্তেজনার তরঙ্গ ছড়ায়; তার গতি চঞ্চল হয়। ছোট ছোট তরঙ্গ তুলে শিল্প-কাহিনী বেশ দ্রুত ছুটে চলে।

রাজশেখরকে জিজ্ঞেস করেও সুপর্ণার কৌতূহল মেটে না। সেই অদম্য কৌতূহলই

কাহিনীতে আবার একটি তরঙ্গের মতো মাথা উঁচু করল। নির্জন দুপুরে একান্ত সন্তর্পণে সে গঞ্জালোর পিছনে এসে দাঁড়ালো। শিল্প-কাহিনীতে উদ্যতমুখ-কৌতূহল জাগিয়ে দশম পরিচ্ছেদ শেষ হয়েছে।

একাদশ পরিচ্ছেদের দ্বিবরীয়ভাগেও ঔপন্যাসিক এই কৌতূহল ধরে রাখতে দেন পাঠককে। তাঁর প্রয়োজন প্রেমের অঙ্কুরোদ্গমের আড়ালে নিষ্ঠুর ষড়যন্ত্রের বিষয়টিকেও পাকা করে নেওয়া। একাদশ পরিচ্ছেদে রাজশেখরের সমস্ত অসম্মতি, বিবেক, নৈতিকতাকে গুঁড়িয়ে দিয়ে, গুরু সোমদেব তাঁর অভীষ্ট কর্মে তাঁকে সম্মত করলো। শিল্পী সেই অভিপ্রায়টি ব্যক্ত না করে, একটি রহস্যের ঘন ছায়ায় কাহিনীকে ঢেকে দিলেন। ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদে যাতে নাটকীয় তুঙ্গে কাহিনীকে তুলে এনে পাঠককে বিস্ময় বিমূঢ় করে দিতে পারেন; এবং কাহিনী লাফাতে লাফাতে এক প্রসঙ্গ থেকে ভিন্ন প্রসঙ্গে অনায়াসে প্রবেশ করতে পারে। এটাই তাঁর শিল্পকৌশল। প্রসঙ্গচ্যুতির কোন ফাঁক ধরা যাবে না, কোন জোড়া-পট্টি চোখে পড়বে না।

কিন্তু সেই ষড়যন্ত্রের নিষ্ঠুর পরিকল্পনা, এবং ট্র্যাজিক পরিণামজনিত পাঠক হৃদয়ের রস-বিমোক্ষণ (purgation) করতে শিল্পী ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদে আগে পাঠকের অন্তরে জাগা উদ্যতমুখ-কৌতূহলটির পরিনিবৃত্তি করলেন। প্রেমের উদ্গত অঙ্কুরের দুটি ছোট্ট পর্ণ আকাশের আলোর দিকে হাত বাড়ালো। এই পরিচ্ছেদের এপিগ্রাফে' গঞ্জালোর কণ্ঠেব সুরই ধ্বনিত হ'ল : "Tenho minha pequena"— 'তুমি আমার বান্ধবী'। সুপর্ণা মুগ্ধ হাসিতে অন্তরে গ্রহণ করল এ বাণীর সত্য। দু'জনের ভাষা আলাদা, জীবনযাত্রা আলাদা, শিক্ষা-দীক্ষা-ধর্মচিন্তা আলাদা; তবু অসুবিধা হ'ল না। দুজনের প্রেমের ভাষা আলাদা; তবু দেশ-কাল-শিক্ষা-ধর্ম—সব গণ্ডী অতিক্রম করে হৃদয়ে হৃদয়ে এক অদৃশ্য বন্ধনে সূক্ষ্ম ভাবে বাঁধা পড়ে গেল দুটি কিশোর প্রাণ। ফল-জল-মিষ্টি আনে সুপর্ণা। ঘন নীল আকাশ, পাখীর গান, সূর্যের হিরণ-কিরণ—এ-প্রেমের উদ্দীপন বিভাবের কাজ করে। আস্তে আস্তে রোমান্টিক প্রেমের মাধুর্য ও সৌন্দর্য এসে স্থান ও কালের রেখাটিকে মুছে দেয়। শিল্প-কাহিনীর 'ডিজাইনটিকে' ঔপন্যাসিক এমন স্থিতিস্থাপক করে বুনেছেন যে, প্রয়োজনে তা বিপুল-বিস্তৃতি নিতেও পারে, এবং তাতে 'থীমে'র রসহানি ঘটে না; বরং অসামান্য সৌন্দর্যে ও মহিমায় দীপ্ত হয়ে ওঠে। সুন্দর প্রকৃতির পটভূমিকায় সুপর্ণার স্পর্শ পেয়ে ঘটনাস্থল বঙ্গের একটি ছোট সহর চাকারিয়ার আকাশ ছাড়িয়ে গঞ্জালোর মন চলে যায় সুদূর পর্তুগালে! "খুব ছেলেবেলায় একবার সে বেড়াতে গিয়েছিল আলেমতেজোর জঙ্গলে। জলপাই, শোলার বন আর গোলাপ ফুলে ছাওয়া সে জঙ্গল তার মন ভুলিয়েছিল, তবু এ দেশের সঙ্গে তার কত তফাৎ! শাদা মার্বেলের পাহাড়ের চাইতে কত আশ্চর্য অফুরন্ত ঘাসে ছাওয়া এ দেশের মাটি।"

আনন্দের উজ্জ্বল আলোর ওপর সহসা শঙ্কার মেঘ ছায়া ফেলে। সোমদেবকে দূরে দেখে গঞ্জালোর মনে অজানা শঙ্কা জাগে; বিষণ্ণ হয়ে যায় সে। আবার ভুলে

বার যখন এক ঝলক খুশীর হাওয়ার মতো সুপর্ণা এসে দাঁড়ায়। এইভাবে চলে কয়েকদিন নেশার খেলা। ঘটনাকে ধাপে ধাপে শিল্পী প্রস্তুত করে নিলেন নাটকীয় একটি মুহূর্ত তৈরী করে নিতে। তারপরই এক টানে তাকে শীর্ষে তুলে এনেই অপ্রত্যাশিত পতন। পাঠক বিস্ময়ে অভিভূত হন।

অমাবস্যার রাত আসে। রাজশেখরের বুকে ক্ষোভ আর অস্বস্তি। চোখের সামনে যেন প্রকাণ্ড একটা সর্বনাশকে উদ্যত দেখছেন তিনি। ঘুমোতে পারে না সুপর্ণা। কিসের অস্বস্তিতে! রাজশেখর-এর আচারে-আচরণে অস্বাভাবিকতা, কণ্ঠস্বর কাঁপা। সুপর্ণা বার বার পিতাকে জিজ্ঞেস করেন তাঁর কী হয়েছে। অবশেষে কন্যাকে স্তোক-বাক্য দিয়ে রাজশেখর চলে যান মন্দিরে যেখানে গুরু সোমদেব মহাকালীর পুজোর আয়োজন করেছেন। এগুলি সবই কাহিনী-দেহে ব্যঞ্জনা, ইঙ্গিতময়তা, কৌতূহল সৃষ্টি করে।

অমাবস্যার ঘন অন্ধকার। স্তম্ভিত অরণ্য। "স্তব্ধ রাত্রির ওপর দিয়ে সোমদেবের মন্ত্রোচ্চার ভেসে চলল—পার হল পুরোনো মহল—এসে পৌঁছুল সুপর্ণার ঘরে।" জেগে উঠল সুপর্ণা। আকুল স্বরে পিতাকে ডাকল। তারপর ছুটে গেল মন্দিরে বেদীর সামনে, যেখানে রক্তের নদীতে গঙ্গালোর ছিন্ন মুণ্ড কালী মূর্তির পদতলে গড়িয়ে পড়ে আছে। আকাশ-ফাটানো আর্তনাদ তুলে সুপর্ণা মাটিতে অজ্ঞান-অচৈতন্য হয়ে আছড়ে পড়ল।

রহস্যে-রোমাঞ্চে নাটকীয় মুহূর্ত রচনায় এবং তুরগের মতো লাফ দিয়ে ঘটনা তীব্র গতিতে পরিণতির দিকে ছুটে চলায়, ত্রয়োদশ এবং চতুর্দশ এই দুটি পরিচ্ছেদে দুটি প্রেম-কাহিনীর 'ক্লাইম্যাক্স' রচনা করেছে। অতঃপর পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ থেকে বঙ্গের দুর্যোগময় ইতিহাসের ঘনঘটায় কালের রথ সবকটি ঘটনা ও কাহিনীকে তার দড়ির সঙ্গে বেঁধে নিয়ে নিয়তির অমোঘ নির্দেশে দুর্মদ গতিতে ছুটিয়ে নিয়ে গেছে দুর্জ্ঞেয় লক্ষ্যাভিমুখে। পর্তুগীজ ইতিহাস কাহিনী এবং কাল্পনিক প্রেমের কাহিনী —উভয়েরই গতিপথ পরিবর্তিত হয়ে একটি লক্ষ্যের দিকে এগিয়েছে।

॥ মূল ইতিহাস-কাহিনীর দ্বিতীয় অধ্যায় ॥

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ শুরু হচ্ছে—চাকারিয়ার কারাগার থেকে ডি মেলোর গোয়ায় প্রত্যাবর্তনের চার বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর। ডি মেলো কাহিনীর দ্বিতীয় অধ্যায়, যেন এখান থেকেই বাঁক নিয়ে পরিণতির দিকে এগিয়ে গেছে। বঙ্গের ইতিহাস-কাহিনীর ঘূর্ণিপাক আস্তে আস্তে শান্ত হয়ে আসে। পর্তুগীজ কাহিনীর সঙ্গে মিলিত হয়ে চরম পরিণামের দিকে প্রবাহিত হয়। বিংশ পরিচ্ছেদে কাহিনী লক্ষ্যের তট পেয়েছে। একাদশ পরিচ্ছেদে সাহাবুদ্দিন প্রশাখা-কাহিনীর যে প্রান্তভাগ ঝুলছিল, তার প্রয়োজন ঔপন্যাসিক পঞ্চদশ পরিচ্ছেদে সমাপ্ত করলেন। ডি মেলোকে সাহাবুদ্দিন চট্টগ্রাম বন্দরে সঙ্গে করে নিয়ে এলেন। 'পোর্টো গ্রাণ্ডি'—ভাস্কো থেকে ডি মেলো পর্যন্ত স্বপ্নের

দেশ বঙ্গের শ্রেষ্ঠ বন্দরে উপনীত হলেন ডি মেলো। এখানকার শাসনকর্তা নবাব তাঁকে বরাভয় ও আশ্বাস দিলেন, এবং গৌড়েশ্বর মামুদ শার দরবারে দূত পাঠিয়ে বাণিজ্য করার অনুমতি প্রার্থনা করতে বললেন।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদের দ্বিতীয় অংশে বঙ্গের শ্যামল প্রকৃতি, তার আলো-বাতাস-আকাশ, তার আটচালা-ধর্মমন্দির-মসজিদ-মঠ, তার গান, রূপকথার বর্ণনায় ঔপন্যাসিক রোমান্টিকতার আবেশ টেনে দিয়েছেন। পরবর্তী পরিচ্ছেদগুলিতে এই বঙ্গের মাটিতে রাজনৈতিক ঝঞ্ঝা যে ভাবে আছড়ে পড়েছে, যে লোভ-হিংসা-হানাহানিতে রক্তাক্ত হয়েছে মাটি, তার পূর্বেকার এই শান্ত, সরল, সহজ জীবনের ছবি না থাকলে বঙ্গের প্রকৃত রূপটি ঢাকা পড়ে যেত। শিল্পী বঙ্গের এই শান্ত-মধুর মনোহর-স্নিগ্ধ রূপের সূত্র ধরে ইয়োরোপের ও পৃথিবীর অন্যান্য প্রান্তের কঠিন-কঠোর-রুদ্র-ভয়ঙ্কর রূপটিকে মিলিয়ে নিয়েছেন,—পর্তুগীজ দূত, দুয়ার্তে আজেভেদোর চিন্তার মধ্য দিয়ে: "কতদূর সমুদ্র পার হয়ে আসতে হয়েছে এদেশে! চঞ্চল আটলান্টিকের কোলের মধ্যে সেই 'আজোর' দ্বীপ……যেখানে হঠাৎ দেখা দেয় 'হোল'—ঝড় নেই বৃষ্টি নেই, শান্ত নির্মল আকাশের তলায় হঠাৎ বিরাট তরঙ্গোচ্ছ্বাস হয় সমুদ্রে—পাড়ের কাছে জাহাজ থাকলে টুকরো টুকরো হয়ে যায়! কোথায় সেই 'মেদিরা'—যেখানে একদিকে গুচ্ছ আঙুরের কোমলতা, অন্যদিকে বিরাট রুক্ষ পাহাড়ের বুক চিরে রাক্ষস গর্জনে ঝর্ণা নেমে আসে।…… আসেনসন কাবে টরমেন্টোসো মাদাগাস্কার, আফ্রিকার হিংস্র উপকূল। লোহিত সাগর আরব সাগর। গোয়া, দিউ, কালিকট, সিংহল—বেঙ্গালা! এ যেন জন্ম জন্মান্তর পাড়ি দিয়ে আসা।…" প্রকৃত ঐতিহাসিক উপন্যাসে দেশ-কালের বন্ধনকে স্বীকার করেও শিল্পী সে বন্ধন ছিন্ন করে বিপুল-বিরাটের অঙ্গীভূত করেন তাকে। 'পদসঞ্চার' উপন্যাসে বার বার ঔপন্যাসিক তাঁর কাহিনীকে বিশেষ দেশ ও কালের বলয় অতিক্রম করে নিয়ে গেছেন। পঞ্চদশ পরিচ্ছেদের শিল্পরূপেও সেই চেষ্টাকে আর একবার সার্থক হতে দেখি।

বঙ্গের শাসনব্যবস্থা এবং রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে 'পদসঞ্চার' উপন্যাসের মূল ভিত্তিরূপে গঠন করা হয়েছে। প্রথম পরিচ্ছেদে যে পরিস্থিতির সামান্যতম ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে, পঞ্চদশ পরিচ্ছেদে ইতোপূর্বের ধর্মসংস্কৃতির গঠিত ভূমিকে বঙ্গের শাসনব্যবস্থা ও রাজনৈতিক পরিস্থিতির বাস্তব রূপটির সাহায্যে সুগঠিত করা হ'ল। হোসেনশাহী বংশের শেষ সুলতান ভোগ-বিলাসী, অকর্মণ্য-অপদার্থ মামুদ শা, ফিরোজ শার রক্তে হাত কলঙ্কিত করে নারী-সুরা নৃত্যগীত নিয়েই দিনগুলি অতিবাহিত করতে থাকেন। শাসন ব্যবস্থার দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে ফিরোজ হত্যার প্রতিশোধ স্পৃহায় প্রতিবেশী দু'একটি রাষ্ট্রের সঙ্গে বিরোধ সৃষ্টি হয়। বিহারের শাসনকর্তা শের খাঁ বঙ্গের ওপর থাবা উদ্যত করেন সুযোগ বুঝে। দিল্লীর সম্রাট হুমায়ুনেরও দৃষ্টি পড়ে বঙ্গের ঐশ্বর্যের ওপর। এরূপ পরিস্থিতিতে পর্তুগীজ দূত দুয়ার্তে আজেভেদো তাঁর দরবারে উপস্থিত হয়ে যে উপঢৌকন দিলেন তা সুলতানের কাছে রীতিমত অপমানকর। কারণ, উপঢৌকনের

গোলাপজলের শিশিগুলি পারস্য বণিকের জাহাজ লুটের সামগ্রী। ফলে দূতকে কোতল করার আদেশ দিলেন ক্রুদ্ধ গৌড়াধিপ। কিন্তু উজীর এবং সুলতানের উপদেষ্টা আল্‌ফা হাসানী তাঁকে বর্তমান সংকটের কথা মনে করিয়ে দিয়ে, পর্তুগীজদের সঙ্গে বিরোধ পাকিয়ে নতুন শত্রু সৃষ্টি করতে নিষেধ করেন। কিন্তু মামুদ শা তখন হিতাহিত জ্ঞানশূন্য। মূল কাহিনী বৃক্ষদুটিকে শাখা-প্রশাখা সমেত পরিবর্ধিত করে নিয়ে এবার শিল্পী কাহিনী-ভূমির গঠন পারিপাট্যে মন দিয়েছেন। যে শিল্পরীতিতে তিনি পূর্বকাহিনী দুটির মধ্যে ধীরে ধীরে নাটকীয় মুহূর্ত সৃষ্টি করে তারপর সহসা একটা লাফ দিয়ে 'ক্লাইম্যাক্সে' উপনীত হয়েছেন এবং কাহিনী দ্রুত গড়িয়ে গেছে পরিণতির দিকে,—এখানেও তিনি সেই একই কৌশলে অত্যন্ত নিপুণতার সঙ্গে উজীর ও আলফা হাসানীর সুলতানকে অনুরোধ করার মধ্য দিয়ে একটি নাটকীয় মুহূর্ত প্রস্তুত করে নেন। বুদ্ধিভ্রষ্ট মামুদ শা সে কথায় যখন কান দিলেন না ; সমগ্র ঘটনাটিকে সহসা ক্লাইম্যাকসে পৌঁছে দিলেন ঔপন্যাসিক, জনৈক ফকিরের অপ্রত্যাশিত আবির্ভাবে। নাটকীয় চমকে সেই কালো আল্‌খাল্লায় ঢাকা তুষার শুভ্র শ্মশ্রু-কেশ ফকির বললেন : "না মামুদ, না! ফিরোজের রক্তমাখা সিংহাসনে বসে প্রতি মুহূর্তে তুমি ছটফট করে জ্বলে মরছ। মূর্খ, আরো রক্ত ঝরাতে চাও?" অতঃপর ঘটনার মোড় ঘুরলো। কিন্তু শিল্পী কাহিনীর গতিশীলতা বজায় রাখতে এবং পাঠকের কৌতুহল ধরে রাখতে ঘটনাকে ঐখানে স্তব্ধ করে দিয়ে সপ্তদশ পরিচ্ছেদে তাকে টেনে নিয়ে গেছেন।

ইত্যবসরে ষোড়শ পরিচ্ছেদে সোমদেবের রাজনৈতিক চিন্তার শাখাটিকে এগিয়ে নিয়ে পূর্ণাবয়ব দান করতে চাইলেন। সোমদেব চরিত্র থেকে দুটি কাহিনী উদ্ভূত হয়েছে : একটি ধর্মসংস্কৃতির কাহিনী, এবং অপরটি দেশের রাজনৈতিক পরিবর্তনের দিক। ধর্মীয় অবস্থার দিক থেকে ক্ষয়িষ্ণু-মূল ব্রাহ্মণ্য শাক্ত-তান্ত্রিক ধর্ম-সাধনাকে আচ্ছন্ন করে শ্রীচৈতন্য প্রবর্তিত বৈষ্ণব প্রেমধর্মের প্রতিষ্ঠার কাহিনী বঙ্গদেশের ইতিহাস-কাহিনীর ভিত্তিভূমিরই অঙ্গ স্বরূপ। ষোড়শ পরিচ্ছেদে এই বৈষ্ণব প্রেমধর্ম কি ভাবে বঙ্গের হৃদয় জয় করে নেয়, তারই চিত্র সোমদেব, মালিনী এবং ভক্ত শিষ্য কেশব পণ্ডিতের মত-বিনিময়ের মধ্য দিয়ে শিল্পিত হয়েছে। মালিনী ঐতিহাসিক চরিত্র না হলেও, শাক্ত কেশব পণ্ডিতের কিংবা তেইশ পরিচ্ছেদের শাক্ত বণিক উদ্ধরণ দত্তের শ্রীচৈতন্যের ভক্ত হওয়ার ঘটনা ঐতিহাসিক। 'পদসঞ্চার'-এর শিল্প-কাঠামো বিশাল-বিস্তৃত হতে পেরেছে ইতিহাসের সঙ্গে দেশের ধর্ম-সংস্কৃতিকে যুক্ত করে, দেশের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অবস্থাকে কাহিনীর অঙ্গীভূত করে। ষোড়শ পরিচ্ছেদে ভক্ত-শিষ্য পরিত্যক্ত সোমদেবের একাকীত্ব যেমন তাৎপর্যপূর্ণ হয়েছে, কাহিনীর ওপর একটি বিষণ্ণ সুর-মূর্ছনা ছড়িয়েছে, তেমনি অপরদিকে মহাপ্রভুর ইহলীলা সংবরণের ঐতিহাসিক ঘটনার প্রকাশে তাঁর ভক্ত মণ্ডলীর মধ্যে ভাবান্দোলন ঐতিহাসিক ভাবপরিমন্ডলে সমগ্র কাহিনীকে বেশ দৃঢ়ভাবে বেঁধে ফেলেছে।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদে মামুদ শার ঘটনা যে কৌতূহল জাগ্রত করেছিল সপ্তদশ পরিচ্ছেদে

তার অবসান হ'ল। মামুদ শা বুঝলেন তিনি ভাঙনের বালুচরে বসে আছেন। যে কোন বড় তরঙ্গ এসে তাঁকে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। একদিকে ক্রীশ্চান অপর দিকে হুমায়ুন। এ দুয়ের মাঝখানে শের খাঁ। বাঙলার ওপর শের-এর দাঁত বসেছে। দূত আজেভেদোকে অনুচরসহ বন্দী করার আদেশ দিলেন মামুদ এবং চট্টগ্রামে ডি মেলো ও তাঁর দলবলের প্রতিও অনুরূপ আদেশ দেওয়া হ'ল। পর্তুগীজ ইতিহাসের মূল কাহিনীতে এখানে একটি উপকাহিনী এসে যুক্ত হয়েছে। গৌড়েশ্বরের আদেশে অনুচর সহ ডি-মেলোকে বন্দী করা গুয়াজিলের ষড়যন্ত্রের ঐতিহাসিক ঘটনাটিকেই নাটকীয় রূপে মূলকাহিনীর সঙ্গে যুক্ত করায় কাহিনীতে বৈচিত্র্য এবং গতি দুই-ই এসেছে। এই পরিচ্ছেদে বঙ্গের ব্যবসাবাণিজ্য ও অর্থনৈতিক চিত্র বঙ্গের ইতিহাসের পূর্ণরূপ তুলে ধরতেও সাহায্য করে।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদে মূল প্রেম-কাহিনীকে সম্পূর্ণতা দানের আয়োজন করেছেন। দুই ভাগ্যহত নায়ক-নায়িকা—শঙ্খ দত্ত ও সুপর্ণার এই প্রথম সাক্ষাৎ হ'ল। গঞ্জালোর বীভৎস হত্যাকাণ্ড দেখে সুপর্ণা জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়ে। পরে জ্ঞান ফিরলেও স্মৃতি-ভ্রংশ ও বাক্‌রহিত হয়ে যায় সে। রাজশেখর কৃতপাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে এবং কন্যাকে সুস্থ-স্বাভাবিক করতে তীর্থে তীর্থে দেবতার চরণে ধর্ণা দিয়ে ফিরছেন। অপরদিকে, কোয়েলহোর কামানে বিধ্বস্ত নৌবহর থেকে শঙ্খ-শম্পা ভেসে গিয়েছিলেন। গঙ্গাসাগরের নিকটবর্তী এক গ্রামের ভগ্নমন্দিরে এসে আশ্রয় নিয়েছিলেন শঙ্খ। অষ্টাদশ পরিচ্ছেদে পিতৃবন্ধু রাজশেখরের সাক্ষাৎ পেলেন তিনি। প্রেমের কাহিনী, এবং ধর্ম ও রাজনৈতিক মতাদর্শের কাহিনী এক দেহে মিশে গেল। সোমদেবের ভ্রান্ত রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভের আশার কথা উভয়ে আলোচনা করলেন। বাক্যহারা, স্মৃতিহারা সুপর্ণাকে শঙ্খ শুধু দেখলেনই না, তার সব দায়িত্ব গ্রহণ করতে চাইলেন। শঙ্খ-শম্পার প্রেমকাহিনীতে তৃতীয় বিন্দুরূপে দেখা দিল সুপর্ণা। শঙ্খ ও সুপর্ণার বিন্দু দুটি অস্পষ্ট রেখায় যুক্ত হয়, কারণ, সুপর্ণার হৃদয় এখনও জাগে নি।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদের শিল্পরূপ অনেকটা চতুর্দশ পরিচ্ছেদেরই অনুরূপ। দুটি পরিচ্ছেদেই শিল্পী, কাহিনীর গতির রাশ টেনে ধরেছেন। কাহিনী চরিত্রের গভীরে প্রবেশ করেছে। চতুর্দশে শঙ্খ দত্তের চরিত্র, ঊনবিংশে সুলতান মামুদ শার চরিত্র—উভয়ক্ষেত্রেই কাহিনী হৃদয়ের গভীরে প্রবেশ করেছে এবং মানব চরিত্র সম্পর্কে শিল্পী গভীর জ্ঞানের পরিচয় দিয়ে তাঁর শিল্পকর্মকে শুধুই ব্যাপ্তি দেন নি, তাকে গভীর ও মনন-ঋদ্ধ করেছেন। ফিরোজ হত্যার পাপের প্রায়শ্চিত্ত শুরু হয়েছে মামুদ শার। ফিরোজের প্রেতচ্ছায়া তাঁকে ঘিরে রয়েছে। অনুশোচনার বৃশ্চিকদংশনে সর্বশরীর ও মনে তাঁর জ্বালা। ফিরোজের প্রেতাত্মা রক্তমুখী হয়ে প্রতিশোধ গ্রহণে বুঝি তৎপর হয়েছে। তাই শুরু হয়েছে তাঁর পরাজয়ের পালা। সর্বনাশের কিনারে এসে দাঁড়িয়েছেন তিনি। শের খাঁর কামড় বঙ্গের ওপর চেপে বসেছে সুরজগড়ের যুদ্ধে। সেনাপতি ইব্রাহিম খাঁর পরাজয়ের সংবাদ এসে না পৌঁছালেও উজীর এসে জানিয়েছেন : "কামান

আর ক্রীশ্চান সৈন্য নিয়ে ন' খানা পর্তুগীজ জাহাজ এসেছে চট্টগ্রামের বন্দরে।" বিপদের ওপর বিপদ, অতএব ক্রীশ্চানদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করাই এখন একমাত্র পথ। ঘরময় একাকী মামুদ শা পায়চারী করতে থাকেন—যন্ত্রণায় তাঁর অন্তর-বাহির ক্ষতবিক্ষত।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদের 'সাব টাইটল্' Tenho minha pequena" বিংশ পরিচ্ছেদে সামান্য পরিবর্তিত হয়েছে: "Tenho mina tenho mina !"—অর্থাৎ, 'তুমি আমার, তুমি আমার!' কিশোর গঞ্জালো এবং কিশোরী সুপর্ণার প্রেমের আলোক-পিপাসু সেই নবীন পর্ণদুটি ঘাতকের পদে দলিত হয়ে গেলেও, তার কোমল, স্নিগ্ধ সৌরভ এখনও নির্বাক সুপর্ণার মনের ওপর ভোরের কুয়াশার মতো স্তব্ধ দাঁড়িয়ে আছে। রাজশেখরের নৌকা গঙ্গাসাগর তীর্থে উপনীত হ'ল। তীর্থফল আশীর্বাদ হয়ে যদি সুপর্ণার বাকশক্তি ফিরিয়ে দেয়—এই আশায়। কিন্তু সমুদ্রজলের দিকে স্থির-দৃষ্টি সুপর্ণার কোন জীবন লক্ষণ ফোটে না। শঙ্খের আহ্বান তাকে বিচলিত করে না, স্নায়ু কোষে কোন তরঙ্গ ওঠে না। শম্পার মতোই সুপর্ণাও "ধরা ছোঁয়ার বাইরে চলে গেছে বলেই সে আরো বেশি অপরূপ।" শঙ্খের মনে হয়, "শুধু শম্পা নয়—সুপর্ণাও সুন্দর।" এই তুলনার মধ্য দিয়ে শম্পা ও সুপর্ণার মধ্যে একটি যোগ সাধিত হয়, এবং মূল প্রেম-কাহিনীর শঙ্খ-শম্পা-সুপর্ণার ত্রিভুজটিও গঠিত হয়ে যায়।

গঙ্গাসাগর—কপিল মুনির হাজার হাজার বছরের ধ্যানে জীবনের শান্তির পবিত্র তীর্থ হয়ে উঠেছে। এখানে শঙ্খের কোন জান্তব আকাঙ্ক্ষা বা ইচ্ছাশক্তি ঈশ্বরের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে না। এখানে ধৈর্য-প্রেম-করুণা ভিক্ষাই অভীষ্টলাভের পথ। তাই কপিল মুনির সাধনা, গঙ্গার পূত-পবিত্র ধারাকে মর্ত্যে প্রবাহিত করার পৌরাণিক বৃত্তান্তের উল্লেখ, শিল্প-কাহিনীর গঠনের সঙ্গে সম্পর্কশূন্য নয়। এ ছাড়াও একটি দেশের প্রথা-সংস্কারও, তার ধর্ম-পুরাণের মতোই সংস্কৃতির অঙ্গ—যা ইতিহাসের প্রেক্ষাপট রচনা করে। 'পদসঞ্চার'-এর শিল্প-কাহিনীর আঙ্গিক গঠনে ঔপন্যাসিক এই মূল সত্যটি কোথাও বিস্মৃত হন নি। সেই সঙ্গে পৌরাণিক যুগের ভাবানুষঙ্গে অতীতকে বর্তমানের সঙ্গে যুক্ত করায় শিল্প-কাহিনীতে বিশালতা বোধ এসেছে। গঙ্গাসাগরে সন্তান-বিসর্জনের একটি ঘটনার সংস্থাপনায় তদানীন্তন যুগের প্রথা-সংস্কারকে অপূর্ব নৈপুণ্যে শিল্পী সুপর্ণার অসাড় চৈতন্যে ঘা দিয়ে তার পূর্ব স্মৃতিকে জাগিয়ে তুলেছেন। কোন জননী তাঁর সন্তানকে গঙ্গাবক্ষে দান করে কান্নায় লুটিয়ে পড়েছিলেন আগের দিন। পরদিন প্রাতে নিষ্পাপ সেই শিশুর ছিন্ন মুণ্ডটি পঙ্কতটের ওপর পড়ে আছে দেখা গেল। 'বীভৎস করুণ' এই দৃশ্য প্রথমেই সুপর্ণার চোখে পড়েছে; তার সমগ্র চৈতন্যের মূল ধরে নাড়া দিয়ে জাগিয়েছে অতীতের অনুরূপ সেই দৃশ্য—রক্তাপ্লুত কিশোর গঞ্জালোর ছিন্নমুণ্ড! যে দৃশ্য তার বাক্‌শক্তি হরণ করেছিল সেই একই গভীর আঘাত তার বাক্‌শক্তিকে পুনরায় ফিরিয়ে দিল। সুপর্ণার অন্তরের অন্তঃস্থলে গঞ্জালোর প্রতি প্রেম 'তুমি আমার তুমি আমার!' এই বাণীরূপে যে সংহত ছিল, ছিন্ন মুণ্ড শিশুটিকে দেখে ভাষান্তরে সেইটি ব্যক্ত হয়েছে "কী ও! কী

ওখানে ?" শিল্পীর মনস্তাত্ত্বিক বিচার ক্ষমতা নাটকীয় এক দৃশ্য সংযোজনার মধ্য দিয়ে শিল্পমূর্তিকে অলঙ্কৃত করেছে। তাঁর গভীর জীবনবোধ ও জীবনপ্রীতি শিল্পমূর্তিকে ট্রাজিক সুরের বিষণ্ণতায় ঢাকা না দিয়ে, তাকে সার্থকতার পথে, সফল হয়ে ওঠার পথে চালিত করেছে, এবং শিল্পাঙ্গিকের ওপর প্রসন্নতার স্নিগ্ধ আলো ছড়িয়ে দিয়েছে।

একবিংশ এবং দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ দুটিতে ইতিহাসের বিজয় রথ লক্ষ্য পথে ছুটে গেছে। ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না সব তুচ্ছ হয়ে গেছে! দুর্যোগের মেঘ ঝঞ্ঝায় ফেটে পড়েছে মামুদ শার মাথার ওপর। সুরজগড়ের যুদ্ধে মামুদের সেনাপতি ইব্রাহিম খাঁ শের খাঁর হাতে পরাজিত, নিহত। গৌড়ের অভিমুখে অমিত বিক্রমে শের খাঁ এগিয়ে আসছেন। গোয়ার গভর্নর নুনো ডি-কুন্হা তিনশ ক্রীশ্চান সৈন্যের অস্ত্রবাহী জাহাজ পাঠিয়ে দিয়েছেন ; ডি মেলোকে মুক্তি না দিলে চট্টগ্রামে আগুন জ্বালিয়ে ধ্বংস করার জন্য। চট্টগ্রামে আগুন জ্বলেছে, কামানের ঘায়ে ঘর-বাড়ী বন্দর ধ্বংস হতে চলেছে। পথে পথে যুদ্ধ চলছে—ক্রীশ্চান সৈন্যের তরবারির আঘাতে বাধাদানকারীরা ধরাশায়ী হচ্ছে। সোমদেব উন্মাদের মতো হিন্দুর রাজ্য প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা চূর্ণ হওয়ায় একাকীই ঝাঁপিয়ে পড়েছেন ক্রীশ্চান সেনাপতি আলকোকোরাদোর ওপর। শিল্পী এই-ভাবে একটি স্বাভাবিক পরিণাম সোমদেবের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে শিল্পের সুন্দর ভাবমূর্তিকে অটুট রেখেছেন। সপ্তগ্রামেও পৌচেছে পর্তুগীজ যুদ্ধ জাহাজ দিয়েগো রেবেলোর নেতৃত্বে। তারাও প্রস্তুত বঙ্গে রক্ত স্রোত প্রবাহিত করতে। এরূপ পরিস্থিতিতে মামুদ শা ক্ষত-বিক্ষত অন্তরে, হতাশায় এবং প্রায়শ্চিত্তের শাস্তিতে জর্জরিত হয়ে ডি মেলো সহ সকলকে মুক্তি দিয়েছেন ; এবং ক্রীশ্চানদের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন, বঙ্গে বাণিজ্যাধিকার, কুঠি ও দুর্গ নির্মাণের অনুমতিদান করেন। বিনিময়ে শের খাঁর বিরুদ্ধে তেলিয়াগড়ির যুদ্ধে পর্তুগীজদের সাহায্য চেয়েছেন তিনি। দুই ইতিহাসের ধারা মিলে গেছে এখানে ; অতঃপর তেইশ পরিচ্ছেদে তারা একটি ধারায় প্রবাহিত হয়ে গেছে। ঐতিহাসিক চুক্তি-পত্রে স্বাক্ষর করে ডি মেলো পর্তুগীজ ইতিহাসের এক উজ্জ্বল নক্ষত্র হয়েছেন, এবং বর্তমান উপন্যাসের ইতিহাস অংশের নায়কের গৌরব লাভ করেছেন।

একুশ এবং বাইশ—এই দুই পরিচ্ছেদে একটার পর একটা ঘটনার তরঙ্গ মহাকল্লোল তুলে ফেনপুঞ্জ উৎক্ষিপ্ত করে যে ভাবে নিশ্চিত পরিণতির দিকে ছুটে গেছে, তার শিল্পপ্রকৃতি ব্যাখ্যা না করে বঙ্কিমচন্দ্রের "রাজসিংহ" সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের বিশ্লেষণের সামান্য অংশ উদ্ধৃত করতে চাই : "পর্বত হইতে প্রথম বাহির হইয়া যখন নির্ঝরগুলো পাগলের মত ছুটিতে আরম্ভ করে তখন মনে হয় তাহারা খেলা করিতে বাহির হইয়াছে, মনে হয় না তাহারা কোন কাজের। পৃথিবীতেও তাহারা গভীর চিহ্ন অঙ্কিত করিতে পারে না। কিছু দূর তাহাদের পশ্চাতে অনুসরণ করিলে দেখা যায় নির্ঝরগুলো নদী হইতেছে ; ক্রমেই গভীরতর হইয়া, ক্রমেই প্রশস্ততর হইয়া, পর্বত ভাঙিয়া, পথ কাটিয়া, জয়ধ্বনি করিয়া, মহাবলে অগ্রসর হইতেছে। সমুদ্রের মধ্যে মহাপরিণাম প্রাপ্ত হইবার

পূর্বে তাহার আর বিশ্রাম নাই।"* —এই গতিই এই দুই পরিচ্ছেদের ইতিহাস-ঘটনার বস্তুপুঞ্জকে ভার না করে ভাসিয়ে নিয়ে গেছে। বিংশ পরিচ্ছেদ পর্যন্ত কখনও রোমান্স, কখনও বাস্তব ঘটনার ধারা, কখনও একসঙ্গে উভয়কেই এমনভাবে বয়ন করেছেন শিল্পী যে, একবিংশ ও দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ দুটির ঠাসা ঘটনারাজিকে ধারণ করার পূর্ণ ক্ষমতা শিল্পিত কাহিনীর আছে। ইতিহাস এখানে ভার বা ক্লান্তিকর হয়ে ওঠে নি।

অতঃপর ত্রয়োবিংশতি পরিচ্ছেদটি সমগ্র উপন্যাস-কাহিনীর উপসংহারের মতো শিল্প-কাঠামোয় স্থান পেয়েছে। ছোট-বড় প্রত্যেকটি কাহিনীমুখ একটি উপসংহার বা লক্ষ্যে পৌঁছে শিল্পাঙ্গিকের সৌকর্য রচনা করেছে। এই উপন্যাসের ৩টি মূল ধারা—শঙ্খ-শম্পা-সুপর্ণার কাল্পনিক কাহিনী, পর্তুগীজদের বঙ্গে বাণিজ্যাধিকার লাভের ইতিহাস এবং বঙ্গের তৎকালীন শাসন ও ধর্ম-সংস্কৃতির ইতিহাস—এই পরিচ্ছেদে সুনিশ্চিত পরিণাম লাভ করেছে। প্রত্যেকটি ধারা নদীর সমুদ্রে লীন হওয়ার মতোই মিশে গেছে। এবং শিল্পীর ভাববৃত্তটি (idea circuit) সম্পূর্ণ করেছে তেইশ পরিচ্ছেদে।

মামুদ শা নিজেই নিজের কবর খুঁড়েছেন। পর্তুগীজরা প্রতিশ্রুতি মত সাহায্য করলেও, তেলিয়াগড়ির যুদ্ধে বিপদ সামাল দিলেও, শেষ পর্যন্ত শের খাঁর দুর্বার গতির আক্রমণে মামুদ শা কুটোর মতো উড়ে গিয়েছিলেন। পর্তুগীজগণ শুধু বন্ধুত্ব ও বাণিজ্যাধিকার লাভ করেই সন্তুষ্ট থাকেন নি, তাঁদের প্রতিষ্ঠিত বাণিজ্য কুঠী ও দুর্গ ক্রীশ্চান ক্রুশচিহ্নিত বিজয়কেতন উড়িয়ে সপ্তগ্রাম-ত্রিবেণী এবং চট্টগ্রামে সগৌরবে আগামী দিনের ক্রীশ্চান প্রভুত্বের সদম্ভ ঘোষণা করেছে। তাঁদের ইগ্রেঝার চূড়ো নবাগত ক্রীশ্চান ধর্মের উজ্জ্বল ভবিষ্যতেরই স্পর্ধিত প্রকাশ। প্রথম পরিচ্ছেদের 'এপিগ্রাফ'-এর **'Christaos e speciarias'**—অর্থাৎ 'চাই ক্রীশ্চান ও চাই মশলা'—এই উদ্দেশ্য নিয়ে পর্তুগীজরা তথা ক্রীশ্চান প্রতিনিধিরা একদিন বেলেমের ঘাট থেকে যাত্রা করেছিল —বঙ্গে পদ স্থাপনার পর সে উদ্দেশ্য তাঁদের বাস্তবায়িত হ'ল। আর পাশ্চাত্ত্য বাণিজ্য লক্ষ্মীর যে স্বর্ণঘট স্থাপিত হ'ল ডি মেলোর স্বাক্ষরে, অনাগত ভবিষ্যতে ইংরাজদের আগমণে তা-ই যে বঙ্গের শিল্পীদের আঙুল কেটে এদেশের শিল্পের সঙ্গে বাণিজ্য-লক্ষ্মীকেও সমুদ্রের অতলতলে নিমজ্জিত করবে 'কথামুখে'র ইঙ্গিতটির সঙ্গে উপ-সংহারের [তেইশ পরিঃ] ব্যঞ্জনাধর্মী বক্তব্য মিশে ভাববৃত্তটি সম্পূর্ণ হয়েছে। ঐতিহাসিক উপন্যাসে ধীরে ধীরে যে মহাকাল চেতনা পরিব্যাপ্ত হয়ে পড়ে, উপসংহারে অনাগত ভবিষ্যতের ইংগিতে অতীত ও বর্তমানের হাত এসে ধরেছে ভবিষ্যৎ—ফলে কালের ক্ষুদ্র গণ্ডী সরে গিয়ে মহাকাল তাকে আলিঙ্গন করেছে। স্থানের গণ্ডীও অনুরূপভাবে ভেঙ্গে পড়েছে। আগামী দিনে সমগ্র ভারতবর্ষের ইতিহাস কোন্ পথে চলেছে, না—শুধু ভারতবর্ষ নয়, পৃথিবীর বুকে ক্রীশ্চান সভ্যতা কেমনভাবে তার 'ইগ্রেঝা'র গৌরব চূড়া প্রতিষ্ঠিত হয়ে আকাশ বিদ্ধ করবে, তার ইঙ্গিতে বঙ্গের স্থান সংকীর্ণতা আর প্রকট থাকে না এই শিল্প-কাহিনীতে।

---

* 'রাজসিংহ' : "আধুনিক সাহিত্য"

দলে দলে কালো চামড়ার মানুষ খ্রীস্ট ধর্মে দীক্ষিত হচ্ছে। ক্রীশ্চানদের একখানি জাহাজ সরস্বতীর দুগ্ধ স্রোতে সপ্তগ্রাম-ত্রিবেণীর ঘাটে এসে দাঁড়িয়েছে। "সেই জাহাজ থেকে নামছে একদল ক্রীশ্চান সন্ন্যাসী আর সন্ন্যাসিনী।" এঁদেরই মধ্যে একজনকে চিনতে পারলেন শঙ্খ দত্ত। তিনি সেই সমুদ্র তরঙ্গে হারিয়ে যাওয়া দেবদাসী শম্পা। দেবতার ধন দেবতাই নিয়েছেন। তিনি এখন প্রভু খ্রীষ্টের সেবিকা। সঙ্গে সঙ্গে শঙ্খের জীবনেতিহাস থেকে বেরিয়ে গিয়ে শম্পার যে কাহিনীমুখটি ঝুলছিল, এখন একটি নিশ্চিত পরিণতিতে পোঁছে তা বৃত্তায়ত হয়ে গেল।

ত্রয়োবিংশতি পরিচ্ছেদে শঙ্খ-সুপর্ণার কাহিনীও ঔপন্যাসিকের জীবন বিশ্বাসে আদর্শায়িত লক্ষ্যে পোঁচেছে। সুপর্ণা কথা বলেছে। কিন্তু তার মন এখনও আচ্ছন্ন —চিন্তাশক্তি এখনও জীবানানুগ হয়ে ওঠে নি। রাজশেখর-শঙ্খের বহর সপ্তগ্রামে সরস্বতীর তীরে তাঁদের বাড়ীর ঘাটে এসে ভিড়েছে। বৃদ্ধ পিতা ধন দত্ত আরও বৃদ্ধ হয়েছেন। বরণ করে নিয়েছেন তিনি সুপর্ণাকে গৃহলক্ষ্মী হিসেবে। তাঁর শাক্ত-গৃহে আজ চৈতন্যের প্রতিষ্ঠা ; তাঁর নাম সংকীর্তন আজ তাঁর গৃহে। "চৈতন্যেরই জয় হ'ল শেষ পর্যন্ত। মুছে গেলেন সোমদেব।"

শঙ্খ-সুপর্ণার হৃদয়কে জাগাবার চেষ্টা করেন। দুটি হৃদয়ের প্রেমকে একটি স্রোতে প্রবাহিত করতে তাঁর ঐকান্তিক সাধনা। শঙ্খের চিন্তা গভীর হয় ; হৃদয়ের গভীরতম তলদেশে যে সত্য নিহিত, তাকে আবিষ্কার করেন। সুপর্ণার "অস্বচ্ছ মনের সামনে কী যেন—কে যেন ঘুরে বেড়ায়। সোনালী চুল, নীল তার চোখ, অপরিচিত তার ভাষা—সে কি কখনো মুছে যাবে সুপর্ণার মন থেকে ?"—শঙ্খ এবং গঞ্জালো—এই বিন্দু দুটি এতক্ষণে যুক্ত হ'ল, এবং মূল প্রেম-কাহিনীর ত্রিভুজ—শঙ্খ-শম্পা ও সুপর্ণার পাশে, আর একটি অস্পষ্ট ত্রিভুজ শঙ্খ-সুপর্ণা-গঞ্জালো গঠিত হয়ে যায়।

শঙ্খ শুধু সুপর্ণার অন্তরে গঞ্জালোর প্রেম স্মৃতির কথাই চিন্তা করেন না, আপন হৃদয়ের গভীরেও সত্য সন্ধান করেন : "সে (গেঞ্জালো) কি কখনো মুছে যাবে সুপর্ণার মন থেকে ? যেমন করে শম্পাকে কোনদিন সে ভুলতে পারবে না ? সুপর্ণা চিরদিন একটি রক্তজবার স্বপ্ন দেখবে, আর শঙ্খ দত্ত চোখ বুজলেই দেখতে পাবে সুরের সমুদ্রে অম্লান—সুন্দর একটি শ্বেতপদ্ম ভেসে চলেছে ? দুজনে পাশাপাশি বসে থাকবে—অথচ কেউ কারো সঙ্গে থাকবে না ; দুজনের হাত মিলে থাকবে এক সঙ্গে—অথচ এক সময়ে শিউরে উঠে দুজনেরই মনে হবে অপরিচিত কাউকে স্পর্শ করে আছে তারা। সেই দিন ?"

অবশেষে জীবনের একটি প্রসন্ন সমাধান মিলেছে। জীবন-সত্য আর আদর্শ-সত্য এক হয় নি। সুপর্ণার গর্ভে শঙ্খের ভবিষ্যৎ পুরুষের পদসঞ্চার—দুটি জীবনস্রোতকে একমুখী করেছে। একটু ভিন্নভাবে হলেও রবীন্দ্রনাথের 'যোগাযোগ'-এর কুমু আর মধুসূদন ঘোষালের সামাজিক সমাধান।

ঐতিহাসিক এবং কাল্পনিক উভয় কাহিনীর দিক থেকেই 'পদসঞ্চার' নামকরণটি আরও বিভিন্ন দৃষ্টিকোণকে সমন্বিত করেই সার্থক হয়ে উঠেছে এবং সমগ্র শিল্প-কাহিনীটি একটি ভাবসূত্রে বাঁধা পড়েছে।

বঙ্কিমচন্দ্রের 'রাজসিংহ' উপন্যাসের আলোচনা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ প্রশ্ন তুলেছিলেন : 'রাজসিংহ'-এর নায়ক কে কে ? উত্তরে লিখেছেন তিনি : "ঐতিহাসিক অংশের নায়ক ঔরংজেব, রাজসিংহ এবং বিধাতা পুরুষ।"—একই প্রশ্ন 'পদসঞ্চার' সম্পর্কে উত্থাপিত হলে, উত্তরে বলব—ডি-মেলো এবং বিধাতা পুরুষ—ঐতিহাসিক অংশের নায়ক। 'পদসঞ্চার'-এ বিধাতা পুরুষকেই ঐতিহাসিক অংশের মহানায়ক বলা সঙ্গত। উপন্যাস অংশের নায়ক নিঃসন্দেহে শঙ্খ দত্ত। সমগ্র কাহিনীর নায়ক তাঁকে বলা যায় কিনা বিচার্যের বিষয়।

নয়

ভাষা বিচার

উপন্যাসের সার্থক শিল্পরূপের মধ্যে কাহিনী, চরিত্র, স্থান-কাল, কবিত্ব-নাট্যরস যেমন সাঙ্গীভূত তেমনি, উপন্যাসের ভাষাশৈলীরও একটি প্রয়োজনীয় ভূমিকা আছে। ভাষা হ'ল ভাবের বাহন। অতএব, উপন্যাসের ক্ষেত্রে, ঔপন্যাসিকের ভাব, দর্শন,—তাঁর আদর্শ, কল্পনা-কবিত্ব প্রকাশিত হয় ভাষার মধ্য দিয়ে। ভাব ও বক্তব্যের বৈশিষ্ট্যানুসারে ভাষার মূর্তিও যায় পাল্টে ; যেমন, কবিত্বের ভাষা, আর দর্শনের ভাষা-মূর্তি এক নয়, আদর্শের ভাষা-রূপ, এবং বাস্তবদ্বন্দ্বের ভাষা-মূর্তি পৃথক। কিন্তু মনে রাখতে হবে, উপন্যাসের ভাষার দায়িত্ব কবি-মনের বিশেষ আবেগ-অনুভূতি-অভিজ্ঞতা, বা কল্পনা-কবিত্বকে প্রকাশ করলেই শেষ হয় না ; ভাষাকে শিল্পের ভাবমূর্তির অনুগামী হতে হবে, নচেৎ তা উচ্চ কবিত্বপূর্ণ বা দার্শনিক ভাবঋদ্ধ হলেও, শিল্পের পক্ষে অপ্রয়োজনীয় অলংকরণ মাত্র হয়ে উঠবে—যা শিল্পরসের পরিপন্থী। উপন্যাসের ভাষা নিছক ঘটনারাজির বস্তু-ভার বহনের জন্যও নয়, আবার কবির ভাবোচ্ছ্বাস প্রকাশের হাল্কা দুটি ডানাও নয়। জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ পর্যন্ত সব কিছু করার মতো শক্তি থাকা প্রয়োজন—উপন্যাসের ভাষার। গদ্যের যুক্তি-বিচার-বিশ্লেষণ, বাস্তব সমস্যা-সংকটকে ব্যক্ত করে এ-ভাষা যেমন সমতল ও বন্ধুর স্থলপথে বিচরণ করতে পারে, তেমনি কাব্যের সলিলে সন্তরণ করতেও পটু। অর্থাৎ, উপন্যাসের ভাষা উভচর। এ ভাষায় মনের গভীরে যে চিন্তার পাক আছে, বা গভীর রহস্যাবৃত যে মনটি, তাকেও যেমন অন্ধকার থেকে আলোর রাজ্যে তুলে আনতে পারে, তেমনি আবার, সহজ-সরল প্রাণের বিশ্বাস, ভালবাসা, স্বীকারোক্তিও সাবলীল গতিতে আত্মপ্রকাশ করতে পারে। সার্থক উপন্যাসের ভাষা 'Prose of life, এবং 'Poetry of life,'—অর্থাৎ 'গদ্যময়জীবন' এবং 'কাব্যিক জীবন'—উভয়কেই এক বৃন্তে বিধৃত রাখে। ঔপন্যাসিকের লক্ষ্যভেদ করাই প্রকৃত উপন্যাসের ভাষার কাজ।

"কপালকুণ্ডলা-র" ভাষা ঔপন্যাসিকের ভাব, বক্তব্য, ও উদ্দেশ্য অনুযায়ী একদিকে তীব্র নাটকীয় গতিসম্পন্ন, অপরদিকে গীতিসুরময়। ভাষার কোথাও লেগেছে কপালকুণ্ডলার জীবন সম্পর্কিত দার্শনিকসুলভ গভীর ভাব ও জিজ্ঞাসা আবার কোথাও

প্রকাশ পেয়েছে মতিবিবির ষড়যন্ত্রের পাক। বঙ্কিমচন্দ্রের অধিকাংশ উপন্যাসেই শিল্পীর অভিপ্রায় হিসেবে সমাজ ও জীবন সম্পর্কিত নীতি-তত্ত্ব-আদর্শ-দার্শনিকতা গল্পের আড়ালে আত্মগোপন করে থাকে বলে, শিল্প-গঠনে ভাষা শিল্পীর সেই '**motif**'-কে বহন করার আশ্চর্য শক্তি ধরে এবং এইজন্যই তাঁর শিল্পাঙ্গিক এত বলিষ্ঠ ও অনন্য-সাধারণ। যেখানে তাঁর রোমান্সপ্রিয়তা বড় হয়েছে, সেখানে তাঁর ভাষাতেও লেগেছে রহস্যময়তা, এবং দূরাভিসারের সৌন্দর্যমায়া। প্রকৃতির বর্ণনায় বা নরনারীর রূপ বর্ণনায় তাঁর ভাষা তাই **Prose of life** এবং **Poetry of life** উভয়কেই আত্মস্থ করে নিয়ে স্বয়ংসিদ্ধা।

রবীন্দ্রনাথের "চোখের বালি," বা, "গোরা"-র ভাষা শিল্পসার্থক, কিন্তু "শেষের কবিতা," বা, "চতুরঙ্গ" বা "চার অধ্যায়" প্রভৃতিতে কবি-ভাষা অনেক ক্ষেত্রেই শিল্পের '**motive**' বা ভাব ও বক্তব্যকে ছাড়িয়ে অধিকতর আকর্ষণীয়, চটকদারী ও কাব্যিক ব্যঞ্জনাময় হয়ে উঠেছে। চরিত্রগুলি প্রত্যেকেই ঐ একই কবিভাষায় কথা বলে। ভাষা-এসব ক্ষেত্রে শিল্প সার্থকতার পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

শরৎচন্দ্র নিজেকে যতই **realist** বলুন, তাঁর চরিত্রগুলি রোমাণ্টিক ভাব-সমৃদ্ধ হওয়ায় বাস্তব পরিবেশকে এমন এক কাল্পনিক ভাবদ্বন্দ্বে ফোটাতে চেয়েছেন যে, শিল্পাঙ্গিকটিকে দুর্বল করে দিয়েছে। তবে তাঁর একটি ক্ষমতা অবশ্য স্বীকার্য। সেটি হল গল্প বলার ক্ষমতা। ভাষার এমন যাদুশক্তিতে গল্পকে তিনি বয়ন করেন যে, পাঠক মাত্রই তাতে আকৃষ্ট হয়। শরৎচন্দ্রের ভাষা তাই, সহজেই তাঁর উপন্যাস পাঠককে মুগ্ধ করে রাখে, কিন্তু বিচার-বিশ্লেষণ-ব্যাখ্যা ও জীবন-জিজ্ঞাসার গভীরে এ ভাষা কদাচিৎই নিয়ে যেতে পারে।

কল্লোলোত্তর আধুনিক যুগে,—দুটি বিশ্বযুদ্ধ, মানুষের মূল্যবোধের হ্রাস, ধনতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের সংগ্রাম ও বিপ্লব, জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের তরঙ্গভঙ্গ, ফ্রয়েডীয় যৌন চিন্তা ও সমস্যা, মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ, বিজ্ঞান যুগের যুক্তি-বিচার-তর্ক, প্রভৃতি বাঙলা গল্প-উপন্যাসের জগতে বিপুল আলোড়ন সৃষ্টি করল, যেমন সাহিত্যের অন্যান্য শাখায়ও তার পরিবর্তন দেখা দিয়েছিল। বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকের পর থেকে বাঙলা উপন্যাসে কালান্তরের সূচনা হ'ল। সামাজিক ও অর্থনৈতিক পটভূমিকার পরিবর্তন হেতু গল্প ও থীমের বৈচিত্র্য নতুন নতুন চরিত্র ও নবনব সমস্যা সঙ্কটই শুধু দেখা দিল না, শুরু হ'ল আঙ্গিক নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা আর যুগোপযোগী এবং ভাব ও আঙ্গিক উপযোগী ভাষা-রীতির পরীক্ষা-নিরীক্ষা। ধূর্জটিপ্রসাদ, অন্নদাশঙ্কর-গোপাল হালদার; বা তারাশঙ্কর-বিভূতিভূষণ-মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়, এবং 'কল্লোল' গোষ্ঠীর ধারক ও বাহক অচিন্ত্য সেনগুপ্ত-শৈলজানন্দ-প্রেমেন্দ্র মিত্র প্রবোধ সান্যালরা এলেন একে একে। এঁদের মধ্যে অনেকেই অবশ্য ভাব ও ভাষারীতির দিক থেকে রবীন্দ্র-শরৎ যুগের প্রভাব ও বৈশিষ্ট্যকে সম্পূর্ণ কাটিয়ে উঠতে পারেন নি।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় বাঙলা উপন্যাস জগতে প্রবেশ করলেন আরও কিছু পরে—

এঁদের কাছে নবীন—উদীয়মান শিল্পী হিসেবে। নানা দেশ-বিদেশের গ্রন্থরাজি পঠন পাঠনে, জ্ঞান-বিজ্ঞানের নানা শাখায় বিচরণ করে পরিশীলিত তাঁর মন। তীক্ষ্ণ বুদ্ধির ঔজ্জ্বল্য ললাটে। সেই বুদ্ধি কখনও wit-এ, কখনও humour-এ ঝলকিত-বিলসিত। তাঁর মার্জিত রুচি, অগাধ পাণ্ডিত্য, অদৃষ্ট-পূর্ব সৌজন্যবোধ এবং মানুষের প্রতি গভীর-অপার সহানুভূতি তাঁর কবিভাষাকে নমনীয়, কোমল, স্নিগ্ধ এবং আলোকিত করেছে। বিংশ শতাব্দীর যুক্তি-বিচার-কণ্টকিত, আন্দোলন-ক্ষুব্ধ, নানা যন্ত্রণা-বিদ্ধ এবং অভাব-সংকটে জর্জরিত যুগে বসেও তাঁর দু'চোখে রোমাণ্টিক সৌন্দর্যের মায়াঞ্জন। সেই রোমাণ্টিসিজিমের যাদুস্পর্শ তাঁর আধুনিক যুগের উপন্যাসের ভাষাকে এক অভিনব সৌন্দর্য ও মাধুর্য দান করেছে। Prose of life এবং Poetry of life-এর সাঙ্গীকরণ ঘটেছে তাঁর উপন্যাসের গদ্য ভাষায়। বঙ্কিমচন্দ্র-রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের গদ্যভাষাকে বিগলিত করে স্বকীয়তার শীলমোহর অঙ্কিত এক অনবদ্য সুন্দর ভাষা নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় আয়ত্ত করেছিলেন। "পদসঞ্চার"-এর ভাষাশৈলীর সৌন্দর্য অতুলনীয়, কিন্তু উপন্যাসের ভাষা হিসাবে কতখানি শিল্পসার্থক হয়েছে তা বিচার করে দেখা যেতে পারে।

"পদসঞ্চার"-এর ভাষা বহু গুণান্বিতা। নানা ভাব ধারণ ও বহন করার ক্ষমতা আছে তার। 'কথামুখ'-অংশে কালিকটের রাজসভায় চোদ্দজন পর্তুগীজ প্রবেশ করেন। এত হীরা-মণি-মাণিক্যের ছটা ইয়োরোপীয়েরা এর আগে দেখেন নি। তাঁদের বিস্ময়-বিমূঢ় দৃষ্টির সামনে ভারতীয় রাজার ঐশ্বর্য যে-ভাষায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে, সে ভাষা সংস্কৃতের ঐশ্বর্য-অলঙ্কার মণ্ডিত ভাষা : "দরবার নয়—ইন্দ্রপুরী। প্রশস্ত বিশাল। বহুমূল্য পাথরে দেওয়ালগুলি অলংকৃত, নানা রঙের রেশম কিংখাবের ছড়াছড়ি। এই একটি ঘরেই যে পরিমাণ মণি-মাণিক্য সঞ্চিত, রাজা মানোএলের গোটা লিসবোঁয়া শহরেও তা আছে কিনা সন্দেহ।" "জামোরিন ধীরে ধীরে মাথা নাড়লেন একবার। চূড়াকার কেশশীর্ষে গুচ্ছবদ্ধ পদ্মরাগ আর নীলকান্ত মণি ঝকমকিয়ে উঠল।" রাবণের রাজসভার বর্ণনায় মধুসূদনের ঐশ্বর্যময় কবি-ভাষা এখানে উপন্যাসের ক্ষেত্রেও অসার্থক হয় নি। আবার প্রকৃতির কৃপণ দানে রুক্ষপ্রকৃতির সুদূর পর্তুগাল থেকে শ্যামল কোমল মায়াময় প্রকৃতির কোলে ঐশ্বর্য-ভাস্কর্য-মণ্ডিত ভারতের দেশগুলির সৌন্দর্য বর্ণানার ভাষা অনেকটা অলঙ্কারবহুল হলেও, এক নয়—প্রকৃতির কোমল মায়ার রোমাণ্টিসিজমের প্রলেপে হীরা-মাণিক্যের কঠিন দীপ্তিকে কেমন করে স্নিগ্ধ-মনোরম করতে হয়, সে যাদু ঔপন্যাসিক ভালোই জানেন : "এলালতা আর দারুচিনি বীথিকার গন্ধমর্মরে ভরা এক বিচিত্র তটভূমি। পর্তুগালের মৃত্তিকার সঙ্গে কী আকাশ-পাতালের ব্যবধান! নীল-শ্যামলের এক অপরূপ দিগন্ত, তার কোলে হিন্দু ভাস্কর্যের এক অপূর্ব নগরী। সে নগরীর রাজা যেন কোন দূর স্বপ্নলোকের অধিবাসী।"—স্বপ্নময় নগরীর রূপ বর্ণনা করতে ঔপন্যাসিক ভাষাতেও সেই স্বপ্নের ছোঁয়া লাগিয়েছেন। প্রথম উদ্ধৃতির ভাষায় যদি ক্লাসিকতার স্পর্শ লাগানো হয়ে থাকে, তাহলে দ্বিতীয় উদাহরণটিতে বলতে হয় রোমাণ্টিসিজমের স্পর্শ।

যে পর্তুগীজদের হাতে মুরেরা প্রচণ্ড মার খেয়ে স্পেন ও পর্তুগাল থেকে বিতাড়িত হয়েছে, কিউটায় যে পর্তুগীজ শক্তি তাদের সমস্ত দম্ভ, ক্ষমতা, মর্যাদা একেবারে চূর্ণ করে দিয়েছে, সেই পর্তুগীজরা এসেছে ভারতেও, তাদের ব্যবসায়ে, তাদের প্রভুত্বে হস্তক্ষেপ করতে! কাজেই মুষ্টিমেয় পর্তুগীজকে দেখে আরবীয় বণিকদের মনোভাবটি ব্যক্ত করতে যে নিষ্ঠুর-হিংস্রতা ভাষায় প্রকাশ পাওয়া উচিত সে তূণও নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ভাষায় তূণীরে আছে: "আরব বণিকেরা কেমন ক্ষুধার্ত দৃষ্টিতেই যে তাকিয়ে আছে! ক্ষুধিত নেকড়ে যেন একপাল!" "আরব বণিকদের দৃষ্টিতে শান পড়ছে। খাপ থেকে বেরিয়ে আসা মরক্কো ছোরার চাইতেও যেন তা নগ্ন। অস্বস্তি বোধ করল সেনাপতি।" আবার বিপরীত দিকে, দুর্ধর্ষ নিষ্ঠুর পর্তুগীজ বণিকগুলি সৈনিক-যোদ্ধার জাত, উদ্দেশ্য সিদ্ধ করার জন্য প্রাণ তুচ্ছ—তরবারির ডগায় টুকরো টুকরো করে ফেলতে এতটুকু হাতও তাদের কাঁপবে না। সেই নিষ্ঠুর সংকল্পের তূণখানিও ঔপন্যাসিকের ভাষা-ভাণ্ডারে আছে: "সুমিষ্ট তরমুজ আর এলাচি এবং মশলার গন্ধ-ভরা সরবৎ আস্বাদন করতে করতে এক সঙ্গে একই কথা ভাবতে লাগল চৌদ্দজন বিদেশী। কবে তাদের তলোয়ারের মুখে তরমুজের মতো টুকরো টুকরো হয়ে যাবে এই দেশ—রাজা মানোএল সম্রাট মানোএল হয়ে মুখে তুলে ধরবেন প্রতাপের পান পাত্র?"—এই ভাবে প্রয়োজন বোধে ভাষায় রহস্য গভীরতা এবং প্রহেলিকার আমেজও লাগে: "মাথার ওপর প্রেতিনীর মতো আর্তনাদ তুলে কেঁদে বেড়াচ্ছে সমুদ্র-শকুন। কী চায় ওরা? এ কান্নায় কোন্ অশুভ সংকেত? অনেক ঊর্ধ্বে উড়তে উড়তে—দূর সমুদ্রে যেখানে মানুষের দৃষ্টি চলে না—ওরা কি কোন আগামী অপচ্ছায়া দেখতে পাচ্ছে সেখানে?"—বীভৎস-ভয়ঙ্কর রসের দৃশ্য অঙ্কনের ভাষা ব্যবহারেও তিনি সমান দক্ষ: "চারিদিকে তখন অবিশ্বাস্য দুঃস্বপ্ন। বন্দরের বহু জায়গাই অগ্নিকুণ্ড। পোড়া লবঙ্গ, দারুচিনি আর আদার ধোঁয়ায় শ্বাসরোধ করে আনছে। কামানের গোলায় ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন মানুষের দেহ ছড়িয়ে আছে পথের ওপর।

"বন্দরের এখানে ওখানে যারা আত্মগোপন করেছিল, এবার একটা বিচিত্র বস্তু তাদের চোখে পড়ল। সমুদ্রের ঢেউ একটার পর একটা জ্বলন্ত ভেলা বয়ে আনছে বন্দরের দিকে। আর সেই সব ভেলায়—

"নিরীহ ধীবর আর হিন্দু মুসলমান বণিকদের অর্ধমৃত স্তূপাকার দেহ। তাদের হাত, কান, নাক ইত্যাদি পৈশাচিক উল্লাসে ছিন্ন করে নেওয়া হয়েছে। তারপর ভেলার ওপর শক্ত করে বেঁধে শয্যাদ্রব্যের ইন্ধন দিয়ে করা হয়েছে অগ্নিসংযোগ। দাঁত দিয়ে যাতে তারা হাত পায়ের বাঁধন না কাটতে পারে, সেইজন্য তাদের দাঁতগুলি এক একটি করে উপড়ে নেওয়া হয়েছে নির্মমতম নিপুণতায়। কাজে কোথাও একবিন্দু ত্রুটি নেই সেনাপতির!

"প্রতিটি ভেলার গায়ে এক একখানি কাষ্ঠ ফলক। তাদের ওপর ক্রীশ্চান সেনাপতির স্বহস্তের অক্ষর: মহামহিমান্বিত জামোরিনের নৈশভোজের জন্য যৎকিঞ্চিৎ মাংস উপহার—"

এই ভাষাকেই তিনি আবার কাব্যের মীড় দেওয়া ভাবগভীর ব্যঞ্জনাময় ভাষায় অনায়াসেই রূপান্তর করতে পারেন : "অন্ধকার কাঁপিয়ে আর একবার অট্টহাসি করল ভাস্কো-ডা-গামা। কোথা থেকে জেগে উঠল একটা চকিত ঝোড়ো হাওয়া—হাহাকার করে উঠল দারচিনি আর এলালতার বন। আর আকাশের পুঞ্জিত মেঘে বিকীর্ণ হল খর-বিদ্যুতের অসিধারা—যেন বিধ্বস্ত মুর প্রতিষ্ঠার ভগ্ন দুর্গে অবারিত হল আর এক নতুন শক্তির তোরণ-দ্বার।

"আর সেই অট্টহাসি রাত্রির আকাশে কেঁপে চলল কোটি অলক্ষ্য নিশি বিহঙ্গের পাখার মতো। সেই তরঙ্গিত হাসির ছোঁয়ায় সুদূর বাংলার ঢাকায়, শান্তিপুরে, চন্দ্রকোণায় ঘুমন্ত তাঁতীরা একটা দুঃস্বপ্ন দেখল এক সঙ্গে। স্বপ্ন দেখল, একটা লোহময় রাক্ষস একখানা তীক্ষ্ণধার করাত দিয়ে একটির পর একটি করে তাদের আঙুল কেটে চলেছে!"

'কথামুখ' অংশটি থেকেই বিভিন্ন ভাব-রসের প্রকাশক ভাষার দৃষ্টান্ত উদাহৃত হ'ল, সমগ্র উপন্যাসটি যদি এভাবে বিশ্লেষণ করা যায়, তবে দেখা যাবে ঔপন্যাসিক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ভাষা নিছক গল্প-কাহিনী (story) বা বক্তব্য বিষয়টি বহন করে নিয়ে যাওয়ার ভারবাহী পশু নয়—তাঁর ভাষায় আছে ঐন্দ্রজালিক ক্ষমতা। যাদুকর যেমন একই পুঁটলির মধ্য থেকে কারুকে সন্দেশ, কারুকে লজেন্স, কারুকে ফল, কারুকে আর কিছু বার করে দিয়ে তাক লাগিয়ে দেন, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের তদ্রূপ সম্মোহিত করার মত যাদুশক্তির ভাষা আছে ;—যে ভাষায় তিনি ইচ্ছামত যে কোন ভাব, যে কোন অনুভূতি, যে কোন অবস্থা, বা পরিস্থিতির বর্ণনা করতে পারেন, তাকে চিত্রময়, ধ্বনিময়, সুরময় করে তুলতে পারেন। তাঁর ভাষার মূল শক্তি কবিত্ব। বিচিত্র শক্তি রূপিণী, মনোহারিণী তাঁর ভাষা পাঠকের মনে শিল্পীর ঈপ্সিত ভাবটি অনায়াসে সঞ্চারিত করে দিতে পারে। বিভিন্ন ভাব ও অবস্থার চিত্র তাঁর গদ্যে কেমন ফোটে তারই কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে।

তিনি যখন ইতিহাস-কাহিনী বর্ণনা করেন, তখনও তাতে কবিত্বের ছোঁয়া লাগে।, তাঁর ভাষা ঠিক রিপোর্টারের ভাষা নয়, বা, নিছক বিবৃতি নয়, সামান্য দু' একটা অংশ তুলে দিলেই বোঝা যাবে—"ওদিকে ইয়োরোপে আরব-সাম্রাজ্যের ওপর ঘনাচ্ছিল সর্বনাশের ছায়া ; টলমল করে উঠছিল মক্কা থেকে রোম পর্যন্ত প্রসারিত বিশাল প্রতাপের বনিয়াদ। একদিন তা ধ্বসে পড়ল কিউটার দুর্গে। মুসলমান জগতের বাছা বাছা আরব বীরদের নিয়ে সালাত্ বেন সালাত্ দুর্গ রক্ষার চেষ্টা করলেন ; কিন্তু নতুন জাগ্রত হিস্পানিয়া—স্পেন আর পর্তুগালের মিলিত শক্তি মুর-সাম্রাজ্যের মেরুদণ্ড গুঁড়িয়ে দিলে। জিব্রালটার প্রণালীর রক্তমাখা জলে স্নান করে জন্ম নিল এক দুর্জয় জাতি।"—[পরিঃ এক] কিংবা "ঝড় উঠেছে দূরের সমুদ্রে। ইতিহাসের ঢেউ আছড়ে আছড়ে পড়ছে পশ্চিম সাগরের কূলে কূলে, সিংহলের শৈলতটে, মালদ্বীপের নারিকেল বনে। তারই একটুখানি দোলা এসে লেগেছিল চট্টগ্রামে।..."

"কিন্তু সমুদ্রের ঝড় এগিয়ে এল গৌড় বাংলার বুকের ভেতর। সপ্তগ্রামে এসে ঘাঁটি আগলালেন ডিয়েগো রেবেলো। বাঙলার মাটিতে ক্রীশ্চান-শক্তির প্রথম অনুপ্রবেশ। সমুদ্র থেকে কাল-বৈশাখী মেঘ বাংলার আকাশে ঘনিয়ে এল এই প্রথম। বিশালাক্ষীর মন্দিরে যারা গান শুনছিল, তারা একবারও জানল না—যুগান্তরের এক সন্ধিলগ্নে পদক্ষেপ করল তারা ; যে বণিকের দল গৌড়ী আর পৈষ্ঠীর নেশায় বিভোর হয়ে নটীর গৃহে সান্ধ্য-অভিসারে চলেছিল, তারা জানল না—শুধু বাঙলা দেশ নয়—শুধু ভারতবর্ষ নয়—সমস্ত পূর্ব-পৃথিবীর বাণিজ্যে প্রবেশ করল প্রথম মৃত্যুবীজ !" [পরিঃ একুশ] —বলে দিতে হয় না যে এ-ভাষা ইতিহাসের তথ্য-বিবরণী নয়। ইতিহাসের তথ্য কবিত্ব রসে জারিত হয়ে সুন্দর হয়ে উঠেছে। কবিত্ব এর ভাবে, ভাষা গঠনের নৈপুণ্যে ; কবিত্ব এর ব্যঞ্জনায়, এর সংগীতময়তায়। তাই ইতিহাসের নীরস তথ্য, এখানে কেমন স্বাদু, মনোজ্ঞ এবং ভাবময় হয়ে উঠেছে।

"পদসঞ্চার" উপন্যাসের শিল্পাঙ্গিকের বৈশিষ্ট্য হ'ল, মাঝে মাঝেই নাটকীয় পরিস্থিতি রচনা করা। ফলে, কাহিনীটি narrative, বা, বিবরণ ধর্মী না হয়ে, গতিশীল হয়েছে, পাঠককে আবিষ্ট করে রাখার মতো চমক সৃষ্টি করেছে। ভাষা এই নাটকীয় পরিবেশ-পরিস্থিতিকে সার্থক রূপ দিয়েছে। এখানেও কিন্তু নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের গদ্য ভাষার প্রাণটি কাব্যের। দু' একটি উদাহরণ দিলেই স্পষ্ট হবে। তিন, চার, পাঁচ, ছয়, সাত, আট, নয়—প্রায় প্রত্যেকটি পরিচ্ছেদে একটা না একটা নাটকীয় 'situation' বা পরিস্থিতি রচনা করেছেন তিনি। কখনও কখনও সেই situation-গুলি আবার এমন এক একটা মুহূর্ত রচনা করেছে, যে, তীব্র উত্তেজনায়, বা অপ্রত্যাশিতভাবে কোন নাটকীয় ঘটনায় ভেঙে পড়ে' কাহিনীতে গতি সঞ্চার করেছে। এ সবই সম্ভব হয়েছে, ভাষার ওপর তাঁর অসামন্য দখল থাকায়। শিল্পীর ভাষা কখনও প্রহেলিকাময়, কখনও নাটকীয় গতিসঞ্চারী, এবং সর্বদাই রোমান্টিক ব্যঞ্জনাধর্মী কবি-কল্পনায় চিত্র-সঙ্গীতময়।

১. "আগুনের সম্মুখে যারা প্রতীক্ষা করছিল, তারা আগে থেকেই ছিল উৎকর্ণ হয়ে। জ্বলন্ত আগুনের কম্পিত রক্তবৃত্তের ভেতর সোমদেবের দীর্ঘ ছায়া পড়তেই তারা উঠে দাঁড়ালো। এগিয়ে এসে সভয়ে প্রণাম করলে সোমদেবকে।

"রাজশেখর আর সুপর্ণা একখণ্ড হরিণের ছালের ওপর বসে ছিলেন, সেইখানার ওপরেই আবার ধীরে ধীরে বসে পড়লেন তাঁরা। সোমদেব একখানা বাঘের চামড়ার আসন টেনে নিলেন। কিছুক্ষণ নিঃশব্দে বসে রইলেন তিনজন। সুপর্ণা নতদৃষ্টি মেলে রাখল মাটির দিকে, রাজশেখর আগ্রহভরে লক্ষ্য করতে লাগলেন সোমদেবকে—আর সোমদেব ধ্যানস্থের মত কিছুক্ষণ চেয়ে রইলেন গুহার দেওয়ালের শীতল অন্ধকারের দিকে। সামনের আগুনটা মাঝে মাঝে নতুন ইন্ধনের সন্ধান পেয়ে রক্তশিখায় চমকে উঠছে, সেই ক্ষণ দীপ্তিতে অলৌকিক দেখাচ্ছে সোমদেবের অস্বাভাবিক মুখ। বাইরের পুঞ্জিত কুয়াশা ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় আরো ঘন হতে লাগল, সমতালে বেজে চলল অরণ্য-ঝিল্লীর তীক্ষ্ন আর্তনাদ। দূরে ফেউটা এখনো বাঘের সঙ্গ ছাড়েনি -থেকে থেকে তার এক একটা বুকফাটা কাতরোক্তি ধাতপাত করতে লাগল ঝিঁঝিঁর কলধ্বনির ওপর।

"রাজশেখরের ভয় করতে লাগল। ঝুঁকে পড়ে এক মুঠো শুকনো পাতা কুড়িয়ে নিয়ে তিনি ছুঁড়ে দিলেন আগুনটার ওপরে। একবার থমকে গিয়েই আবার লকলকিয়ে উঠল আগুনটা। পটপট করে উঠল পাতা পোড়ার শব্দ, একটা উগ্র জান্তব গন্ধ ছড়িয়ে গেল চারপাশে ; পাতার ভেতরে একটা বড় গোছের পোকা ছিল নিশ্চয়।" [পরিঃ তিন]

২. "পায়ের নীচে স্যাঁৎসেতে মেঝে। এখানে ওখানে দু একটা ছোট ছোট গর্ত—কত বন্দী অসহায় ভাবে ওখানে মাথা খুঁড়ে মরেছে কে জানে। শ্যাওলা-ধরা পাথরের দেওয়াল শীতের স্পর্শে মৃত্যুহিম। চারদিকে বড় বড় পাথরের থাম, তাদের গায়ে ঝুলছে ভারী ভারী লোহার কড়া। ডি মেলো দেখেই বুঝতে পারলেন। যে সব বন্দীরা কারাগারে থেকেও যথেষ্ট বাগ মানে না—ওই সব কড়ায় বেঁধে তাদের চাবুক মারার বন্দোবস্ত।

"পাশেই চুপ করে আছে গঞ্জালো। দেবদূতের মতো মুখ—সোনার মতো চুল, চৌদ্দ বছরের কিশোর ; কেমন আর্ত দৃষ্টি ফেলে থেকে থেকে তাকাচ্ছে ডি মেলোর দিকে। আবছা অন্ধকারে ডি মেলো দেখতে পাচ্ছেন না ভালো করে, কিন্তু পরিষ্কার বুঝতে পারছেন তার দু চোখের অব্যক্ত যন্ত্রণা। হিংস্র ক্রোধে সমস্ত শিরাগুলো জ্বলে যাচ্ছে তাঁর। যদি কখনো দিন আসে অনুকূল অবসর—তা একবার ওই নবাবকে তিনি দেখিয়ে আনবেন লিসবোঁয়ার কারাগার। সেখানে আছে লৌহ কুমারীর আলিঙ্গন—সেই আলিঙ্গনে তাকে পাঠিয়ে লোহার দরজাটা বন্ধ করে দিলেই দু দিক থেকে আসবে তীক্ষ্ম ইস্পাতের ফলক—পলকের মধ্যে হাড় মাংস সুদ্ধ বিদীর্ণ করে দেবে।

"বিদ্রোহ ?—আর্তস্বরে চীৎকার করে উঠলেন ডি মেলো, হাত চলে গেল কোমরবন্ধের দিকে ; কিন্তু সেখানে তলোয়ার ছিল না।

ডি মেলো আবার বললেন : বিদ্রোহ ? তোমরা সবাই ?

—না সবাই নয় ক্যাপিতান ! —চক্ষের পলকে তিন জন উঠে এল, আড়াল করে ধরল ডি মেলোকে। অন্যদিক থেকে এল আরো তিন চারজন—দাঁড়ালো পেড্রোর পাশাপাশি।

—পেড্রো শয়তান, পেড্রো মুরদের দলে যোগ দিয়েছে : —কিশোর গঞ্জালোর তীক্ষ্নস্বর ভেসে উঠল।

"হয়তো পরক্ষণেই ঝাঁপ দিয়ে পড়তো পেড্রো, পরক্ষণেই মারামারি শুরু হয়ে যেত দুই দলের ভেতরে, কিন্তু সেই মুহূর্তেই একটা ঘটনা ঘটল। হঠাৎ আর্তনাদের মতো শব্দ তুলে দুদিকে সরে গেল লোহার প্রাচীরের মতো দরজা দুটো। গরাদের বাইরে প্রহরীর পাশে দেখা গেল দুজন পর্তুগীজের মূর্তি।

চক্ষের পলকে দু দলই ভুলে গেল বিদ্বেষ—ভুলে গেল এতক্ষণের ক্ষিপ্ত হিংস্রতা। এক সঙ্গেই সকলের গলা থেকে বেরিয়ে এল আর্তস্বর : ভ্যাসকনসেলাস ! কোয়েলহো !" [পরিঃ ছয়]

৩. "মন্দির নয়—মায়ালোক।

বীণা, বাঁশি আর মৃদঙ্গের ধ্বনিতে যেন গন্ধর্বলোকের ঐকতান। ঘরের উজ্জ্বল আলোগুলো পরিণত হয়েছে জ্যোতির তরঙ্গে—ফুল আর ধূপগন্ধ আবর্তিত হচ্ছে সুরের রেণু রেণু পরাগের মতো। চারদিক থেকে সরে গেছে মন্দিরের দেওয়াল—দূরের সমুদ্র যেন সঙ্গীতের তরল তরঙ্গ হয়ে সব কিছু ভাসিয়ে নিয়ে গেছে; আর সেই সমুদ্রের শীর্ষে ধ্বনি-গন্ধের একটি সহস্রদল শুভ্র পদ্মের ওপর দেবদাসীর দেহ লীলায়িত হচ্ছে বিষ্ণু-মানসী উর্বশীর মতো।

"একটি ফেন-বুদ্বুদের মতো আলোর তরঙ্গের চূড়ায় জেগে রইল শঙ্খ দত্তের চেতনা।

দক্ষিণ হাতে বাম হাতের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ ধরে শঙ্খ মুদ্রায় পূজোর শুভ-সংকেত জানালো দেবদাসী—সংযুক্ত দশাঙ্গুলির যোগ চিহ্নে কর্কট মুদ্রায় তুলল শঙ্খরব; যুক্তপাণির পুষ্পপুট মুদ্রায় দেবতাকে অর্ঘ্য দিয়ে অঞ্জলি মুদ্রায় জানালো ভক্তিনত প্রণাম।

"বাতাসে দুলছে রজনীগন্ধার মঞ্জরী। নির্মল, নিষ্পাপ। শঙ্খ দত্ত স্বপ্ন দেখছে। একটা সুগন্ধ পদ্মের ওপরে মাথা রেখে সঙ্গীতময় মহাসমুদ্রে ভেসে চলেছে সে। তার আদি নেই—সে অনন্ত।

"—শেঠ!

"উদ্ধবের ছোঁয়ায় তার চমক ভাঙল। নৃত্যোৎসব শেষ হয়েছে। দেবতার পায়ে লুটিয়ে পড়েছে দেবদাসী। একটা করুণ মূর্চ্ছনায় ভেসে আসছে মৃদঙ্গ আর বীণার আওয়াজ। বিহ্বল মাদকতায় সমস্ত মন্দির স্বপ্নার্পিত।" [পরিঃ সাত]

তিনটিমাত্র উদাহরণ তোলা হ'ল। এরকম অসংখ্য উদ্ধৃতি চয়ন করা যেতে পারে। প্রথম দৃষ্টান্তটি পাঠ করলেই পাঠকের চোখের সামনে ধীরে ধীরে একটি দৃশ্য ফুটে উঠবে। তার একটা গতি বা action আছে। ঔপন্যাসিক নাট্যকারের মতো একটি নাটকীয় 'situation' তৈরি করেছেন। দ্বিতীয় দৃষ্টান্তে দেখা যাবে, নাটকীয় 'situation'-টিকে ধীরে ধীরে উত্তেজনাময় নাটকীয় মুহূর্তে পরিণত করা হয়েছে। তৃতীয় দৃষ্টান্তে নাটকীয় situation-টিকে রোমান্টিক স্বপ্নিল গীতিসুর-মূর্ছনায় রূপান্তরিত করা হয়েছে। এরকম নানা ভাব, অনুভূতি, নানা রসের ঘটনাকে নাট্যিক চমক ও গতিতে কাহিনীকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন ঔপন্যাসিক, তদুপযোগী গদ্য-পদ্যময় ভাষার ঐন্দ্রজালিক ক্ষমতায়। তাঁর হাতের ভাষাকে তিনি যেমন-তেমনভাবে ঘোরাতে-ফেরাতে মোচড়াতে পারেন, তার স্নিগ্ধ কোমল মায়াময় রূপ যেমন সৃজন করতে পারেন, তেমনি ভয়ঙ্কর -বীভৎস কঠিন কঠোর চরিত্রও তাকে দিতে পারেন। শব্দ চয়ন, শব্দ গ্রন্থন, শব্দ নির্মাণ, ও তার সার্থক প্রয়োগ কৌশলে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের গদ্য এমন বর্ণময়, ধ্বনি-সঙ্গীতময় এবং চিত্রময়। উদাহৃত দৃষ্টান্তগুলি থেকেই তাঁর শব্দ গ্রন্থন ও প্রয়োগ কৌশল কেমন ভাবে ভাষাকে চিত্র-সঙ্গীতময় করে তোলে দেখানো যেতে পারে। প্রথম দৃষ্টান্তে—'জ্বলন্ত আগুনের কম্পিত রক্ত-বৃত্তের ভেতর সোমদেবের দীর্ঘছায়া,'

'সোমদেব ধ্যানস্থের মত কিছুক্ষণ চেয়ে রইলেন গুহার দেওয়ালের শীতল অন্ধকারের দিকে ; 'সামনের আগুনটা মাঝে মাঝে নতুন ইন্ধনের সন্ধান পেয়ে রক্তশিখায় চমকে উঠছে,' 'একটা উগ্র জান্তব গন্ধ ছড়িয়ে গেল' ইত্যাদি ; দ্বিতীয় দৃষ্টান্তে—'শ্যাওলা ধরা পাথরের দেওয়াল শীতের স্পর্শে মৃত্যুহিম,' 'কেমন আর্তদৃষ্টি ফেলে', ইত্যাদি : তৃতীয় দৃষ্টান্তে—'ঘরের আলোগুলি পরিণত হয়েছে জ্যোতির তরঙ্গে,' 'ফুল আর ধূপ গন্ধ আবর্তিত হচ্ছে সুরের রেণু রেণু পরাগের মতো,' 'দূরের সমুদ্র যেন সঙ্গীতের তরল তরঙ্গ হয়ে সবকিছু ভাসিয়ে নিয়ে গেছে', 'সেই সমুদ্রের শীর্ষে ধ্বনি-গন্ধের একটি সহস্রদল শুভ্র পদ্মের ওপর দেবদাসীর দেহ লীলায়িত হচ্ছে'—ইত্যাদি। লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে কোথাও শব্দকে বিশেষণে রূপান্তরিত করা হয়েছে, কোথাও এক বা একাধিক বিশেষ্য, বা, বিশেষ্য-বিশেষণ শব্দকে বিশেষণে রূপান্তরিত করা হয়েছে। অলঙ্কারের মধ্যে উপমা-গোত্রীয় অলঙ্কারই [উপমা-উৎপ্রেক্ষা, রূপক-অতিশয়োক্তি ইত্যাদি] তিনি বেশী ব্যবহার করে থাকেন। নির্মিত শব্দগুলির সাহায্যে চিত্ররূপ দেবার অদ্ভুত ক্ষমতা তাঁর। 'জ্বলন্ত আগুনের কম্পিত রক্তবৃত্ত'—পড়লেই, রক্তাভ একটি অগ্নিবলয় যা বাতাসে মৃদু মৃদু কাঁপছে—এরূপ ছবি চোখের সামনে ভেসে ওঠে ; 'সঙ্গীতের তরল তরঙ্গ' বা 'জ্যোতির তরঙ্গ'-ও তদ্রূপ ভাব-চিত্র রচনা করে। উপমা শ্রেণীর অলঙ্কার ব্যবহারের প্রবণতা এবং বিশেষণে বিশেষিত করার চেষ্টা তাঁর রোমান্টিক, গীতিকবির মনটিকেই মূর্ত করে।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের রোমান্টিক গীতিকবির ভাষা সংগীতে মূর্চ্ছনায় পাঠককে মুগ্ধ করে প্রকৃতির বা কোন রূপ সৌন্দর্যের বর্ণনায়। কয়েকটি উদ্ধৃতি দেওয়ার লোভ সামলানো কঠিন :

১. "শীতের সমুদ্র / এলিয়ে পড়ে আছে / শীতল পাটির মতো। / জলের রঙ / কালীদহের মতো নীল / —ছোট ছোট ঢেউ / দুলছে নাগশিশুর মতো। / চারখানা ডিঙির / ষোলোখানা পালে / লেগেছে উত্তুরে হাওয়ার / ঠাণ্ডা অলস আমেজ / —ধীরে ধীরে / জল কেটে / এগিয়ে চলছে বহর।" [পরিঃ এক]

এ ভাষা কবি-ভাষা। গদ্য হলেও হালকা সাবলীল ছন্দ আছে। 'শীতল পাটির মতো', 'জলের রঙ কালীদহের মতো নীল,' বা, 'ঢেউ দুলছে নাগশিশুর মতো'—উপমা অলঙ্কার প্রকৃতিকে রূপময় করেছে। চারটি বাক্যের তিনটিতে উপমা-অলঙ্কারের ব্যবহার। সমুদ্র শীতল পাটির মতো এলিয়ে পড়ে আছে—উপমাত্মক সমগ্র ভাবটি আবার সমাসোক্তি অলঙ্কারে একটি ছবি তৈরী করে দেয়।

২. "সপ্তগ্রাম থেকে গৌড়। /

বাঙলার এক প্রান্ত থেকে / অপর প্রান্ত। / কর্ণফুলী-ব্রহ্মপুত্র-পদ্মা-গঙ্গার / মায়া দিয়ে মাখানো। / তাল-নারকেল-সুপুরীর / জয়ধ্বজা উড়ছে হাওয়ায় হাওয়ায়। / মেঘের ছায়ায় ছায়ায় / স্বপ্ন দেখে নীল পাহাড়। / রৌদ্রের ঝিলিক ঝলে / নীলকণ্ঠ পাখীর পাখায়। / জ্যোৎস্নার দুধ-সমুদ্রে / সাঁতার দিয়ে যায় / হংস-বলাকা। / পলিমাটির চন্দন

ডাঙায় / শ্বেত পদ্মের পাপড়ির মতো / ছড়িয়ে থাকে বকের দল।" / [পরিঃ পনেরো]

বাঙলার প্রকৃতির স্নিগ্ধ-কোমল-মায়াময়-স্বপ্নময় চিত্র। ছোট ছোট বাক্যে লীলায়িত ছন্দে ভাবের গতি দ্রুত হয়েছে। 'কর্ণফুলী-ব্রহ্মপুত্র-পদ্মা-গঙ্গার মায়া দিয়ে মাথানো' এখানে কবির ভাবই বাক্যের অলঙ্কার। 'তাল-নারকেল-সুপুরীর জয়ধ্বজা উড়ছে' বাতাসে আন্দোলিত তাল-নারকেল-সুপুরীর সবুজ পত্রবহুল মাথাগুলি ধ্বজা বা পতাকার মতো উড়ছে—এই ভাবটি অতিশয়োক্তি অলঙ্কারে চিত্ররূপ নিয়েছে। 'জ্যোৎস্নার দুধ-সমুদ্র'—এ রূপক অলঙ্কারের সৌন্দর্য, রোমান্টিক কাব্যের সৌন্দর্য। কিংবা, 'পলি মাটির চন্দন ডাঙায় শ্বেতপদ্মের পাপড়ির মতো ছড়িয়ে থাকে বকের দল।' এ উপমা অলঙ্কারের সৌন্দর্যও একই রূপ।

৩. "প্রহরের পর প্রহর কাটে। দোলন-চাঁপার গন্ধ নিবিড়তর হয়। দ্বাদশীর চাঁদ যখন জানলা থেকে বিদায় নেয়, সুপর্ণা তখনো শঙ্খকে ফিরে ডাকে না। শুধু কখন হাওয়া শীতল হয়ে আসে—আকশ বিবর্ণ হতে থাকে, তারপর ভোরের সম্ভাষণ জানিয়ে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে ধন দত্তের কাঁপা কাঁপা গলায় চৈতন্যের বন্দনা।" [পরিঃ তেইশ] —এ কে শুধু কবিতা বলাই শ্রেয়।

৪. "চৌকির ওপরে শম্পা নড়ে বসল একবার। বামদিক থেকে সরে গেল শাড়ীর আঁচল—নীল পর্বত চূড়া দেখা দিল রক্তমেঘের আড়াল থেকে। পর্বতের পাশে সোনালী ঝর্ণার মতো ঝলকে উঠল মণিহার।

"একটা আশ্চর্য হাসি ফুটে উঠল শম্পার ঠোঁটে। স্বপ্ন-কল্পনার অতলে হারিয়ে গিয়ে যে হাসিকে রূপায়িত করে তুলতে চায় পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শিল্পী ; যে সুতনুকার হাসির ধ্যানে কল্পান্ত তন্ময় হয়ে থাকে রূপদক্ষ দেবদত্তের দল।

"—পট্টবস্ত্রের বিনিময়ে শ্রেষ্ঠী সিংহল থেকে নিয়ে আসবেন চাঁদের টুকরোর মতো এক একটি অতুলনীয় মুক্তো ; কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁর দৃষ্টি কোন্ ঝুটা মুক্তোর ওপর ? আর যে ঝুটা মুক্তোর চারিদিকে তিমি আর হাঙর পাহারা দিচ্ছে—শেঠকে যা আয়ত্ত করতে হবে জীবনের বিনিময়ে ?

"নীল পাহাড়ের কোলে যে সোনালি ঝর্ণায় শঙ্খ দত্তের মন ঝাঁপিয়ে পড়তে চাইছিল, তড়িৎগতিতে তা ফিরে এল সেখান থেকে। পাহাড়ের চূড়োয় একটি ঘন কালো বেণী ফণা তুলল কাল অজগরের মতো।" [পরিঃ নয়]

অতিশয়োক্তি, উপমা-অলঙ্কারই এই কবি-ভাষার প্রধান সৌন্দর্য। এ ধরনের কয়েক শত উদ্ধৃতি "পদসঞ্চার" উপন্যাস থেকে তুলে দেখানো যেতে পারে সমাস ও বিশেষণের প্রতি আগ্রহে, উপমা-রূপক-সমাসোক্তি-অতিশয়োক্তি-উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কার প্রয়োগে তিনি সিদ্ধহস্ত।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের সাহিত্যিক জীবন শুরু হয়েছিল কবি হিসেবে। কবি হিসেবেই তিনি হয়ত পরিচিত হতেন ; কিন্তু শ্রদ্ধেয় পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়ই তাঁকে গল্প উপন্যাসের জগতে আহ্বান করে নিয়ে আসেন। তাঁর অন্তরের অন্তঃস্থলে যে রোমান্টিক কবি মনটি

সদা জাগ্রত, তাকে তিনি এড়িয়ে যাবেন কি করে? যাওয়া সম্ভবও হয় নি। তাঁর প্রত্যেকটি উপন্যাসেই এই কবিমন বিগলিত হয়ে প্রবাহিত হয়েছে তাঁর গদ্য ভাষার মধ্যে। এ ভাষার স্বাদুতা, মিষ্টত্ব, মাধুর্য ও সৌন্দর্য প্রত্যেক পাঠককেই মুগ্ধ করে রাখে। আর এইখানেই প্রশ্ন জাগে : যে ভাষার চমৎকারিত্ব ও মনোহারিত্ব এমনভাবে পাঠককে মুগ্ধ করে রাখে, তা কি উপন্যাসের মতো objective-ধর্মী সাহিত্যের সার্থক গদ্য ভঙ্গী? জীবনের গদ্য ভাষাকে (Prose of life) কবি ভাষা (Poetry of life) কি অনেকখানি আচ্ছন্ন করে ফেলে নি? "পদসঞ্চারে" 'Prose of life এবং Poetry of life—এর সুসমন্বয় ঘটে নি—এই উপন্যাসের ভাষা পাঠকের মনকে বাস্তব ঘটনাবলীর পাশ দিয়ে রোমাণ্টিক কবি-কল্পনার জগতে নিয়ে যাওয়ার জন্য হাতছানি দেয়। রবীন্দ্রনাথের কবি-ভাষাই অনেক উপন্যাসের শিল্পাঙ্গিকের সঙ্গে আঁটেসাটো হয়ে উপন্যাসের ঘটনা-কাহিনীকে বাঁধতে পারে না। উপন্যাসের ভাব ও বক্তব্যের চেয়ে বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই ভাষার আকর্ষণ ও সৌন্দর্য বড় হয়ে দেখা দেয়। শরৎচন্দ্রের ভাব ও জীবনাদর্শ রোমাণ্টিকধর্মী, কিন্তু ভাষায় 'realism'—এর অঙ্গীকার। তাই গল্প বলার তীব্র আকর্ষণ সে ভাষায় সৃষ্টি করতে পারলেও, গভীর জীবন বোধ প্রকাশের জন্য ভাষায় যে কবিত্বের দোলা লাগা উচিৎ, তা তাঁর উপন্যাসগুলিতে কদাচিৎ পাওয়া যায়। বঙ্কিম চন্দ্রের গদ্যই তাঁর উপন্যাসের শিল্পাঙ্গিকের সঙ্গে সুসঙ্গত;—তাঁর উপন্যাসের ভাষা শৈলিতে Prose of life এবং Poetry of life ভারসাম্য রক্ষা করেছে। আধুনিক যুগের ঔপন্যাসিকগণ উপন্যাসের অঙ্গিক (form) নিয়ে যেমন পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন, তেমনি ভাষা নিয়েও। সেদিক থেকে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় এবং মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় যেমন অনায়াস সিদ্ধিলাভ করেছেন, এমন বোধ হয় কেউ নয়। উপন্যাসের ভাষাশৈলিতে সিদ্ধিলাভের ব্যাপারে আরও কারুর কারুর নামও করতে পারেন কেউ কেউ : কিন্তু 'পদসঞ্চার' উপন্যাসের ভাষা বিচারে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের নাম রবীন্দ্র তালিকাভুক্ত হওয়ায় বাঞ্ছনীয়।

॥ উপসংহার

'পদসঞ্চার' বাঙলা উপন্যাস-শাখার একটি সুগন্ধী কুসুম; এবং বাঙলা ঐতিহাসিক উপন্যাসের প্রশাখাটিকে নব গৌরব দান করেছে। ঔপন্যাসিক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ইতিহাস-চেতনা ও ইতিহাস-প্রীতির সর্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন এটি। তাঁর ঔপন্যাসিক প্রতিভা পরিপক্কতা লাভ করেছে 'পদসঞ্চারে' এসে। কাহিনী-উপকাহিনী-শাখা ও প্রশাখা-কাহিনীর এমন জটিল সমাবেশ, এবং সেগুলিকে আশ্চর্য দক্ষতায় মূলকাহিনী-দেহে সন্নিবন্ধ করে কাহিনীকে সুমণ্ডলায়িত করার দৃষ্টান্ত সম্ভবতঃ নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের আর কোন উপন্যাসে নেই। গভীর ও স্বচ্ছ জীবন দর্শনের আলোয় চরিত্রগুলি হয়ে উঠেছে প্রাণবন্ত এবং বাস্তবানুগ। চাঁদের জ্যোৎস্নাধোয়া নির্ঝরিণীর মতো প্রবাহিত ভাষা 'পদসঞ্চার'-এর অতিরিক্ত এক আকর্ষণ।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের দীর্ঘ তিরিশ, বা তার কিছু বেশীই হবে, বছরের সাহিত্য সাধনার মধ্য থেকে তাঁর সাহিত্য-জীবনের প্রথম যৌবন পর্বের একটি উপন্যাসের আলোচনায় তাঁর বিরাট শিল্পীজীবনের বিচার সম্ভব হয় নি আমার পক্ষে। দ্বিতীয়তঃ সুখ-পাঠ্য এবং শিল্প রসাস্বাদনীয় এই গ্রন্থখানির আলোচনা করতে এই জন্যই প্রবৃত্ত হয়েছি যে, বোদ্ধা ও সহৃদয় পাঠক যাতে এই অসম্পূর্ণ আলোচনা পাঠ করে নতুন করে ঔপন্যাসিকের প্রতিভাকে আবিষ্কার করতে প্রয়াসী হন, এবং পূর্ণাঙ্গ আলোচনায় হাত দেন। বর্তমান আলোচক নিজ দুর্বলতা ও অক্ষমতা সম্পর্কে সচেতন। তাই যদি কেউ বর্তমান গ্রন্থের ভুল-ত্রুটিগুলি নির্দেশ করে দেন, তবে লেখকের তিনি প্রকৃত বন্ধুর কাজই করবেন। অধিকন্তু, যদি কারুর ভালো লাগে এই আলোচনা, তবে তা ভাগ্যদেবতারই উদার প্রশ্রয় বলে মনে করব।